সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য
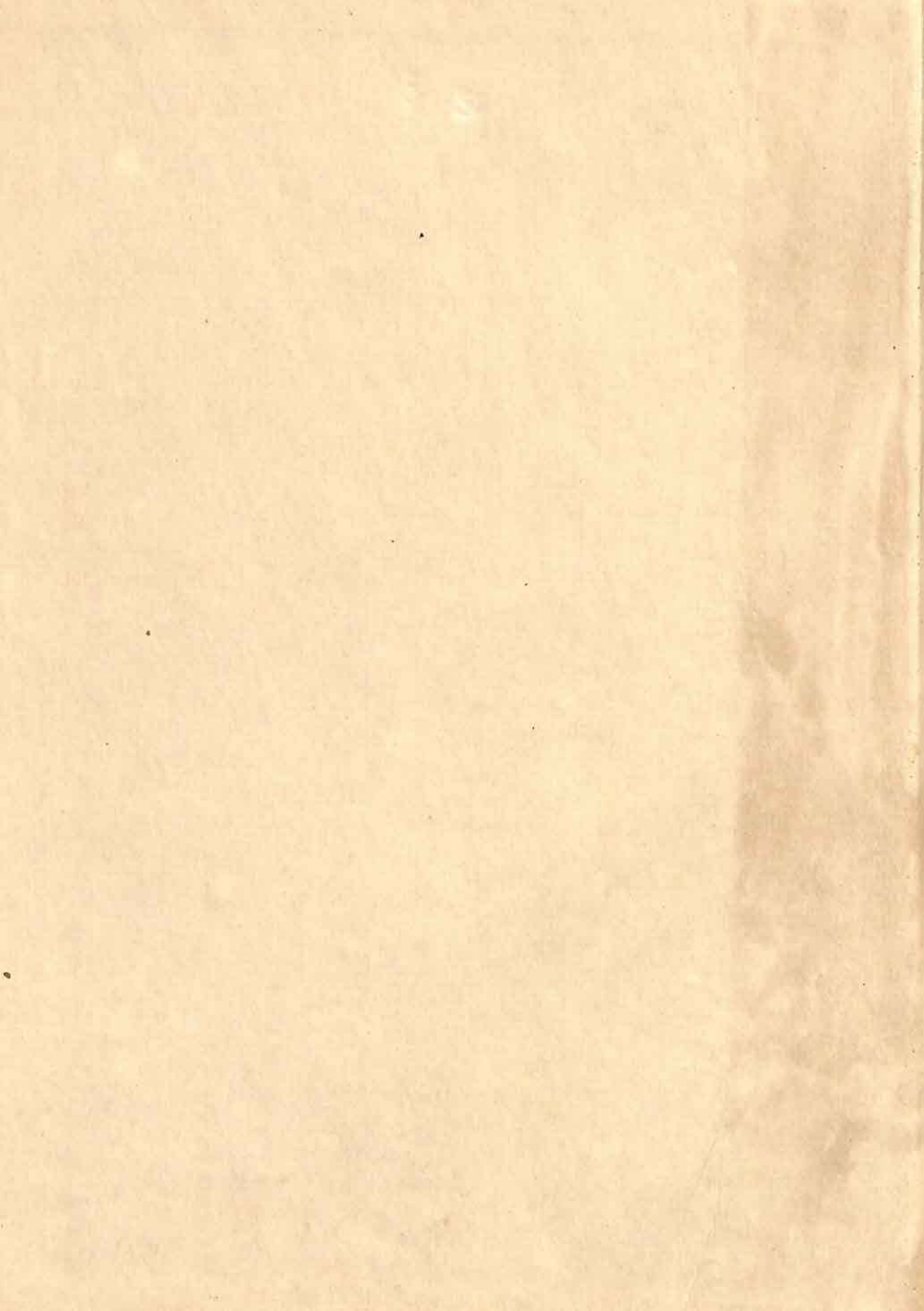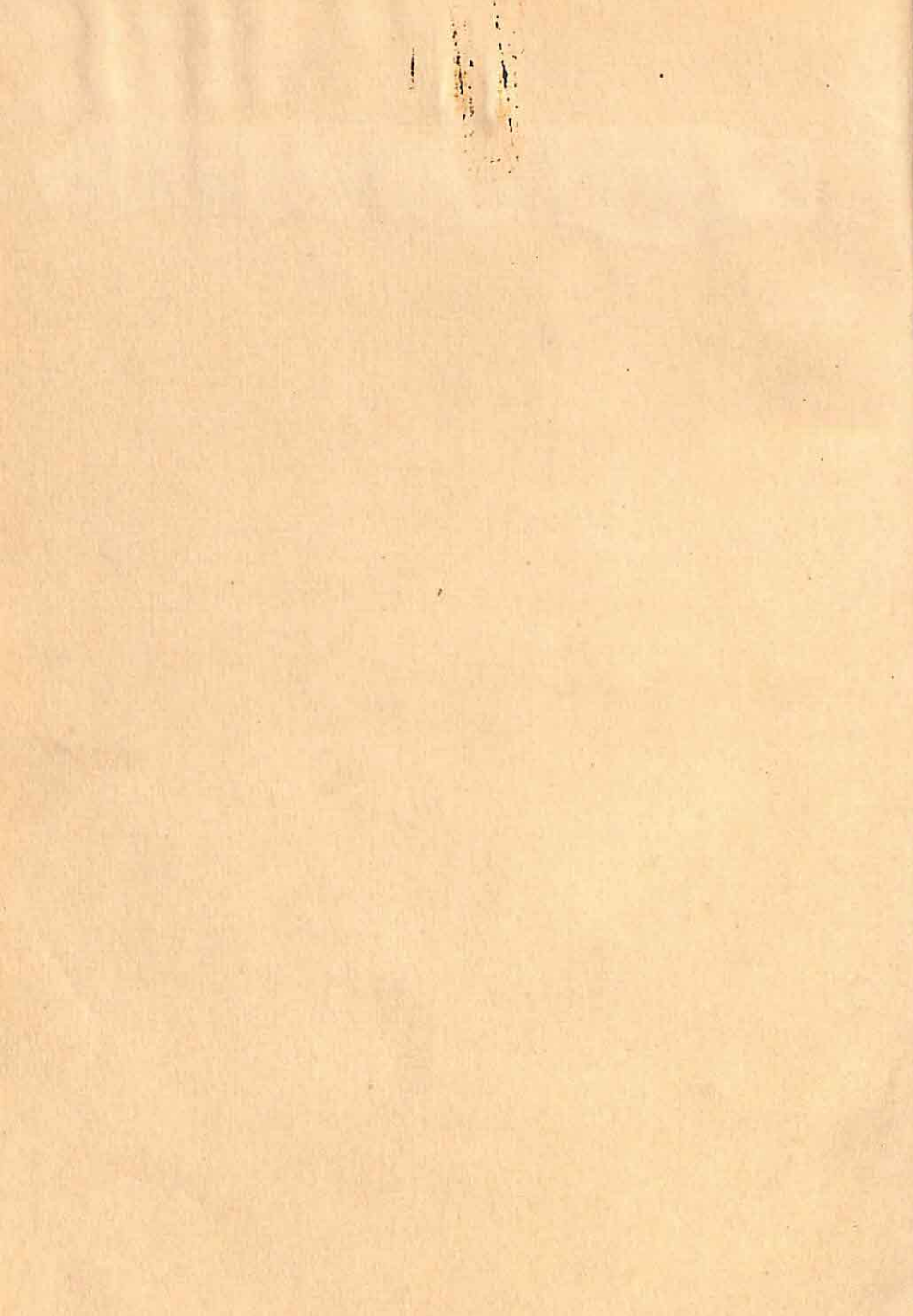
সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা

(প্রথম ভাগ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. ফিল.
অধ্যাপক, দার্জিলিং গভর্ণমেণ্ট কলেজ

ও

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ., কাব্যতীর্থ,
অধ্যাপক, দার্জিলিং গভর্ণমেণ্ট কলেজ
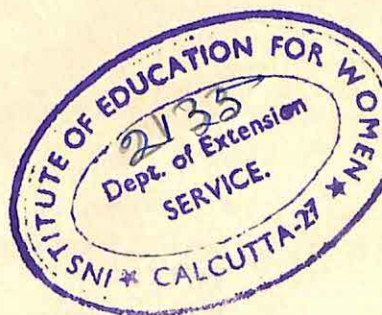
কলিকাতা
১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

মুখবন্ধ

সংস্কৃত সাহিত্য সুপ্রাচীন ও সুবিশাল। বর্তমান যুগে কোন সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আয়ত্ত করিতে না পারিলে সেই সাহিত্যের জ্ঞান সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হইয়াছে পাশ্চাত্ত্য ভাষায়। এই ইতিহাস-রচয়িতৃগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ম্যাক্স্‌মূলার, ম্যাক্‌ডোনেল, কীথ্‌ ও ভিণ্টারনিৎস্‌। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ একটি ইতিহাস প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থগুলি এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বৃহদাকার যে, উহাদের মধ্যে সাধারণ পাঠকের প্রবেশ সহজসাধ্য নহে। এইজন্য উহাদের সংক্ষিপ্তসার ইংরাজীতে রচিত হইয়াছে। এমন কি, হিন্দী এবং অন্যান্য কতক নব্য ভারতীয় ভাষায়ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় এইরূপ ইতিহাস নাই বলিলেই চলে। জাহ্নবী ভৌমিক মহাশয়ের "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র গ্রন্থ। কিন্তু উহা মুদ্রিত হইয়াছিল প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এবং ঐ গ্রন্থ বর্তমানে দুর্লভ।

সংস্কৃত সাহিত্যে উৎসাহী বাঙ্গালী-পাঠকসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি রচিত হইল। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নহে, এই সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবেশ-কামী ব্যক্তির সহায়ক মাত্র। ইহাতে পণ্ডিতগণের সূক্ষ্ম বিচার ও জটিল বিষয়ে বাদবিতণ্ডার অবতারণা করা হয় নাই।

যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থিকা রচিত হইল, ইহার দ্বারা তাঁহাদের কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও লেখকদ্বয়ের শ্রম সার্থক হইবে। ইহা পাঠে কোন সহৃদয় ব্যক্তি ইহার দোষত্রুটির প্রতি লেখকদ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে দর্শন, অলঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রেফযুক্ত কোন কোন বর্ণের দ্বিত্ববিধি সকলে মানিয়া চলেন না। সুতরাং, বর্তমান গ্রন্থে ঐ সকল বর্ণের দ্বিত্ববিধি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হইয়াছে, অপর স্থলে করা হয় নাই। গ্রন্থমধ্যে কতক মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গেল বলিয়া গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত হইল।

কলিকাতা
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৩

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা	
	প্রাচীনতম গদ্যশৈলী	...	২৭	
	কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ	...	২৭	
	এই যুগে ঋগ্বেদের আদর্শবাদ ও গভীর দর্শনের একান্ত অভাব	...	২৮	
	ব্রাহ্মণদের ক্রমশঃ প্রাধান্য	...	২৮	
	বৃহৎযজ্ঞের সহিত পরিচয়	...	২৮	
	শ্রৌতসূত্রের সহিত সম্পর্ক	...	২৯]	
পাঁচ	অথর্ববেদ	...		২৯
	[সংকলনকাল	...	২৯	
	বিষয়বস্তু	...	৩০	
	উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য	...	৩১	
	সংস্কৃতির সংঘর্ষ	...	৩১	
	ইহাতে আদিম ধর্ম	...	৩২	
	ইন্দ্রজাল ও রহস্য	...	৩২	
	দেবতা	...	৩২	
	ভাষা	...	৩৩	
	অথর্বাঙ্গিরস শব্দের অর্থ	...	৩৩	
	ঋগ্বেদের সহিত সম্বন্ধ	...	৩৪	
	গৃহসূত্রের সহিত সম্পর্ক	...	৩৫	
	আবেস্তা ও অথর্ববেদ	...	৩৫	
	প্রয়োজনীয়তা	...	৩৫	
	ত্রয়ী ও অথর্ববেদ	...	৩৬]	
ছয়	ব্রাহ্মণ	...		৩৬
	[অর্থ	...	৩৬	
	সংহিতার সহিত সম্বন্ধ	...	৩৬	
	বিষয়বস্তু	...	৩৭	

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা

এপিক ও পৌরাণিক যুগ

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
	ভগবদ্‌গীতা … …	৭৮	
	মহাভারতের রচয়িতা ও রচনার ইতিহাস …	৭৯	
	মহাভারতের রচনাকাল …	৮০	
	মহাভারতের প্রভাব …	৮৩]	
তের	পুরাণ … …		৮৩
	[পুরাণ শব্দের অর্থ … …	৮৩	
	পুরাণের বিষয়বস্তু … …	৮৩	
	মহাপুরাণ ও উপপুরাণ—ইহাদের সংখ্যা ও নামকরণ …	৮৪	
	চণ্ডী … …	৮৫	
	ভাগবত … …	৮৫	
	পুরাণের রচনাকাল …	৮৬	
	পুরাণের মূল্য … …	৮৭	
	পুরাণের প্রভাব …	৮৮]	

ক্লাসিক্যাল যুগ

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
চৌদ্দ	সংস্কৃত কাব্য … …		৯১
	[সংস্কৃতে 'কাব্য' শব্দের অর্থ …	৯১	
	সংস্কৃত কাব্যের প্রকারভেদ …	৯১]	
পনর	কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ …		৯৪
	[আদিকাব্য ও আদিকবি …	৯৪	
	বৈদিক যুগ হইতে কাব্যের ক্রমবিবর্ত্তন …	৯৪	
	ক্লাসিক্যাল যুগে কাব্যের পরিবেশ ও স্বরূপ …	৯৫	

অবতরণিকা

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন, 'সংস্কৃত ভাষা' ও 'সংস্কৃত সাহিত্য' বলিতে ঠিক কি বুঝায়। সংস্কৃতকে ভারতীয় আর্যভাষা বলা হয়। সাধারণতঃ, 'সংস্কৃত ভাষা' বলিতে বৈদিক যুগের ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া 'রামায়ণ' 'মহাভারতের' ভাষা ও তৎপরবর্তী যুগের কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, উহাদের টীকা টিপ্পনী প্রভৃতি সব কিছুর ভাষাই বুঝায়। কিন্তু, 'সংস্কৃত' শব্দটিতেই সংস্কার বা refinementএর একটা ভাব আছে। তাহা হইলে বুঝা যায়, পূর্বে এমন একটা ভাষা ছিল, যাহা refined হইয়া সংস্কৃতে পরিণত হইয়াছিল। সেই ভাষা কাহারও কাহারও মতে প্রাকৃত ভাষা, অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাভাবিক ভাষা। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, মূল ভাষাই ছিল সংস্কৃত; উহার বিকৃতিই প্রাকৃত ভাষা।

অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিতের মত অনুসারে, ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর স্বীকৃত হইয়াছে। তাহারা এইরূপ :—

১। প্রাচীন্ ভারতীয় আর্যভাষা

২। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা

৩। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

ভিণ্টারনিৎস্ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিম্নলিখিতরূপ ভাগ করিয়াছেন :—

(১) অতি প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

(ক) প্রাচীনতম বৈদিক মন্ত্রসমুহের ভাষা (প্রধানতঃ ঋগ্বেদে)

(খ) পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহের ভাষা (বিশেষতঃ অন্যান্য বেদ, ব্রাহ্মণ এবং সূত্রসাহিত্যের ভাষা)

(২) সংস্কৃত

(ক) মন্ত্রাংশ ছাড়া, বৈদিক যুগের গদ্যগ্রন্থসমূহের ভাষা এবং পাণিনির ভাষা

(খ) 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'—এই দুইটি এপিকের ভাষা

(গ) ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত—অর্থাৎ পাণিনির পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত পালি ও প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষা স্থানভেদে নানারূপে প্রচলিত ছিল ; যথা—শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী, মাগধী ইত্যাদি। ইহাদের উপভাষাও বিবিধ প্রকার ছিল। কালক্রমে প্রাকৃত ভাষা অপভ্রংশে পরিণত হইল।

অপভ্রংশ হইতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উৎপত্তি ; যথা—বাংলা, বিহারী, নেপালী ইত্যাদি।

এই তো গেল ভাষার কথা। এই ভাষাতে যে সাহিত্য লিখিত হইয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমানে আলোচ্য। এই গ্রন্থে, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসই আমরা আলোচনা করিব ; স্থতরাং, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ পালি ও প্রাকৃতে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহা আমাদের ইতিহাসের বিষয়ীভূত নহে। নব্যভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে। অতএব, একমাত্র প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাসই বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা হইবে। এই সাহিত্যকে মোটামুটীভাবে নিম্নলিখিত কালানুক্রমিক ভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ—

(১) বৈদিক সাহিত্য—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদাঙ্গসমূহ

(২) এপিক সাহিত্য—রামায়ণ ও মহাভারত

(৩) ক্লাসিক্যাল সাহিত্য—পাণিনির পরবর্ত্তী নানা বিষয়ক গ্রন্থরাজি

সংস্কৃত 'এপিক সাহিত্য'কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'রামায়ণ' 'মহাভারত'কে তাঁহারা বলিয়াছেন, popular epic বা জনপ্রিয় এপিক। পরবর্ত্তী কালের পদ্যকাব্য সাহিত্যের আখ্যা তাঁহারা দিয়াছেন court epic বা রাজসভার এপিক।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এত প্রাচীন তাহা আমাদের পড়িবার বা জানিবার প্রয়োজন কি ? বর্ত্তমানে আমরা সংস্কৃত ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিনা বটে, কিন্তু এই ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার প্রয়োজন নাই—একথা বলা চলে না। প্রথমতঃ, ভারতবাসীর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান আবশ্যকতা এই যে, আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন

সংস্কৃত। পিতৃপিতামহের পরিচয় না থাকিলে যেমন কোন লোকের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তেমনই জাতির ঐতিহ্য না থাকিলে তাহার মর্যাদার হানি ঘটে। কোন ব্যক্তির যদি জাতীয়তাবোধ না থাকে, তাহা হইলে সে আত্মমর্যাদার জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। তাই বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্স্মুলার বলিয়াছেন,

"A people that could feel no pride in the past, in its history……, had lost the mainstay of its national character."

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এবং কাব্য নাটকাদিতে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও নীতিমূলক কথা আছে সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং, আত্মোন্নতির জন্য ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে এই ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন। ভারতীয় কাব্যরসপিপাসুর পক্ষেও সংস্কৃত ভাষা অবশ্যপাঠ্য। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে নিহিত আছে ; সুতরাং যে সংস্কৃত এই সকল গ্রন্থের ভাষা, তাহা অবশ্য শিক্ষণীয়। বস্তুতঃ, সাহিত্য ছাড়াও মুদ্রা (numismatics) এবং লেখমালা (epigraphy) প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানগুলি অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতে লিখিত। চতুর্থতঃ, পৃথিবীর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা হিসাবে সংস্কৃত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা বর্তমান যুগে আর্য্যগণের ইতিহাসে আলোকপাত হইতেছে। আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্য্যভাষার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলেও সংস্কৃত ভাষা অপরিহার্য্য।

উল্লিখিত প্রয়োজন ছাড়াও, কৃষিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, পদার্থ-বিদ্যা, বনস্পতিবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয় সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল বাস্তব জীবনের উপযোগী বিদ্যা অর্জন করিতে হইলেও সংস্কৃত শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

যে সকল পাশ্চাত্ত্য দেশ বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অত্যন্ত অগ্রগামী, তাহারাও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এই যুগেও বিশেষভাবে করিতেছেন। জার্মান দেশই ইহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মূলার সংস্কৃতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতাকে এত পরিশ্রম করিয়া মুদ্রিত করিয়া না রাখিলে, হয়ত এই মহামূল্য গ্রন্থের এত ব্যাপক পঠন পাঠন সম্ভবপর হইত না। ঐ দেশেরই Roth, Grassman, Weber, Winternitz, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমানুষিক শ্রম স্বীকার করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত Sylvan Leviও অনুরূপ কীর্ত্তিমান পুরুষ। Keith, Macdonell প্রভৃতির নাম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবার যোগ্য। অধুনা জীবিত সংস্কৃতবিৎ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য Barnett, Renou, Edgerton প্রভৃতি।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্ত্য পরিব্রাজক ও ধর্মযাজকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সহিত পরিচয় লাভ করেন। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে Hanxleden কর্তৃক লিখিত হয় সর্বপ্রথম ইউরোপীয় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। ব্রিটিশ শাসনসৌকর্যের জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়; তখন এই ভাষা শিক্ষার প্রেরণা আসে শাসকদের নিকট হইতে। Warren Hastings এর উদ্যোগে 'বিবাদার্ণব-সেতু' নামে প্রকাণ্ড আইন-গ্রন্থ সংকলিত হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে William Jones ফোর্ট উইলিয়মের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার উদ্যোগে কলিকাতায় Asiatic Society of Bengal নামে যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়, তাহা হইতে প্রাচীন সাহিত্যের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে থাকে এবং নানাপ্রকার গবেষণামূলক কার্য তাহাতে চলিতে থাকে।

এইরূপে ক্রমশঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য প্রতীচ্যে বিস্তারলাভ করে। ঐ দেশের পণ্ডিতগণ প্রথমতঃ বিশেষ করিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' 'ভগবদ্গীতা' প্রভৃতি পাঠে মুগ্ধ হন। কালক্রমে বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের অপরাপর শাখার প্রতি তাঁহারা আকৃষ্ট হন।

বৈদিক যুগ

এক

বৈদিক সাহিত্য

বৈদিক সাহিত্য বলিতে বুঝায় ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগে আর্য্যদের সভ্যতা বিস্তারের সংগে সংগে যে সাহিত্য ভারতের মাটিতে স্বয়ং উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সাহিত্য। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে যখন জ্ঞানের দীপশিখা জ্বলিয়া উঠে নাই, তখনই সেই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন যুগে আর্য্যদের জ্ঞানগরিমা ভারতের বুকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির আবির্ভাবের সময় হইতে অর্থাৎ সংহিতা-আবির্ভাবের সময় হইতে বেদাঙ্গ রচনার শেষ সময় পর্য্যন্ত যে বিশাল সাহিত্যের সন্ধান আমরা পাই, সংক্ষেপে বৈদিক সাহিত্য বলিতে ইহাকেই বুঝায়।

বৈদিক সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়?

বেদ কাহাকে বলে? 'বেদ' শব্দ বিদ্ ধাতু হইতে জাত। বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা। অর্থাৎ যে গ্রন্থ বা যে শব্দরাশি মানবজাতিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের সন্ধান দেয় তাহাই বেদ। এই জন্যই সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—"ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ"। অর্থাৎ যে গ্রন্থ ইষ্টলাভের ও অনিষ্টপরিহারের জন্য অলৌকিক কোন উপায় বলিয়া দেয় তাহাই বেদ। সেই বেদ আবার কি লক্ষণ যুক্ত? ইহার উত্তরে সায়ণ তাঁহার ভাষ্যভূমিকাতে বেদ বলিতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণই কেবল বুঝিয়াছেন এবং মীমাংসার যুক্তিদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

সেই বেদ নামক গ্রন্থরাশি কেবলই মন্ত্রমূলক না ব্রাহ্মণভাগও তাহার অন্তর্গত—ইহার বিচার প্রয়োজন। বেদশব্দই হোক কিংবা ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদই হোক—ইহারা মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক ভাগকেই বুঝায়। অতএব বেদ বলিতে আমরা সামগ্রিকভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিকেই বুঝি।

সেই বেদ কোন লেখক রচনা করেন নাই। অনন্তকালের ন্যায় কিংবা অনাদি আকাশের ন্যায় এই শব্দরাশি অনাদি ও অপৌরুষেয়। শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে শব্দরাশি-মূলক বেদ পদার্থও যে নিত্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যুগান্তে এই শব্দরাশি প্রচ্ছন্ন আকারে বর্ত্তমান থাকে, যুগপ্রারম্ভে আবার স্বয়ং প্রকাশিত হয়। সেইজন্য ইহা স্বয়ম্ভূ।

বেদের অনাদিত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব

কিন্তু এই বিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—এই দুইভাগে বিভক্ত গ্রন্থরাশি আর্যদের ধর্মগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়া আছে—ইহা আর্যাবর্ত্তের অধিবাসী বহুদর্শী মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনামাত্র এবং মহর্ষিগণ সেই পরিস্থিতিকে সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গ্রন্থাকারে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সেই সময়ে যে সকল দেবতা ঋষিগণের মানসনেত্রে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই মন্ত্রে স্তুত হইয়াছেন। সেই সমস্ত মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত করিয়া যে গ্রন্থের সৃষ্টি হইল, তাহাই ঋগ্বেদ। ইহাকেই আমরা ঋক্‌সংহিতাও বলিয়া থাকি। পৃথিবীর ইহা একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্ত্য মত

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে বেদের মন্ত্রভাগ ব্রাহ্মণভাগের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহাদের বিচারের মানদণ্ড ভাষা, ছন্দ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ। ইহা ছাড়াও দেবদেবীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, দার্শনিক মতের আবির্ভাব ও যাগযজ্ঞের প্রাধান্য তাঁহাদের উক্ত মতকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। কিন্তু এই মত নানাকারণে বিচারসহ নয়। যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

এই মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ প্রথমতঃ চারিভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। অবশ্য প্রথমে অথর্ববেদ কতকগুলি কারণে বেদ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সেই জন্যই বেদের সংহিতা বুঝাইতে অনেক স্থলেই 'ত্রয়ী' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

সংহিতার চারিভাগ

ঋগ্বেদ কতকগুলি ঋকের সমষ্টিমাত্র। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের নামই ঋক্। ছন্দোহীন গদ্যাত্মক মন্ত্রই যজুঃ। ঋকের অন্তর্গত গেয় পদার্থের যখন গান করা হয় তখনই তাহা সাম। আর ছন্দোবদ্ধ ঋগ্বিশেষই প্রধানতঃ অথর্বাঙ্গিরস বলিয়া পরিচিত। অথর্ববেদে অবশ্য ঋক্, যজুঃ ও সাম অর্থাৎ পদ্য, গদ্য ও গানের সমন্বয় ঘটিয়াছে—তবে ঋকের সংখ্যাই সেখানে বেশী।

এই চারিবেদের আবার প্রত্যেকটির অনেকগুলি শাখা আছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতে ঋগ্বেদের ২১টি শাখা, সামবেদের সহস্রশাখা, যজুর্বেদের ১০০টি ও অথর্ববেদের ৯টি শাখা। কালক্রমে ইহাদের অনেক শাখা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে কয়েকটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাদের আলোচনা বিভিন্ন বেদের অধ্যায়ে করিব।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

ঋগ্বেদের দুইটি ব্রাহ্মণ ও দুইটি আরণ্যক। ব্রাহ্মণ দুইটির নাম—ঐতরেয় ও কৌষীতকী। আরণ্যক দুইটি যথাক্রমে ঐতরেয় ও কোষীতক।

যজুর্বেদের দুইটি 'recension' বা রূপ—শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। এই বেদ দুই recensionএ বিভক্ত হওয়ার কারণ যজুর্বেদের অধ্যায়ে বলিব। স্থূলভাবে যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রচারিত বেদের নাম শুক্ল যজুর্বেদ ও বৈশম্পায়ন যে যজুর্বেদকে সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাই কৃষ্ণ যজুর্বেদ। শুক্ল যজুর্বেদ পদ্যে রচিত, কৃষ্ণ যজুর্বেদের বেশীর ভাগই গদ্য। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ৩টি শাখা। উহার তৈত্তিরীয় শাখায় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ রহিয়াছে। শুক্ল যজুর্বেদের দুইটি

শুক্ল ও কৃষ্ণ

শাখা মাত্র পাওয়া যায়। তাহাদের নাম কান্ব ও মাধ্যন্দিন। এই উভয় শাখারই পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ব্রাহ্মণ আছে। সেই ব্রাহ্মণ ভাগ 'শতপথ ব্রাহ্মণ' নামে প্রসিদ্ধ। সামবেদের শাখা ৩টি। ইহার ব্রাহ্মণ ৮টি-তাণ্ড্য, ষড্‌বিংশ, মন্ত্রদৈবত, আর্ষেয়, সামবিধান, সংহিতোপনিষদ্, বংশ ও জৈমিনীয়। ইহার মধ্যে তাণ্ড্য ব্রাহ্মণই আকারে বৃহৎ ও বিষয়বস্তুতে শ্রেষ্ঠ, সেজন্য ইহার নাম 'মহাব্রাহ্মণ'।

অথর্ববেদের সংহিতা দুইটি। ব্রাহ্মণ একটিই মাত্র পাওয়া যায়—নাম গোপথ।

'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ 'বেদের ব্যাখ্যাভাগ', কারণ বেদকে ব্রহ্ম বলিয়া ঋষিগণ মনে করিতেন। 'সংহিতা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবশ্য যাহা কাছাকাছি থাকে [পরঃসন্নিকর্ষঃ সংহিতা]। অর্থাৎ মন্ত্রগণ পরস্পর সন্ধি-সূত্রে সংবদ্ধ। এই মন্ত্র বা সংহিতারই ব্যাখ্যাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়।

চারিবেদের পুনরায় আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগ আছে। অরণ্যে যাহা সৃষ্ট হইয়াছিল বা অরণ্যে যে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সন্ধান আর্যঋষিগণ জীবনের শেষভাগে পাইতেন তাহাই আরণ্যক। আর ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান লাভ বা আলোচনার নাম উপনিষদ্। যে গ্রন্থে এই বিদ্যা লিপিবদ্ধ করা হইত, তাহাকেও উপনিষদ্ বলা হয়।

আরণ্যক ও উপনিষদ্

বেদের আরণ্যকভাগের মধ্যে ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—উপনিষৎ সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেন ঃ—"প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে বেদকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কিন্তু এই দুই নামে কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই। বৈদিক যে কোনো গ্রন্থে বা তাহার অংশবিশেষে কর্ম ও জ্ঞানের আলোচনা আছে তাহাকেই যথাক্রমে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়।" সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাধারণভাবে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, আর আরণ্যক ও উপনিষৎ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

অত্যন্ত গূঢ় বেদ শাস্ত্রের অর্থ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহারা বেদাঙ্গ বা বেদের অঙ্গীভূত অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশনামে বিখ্যাত। বেদাঙ্গ পুরুষ কর্তৃক রচিত অর্থাৎ পৌরুষেয়। শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি অঙ্গ বেদপাঠোদ্ধারে যথেষ্ট সাহায্য করে।

বেদাঙ্গ

দুই

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল জানিবার জন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ যে গভীর আলোচনায় লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে বলিয়া রাখা দরকার যে ঋগ্বেদ কোন একখানি গ্রন্থ মাত্র নয়, কিন্তু ইহা গ্রন্থাকারে অনেকগুলি দৃষ্ট মন্ত্রের সমষ্টি মাত্র। অধ্যাপক ভি. এস্. ঘাটে (V. S. Ghate) বলিয়াছেন, "I have to warn you that when we call the Rigveda a book we must not understand the statement literally. If a book means a work written by one man, implying unity of time and iedas, well, the Rigveda is far from being a book. It is rather a compilation.[১]

সংকলন কাল

আস্তিক মতে ঋগ্বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। শুধু ঋগ্বেদ কেন, ঋগ্বেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ যুগের শেষভাগ পর্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়, সবগুলিই অনাদি ও অপৌরুষেয়, তাহা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, কারণও কিছু প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক মতে ঋগ্বেদ পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ; খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে ইহা রচিত হইয়াছিল। ভৌগোলিক বিবরণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচার এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ঋগ্বেদ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম গ্রন্থ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহা লোকমুখে চলিয়া আসিতেছিল, লিপিবদ্ধ হয় নাই, কারণ প্রাচীন ভারত লিপির অপেক্ষা স্মৃতিকেই বেশী প্রাধান্য দিয়াছিল। যাহা হউক, আধুনিক বিচারে ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক কোন সময় তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে বলিব।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার সর্বপ্রথম বেদের রচনাকাল বা সংকলনকাল স্থির করার চেষ্টা আরম্ভ করেন। তাঁহার মতে ঋগ্বেদ আনুমানিক ১২০০-১০০০

১। Ghate's Lectures on Ṛgveda-Sukthankar পৃঃ ৫৮

খৃষ্টপূর্বাব্দে রচিত বা সংগৃহীত হয়। পরবর্তীকালের গবেষণায় এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ম্যাকডোনেলের মতে ঋগ্বেদ ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে রচিত। দার্শনিক স্যার রাধাকৃষ্ণন ও ভাষাবিদ্ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঋগ্বেদ যথাক্রমে দর্শন ও ভাষার ভিত্তিতে ১৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে রচিত। ভিণ্টারনিৎস্ সব সময়েই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁহার মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ২৫০০-২০০০ খৃঃ পূঃ অব্দ। মহারাষ্ট্রকেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের মতে ঋগ্বেদ এবং অপর কয়েকটি বৈদিক গ্রন্থের কাল খৃঃ পূঃ ৬০০০ অব্দ। কিন্তু জার্মাণ জ্যোতির্বিদ জেকবির মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪৫০০। তাঁহার মতে ঋগ্বেদের সভ্যতার কাল সাধারণভাবে খৃঃ পূঃ ৪৫০০-২৫০০ অব্দ।[১] দেশমুখ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে আর্যসভ্যতা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা সমসাময়িক।[২]

অবিনাশচন্দ্র দাস ঋগ্বেদের রচনাকাল ১৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দ বলিয়া মনে করেন এবং সে সম্পর্কে তাঁহার সহিত ভিণ্টারনিৎসএর যথেষ্ট মতান্তর ঘটে। আমাদের মতে, ভিণ্টারনিৎসএর মত অনেকাংশেই যুক্তিসহ, যদিও ঋগ্বেদের রচনাকাল কখনও নিশ্চিতভাবে জানা যাইবে কিনা সেই বিষয়ে অধ্যাপক হুইট্‌নে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের বিষয়বস্তু প্রাচীন আর্য্যগণের সাধনা, কৃষ্টি ও দেবদেবীগণের প্রতি তাঁহাদের ভক্তিমিশ্রিত ও বিস্ময়বিহ্বল স্তবস্তুতি। আর্যগণ যখন প্রথম ভারতে আগমন করেন, তখন এই সুবিশাল দেশের বিরাট রূপ ও বৈচিত্র্য তাঁহাদিগকে বিস্ময়ে বিমোহিত করিয়া দিয়াছিল। প্রকৃতির ধ্যানগম্ভীর রূপ, ঋতুতে ঋতুতে তাহার বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন, তাহার রুদ্র ও শান্ত সুন্দর পরিবেশ তাঁহাদের আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং প্রকৃতির মূলে যে সকল সনাতনী দেবতা ছিলেন, তাঁহাদের স্তবে আর্যগণ নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছেন। বিশাল অরণ্যানী, অতল সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, অসীম

১। Winternitz—A History of Indian Literature, Vol. I পৃঃ ২৯৬

২। The Indus Civilisation in the Ṛgveda—P. R. Deshmukh

শক্তিশালী মরুৎগণ, বজ্রমেঘ ও বারিবর্ষণের মূলে যে প্রকৃতি, হাস্যময়ী উষা, জ্যোতির্ম্ময় শক্তির উৎস আদিত্য তাঁহাদের মনে বিস্ময় মিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন। যাহা হউক, ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা ভারতে আর্যযুগের প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন পাই। ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিলে মনে হয়, সেই সুপ্রাচীন যুগেও আর্য্যগণ সভ্যতার উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন কি করিয়া! অল্পকথায়, ঋগ্বেদে আর্যদের ভারতে রাজ্যবিস্তারের প্রথম প্রয়াস বর্ণিত আছে। সেই প্রসঙ্গে ত্রিৎসু-গোষ্ঠীর সুদাসের সহিত দশজাতির রাজগণের যুদ্ধ, আর্য অনার্যের সংঘর্ষ, দেবদেবীগণের নিকট আর্যদের ধনধান্য হস্তিঅশ্বহিরণ্যক্ষেত্রপুত্রপৌত্রাদি প্রার্থনা, দার্শনিক ও যাজ্ঞিক মতের সমর্থনে রচিত মন্ত্রাদি ঋগ্বেদের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

বিষয় বস্তু

ঋগ্বেদের বিষয়বস্তুকে দুইভাগে ভাগ করার প্রথা প্রচলিত। এক হিসাবে ঋগ্বেদ অষ্টক, অধ্যায় এবং বর্গে ও ঋকে বিভক্ত। অপর মতে, ঋগ্বেদ মণ্ডল, অনুবাক ও সূক্তে ঋকে বিভক্ত। প্রথম মত একমাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত—অধ্যয়নের সুবিধা অনুসারেই এই প্রকার ভাগ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদ আটটি অষ্টক, চৌষট্টি অধ্যায় এবং অনেকগুলি বর্গে বিভক্ত। যাজ্ঞিকগণ সাধারণতঃ অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গগত বিভাগই গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ঘাটের মতে "This division is purely mechanical and comparatively modern." দ্বিতীয় মতে ঋগ্বেদ মণ্ডল, অনুবাক ও সূক্তে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ যুগ হইতে এই মত চলিয়া আসিতেছে। এই মতের মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল আছে। প্রথম মণ্ডলে ২৪টি অনুবাক (খণ্ড বা section), দ্বিতীয়ে ৪টি; তৃতীয়, চতুর্থ প্রত্যেকটিতে ৫টি; পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমে প্রত্যেকটিতে ৬টি; অষ্টমে ১০টি; নবমে ৭টি ও দশমে ১২টি অনুবাক আছে। প্রত্যেকটি অনুবাক আবার কতগুলি সূক্তের সমষ্টি এবং প্রত্যেকটি

বিভাগ

অষ্টক ও মণ্ডল গত

সূক্ত কতকগুলি ঋক বা বৈদিক শ্লোকের সমষ্টি। ঋগ্বেদে মোট ১০২৮টি সূক্ত আছে। ইহার মধ্যে ১১টি সূক্ত "খিল" নামে অভিহিত, 'খিল' শব্দের অর্থ supplement বা 'পরিশিষ্ট'। ভিন্টারনিৎস্এর মতে খিল সূক্তগুলি ঋগ্বেদ রচনার দীর্ঘকাল পরে আদি অংশের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল।

শাস্ত্র মতে ঋগ্বেদের কোন সূক্তের পঠন পাঠনের জন্য সেই সূক্তের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব থাকিলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সেজন্য :—

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ।
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়াঞ্জায়তে তু সঃ॥

ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ

কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণীর মতে—'যস্য বাক্যংস ঋষিঃ' অর্থাৎ যিনি মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন তিনিই ঋষি; যিনি মন্ত্রে ঋষি কর্তৃক উক্ত বা স্তুত হইয়াছেন তিনিই দেবতা। অক্ষরের পরিমাণে যে মন্ত্র রচিত তাহাই ছন্দ। যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপের সহিত যাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাই বিনিয়োগ। [বিনিয়োগঃ নাম কর্ম্মভিঃ সম্বন্ধঃ।][১]

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় হইতে সপ্তম মণ্ডল আর্ষ মণ্ডল (Family Books) নামে প্রথিত। যথাক্রমে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ এই মণ্ডলগুলির স্রষ্টা। ইহারা নিজেই অথবা বংশপরম্পরায় এক একটি মণ্ডলের সূক্তগুলি লাভ করিয়াছিলেন। দর্শনাদৃষিত্বম্—দেখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ঋষি। এই দর্শন ধ্যানযোগেই লাভ করা যায়। পাপ বা অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতি হইতে যাহা রক্ষা করে তাহাই ছন্দ। মন্ত্রে স্তুত ব্যক্তিই দেবতা। ঋগ্বেদে প্রধানতঃ ৭টি ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী। গায়ত্রী অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট ত্রিপাদ সমন্বিত। উষ্ণিক্ ২৮ অক্ষর সম্বলিত। অনুষ্টপ্ ৩২, বৃহতী

১ Vedic Selections (C. U.) edited by Dr. Kshitish Chatterjee পৃঃ ১ (foot note) সায়ণ

৩৬, পংক্তি ৪০, ত্রিষ্টুপ্ ৪৪ ও জগতী ৪৮ অক্ষরে রচিত। ঋগ্বেদে দ্যৌঃ, পৃথিবী, বরুণ, ঋত, মিত্র, সূর্য, সবিতৃ, বিষ্ণু, পূষন্, উষস্, অশ্বিদ্বয়, অদিতি, অগ্নি, সোম, পর্জন্য, ইন্দ্র, বায়ু, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি দেবদেবীগণ স্তুত হইয়াছেন। প্রত্যেকটি মন্ত্র ও সূক্তকে যজ্ঞের কোন না কোন প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহা ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থান্বেষণের ফল বলিয়া মনে করেন। মনে হয়, ঋগ্বেদে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যজ্ঞের বিকাশ দেখা যায়। যেমন ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই যজ্ঞের অঙ্গগুলি ধরা যাউক। অগ্নি দেবতা, তাঁহাকে পূজা করা হইতেছে, তিনি যজ্ঞের দেবতা—এখানে বিষয় ও বিষয়ের অধিষ্ঠাতা, ঋত্বিক্ বা ঋতুতে যে যজ্ঞের প্রথা ছিল অর্থাৎ চাতুর্মাস্য যাগ প্রভৃতি তাহার পুরোহিত, হোতা বা ঋগ্বেদীয় পুরোহিত, রত্নপ্রসবিনী দেবতা, অর্থাৎ দেবতার নিকট ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা—সকলই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে পরবর্ত্তীকালে সোমযাগ, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের বিনিয়োগ প্রদর্শন করা হইয়াছে।[১]

ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার মধ্যে ভাষা, ছন্দ ও দার্শনিক বিচারে পাশ্চাত্ত্য ও আধুনিক মতে কোন কোন অংশ সুপ্রাচীন, কোন কোন অংশ আবার অর্বাচীন। ঋষিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মণ্ডলগুলি (২—৭ মণ্ডল) প্রাচীন অংশ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইহাদের ছন্দ ও ভাষা সুপ্রাচীন। সোমযজ্ঞের সহিত কোন পরিচয়ই এগুলিতে নাই। প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশমমণ্ডলকে অর্বাচীন বলিয়া মনে করিবার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। অষ্টম মণ্ডল ঋষিগোষ্ঠী কর্তৃক দৃষ্ট মণ্ডল নহে। এই মণ্ডলে আর্য মণ্ডলের ন্যায় রচনাপ্রক্রিয়ায় কোন বিশিষ্ট নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। নবম মণ্ডল সোম পবমানের স্তব স্তুতিতেই পূর্ণ। এই সোম পবমানের স্তুতি থাকার জন্য, ঋগ্বেদকে পরবর্ত্তীকালে যজ্ঞের সহিত সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ যাগ সোমযাগ। সামবেদের উদ্ভবও এই ঋগ্বেদের

১ "Sacrifice in the Ṛgveda"—K. R. Potdar দ্রষ্টব্য

নবম মণ্ডল হইতে—ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম মণ্ডলও ভাষা ও ছন্দের ভিত্তিতে ঋগ্বেদের আদিম অংশ বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, ঋগ্বেদের সহিত অন্যান্য যজ্ঞপ্রধান বেদের সামঞ্জস্য রাখিবার উদ্দেশ্যে ইহার কয়েকটি সূক্ত রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। দশম মণ্ডল যে নিশ্চয়ই ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশ, ইহা অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করেন। "Vedic Age" গ্রন্থে ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ বলেন (পৃঃ ৩৩৯) যে দশম মণ্ডলের ভাষা, ছন্দ, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সূক্তনিচয় ও যজ্ঞের সার্থকতা বা দেবতার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ প্রভৃতি ইহার অর্বাচীনতা স্পষ্টতঃই প্রমাণ করিয়া দেয়। "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?" কিংবা দেবীসূক্তে যে সন্দেহ অথবা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে, ঋগ্বেদের অপর কোন মণ্ডলে এ তত্ত্ব বা সন্দেহ দেখিতে পাই না। দশম মণ্ডলে বর্ণিত সামাজিক অবস্থাও অন্যান্য মণ্ডলস্থিত সমাজের রীতিনীতি অপেক্ষা অনেক উন্নততর। এই মণ্ডলে জাতিভেদের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে বলা আছে যে বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিলেন। বাহু হইতে রাজন্য, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিলেন। (ঋগ্বেদ ১০।৯০।১২)। পারিবারিক জীবনের পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যায় (ঋগ্বেদ ১।২৪।১২—১৫; ৫।২।৭; ১।১১৬।১৬)। এই বেদের অক্ষসূক্তে দ্যূতাসক্তের শোচনীয় পরিণতির অনুতাপের মধ্যে তৎকালীন সামাজিক অনেক তথ্যই নিহিত আছে। (ঋগ্বেদ ১০।৩৪)। দশম মণ্ডলের ভাষা পরবর্তী classical যুগের ভাষার ন্যায়। ত্রিষ্টুপ্ জগতী প্রভৃতি ছন্দে ইহার অনেকগুলি সূক্ত রচিত। ছন্দের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৃহদাকারের ছন্দ ভাষার উন্নতি এবং অগ্রগতি সূচনা করে। তাই, অনেকে এই মণ্ডলের ছন্দবিচারে ইহাকে পরবর্তীকালে ঋগ্বেদের সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন।

প্রাচীন ও অর্বাচীন অংশ

ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন যুগে ইহার আবির্ভাব। ডাঃ Maxmüller তাঁহার "India : What can she teach

us ?" গ্রন্থে ঋগ্বেদকে পৃথিবীর প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি এবং ইহাই আদিম গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলেও ঋগ্বেদের অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ ইন্দো—ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অন্যতম

সমগ্র ঋগ্বেদ পদ্যে রচিত। এই পদ্য বা ছন্দোবদ্ধ পদসমষ্টি সাধারণতঃ সাতটি প্রধান ছন্দে রচিত। ঋগ্বেদের ভাষা কবিত্বময় ও তাহার মধ্যে অনুপ্রাস, উপমা ও রূপক প্রভৃতি সরল শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিকাশ দেখা যায়। 'মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ', উপমার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। উষার বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের ঋষিগণ যে inspried (অনুপ্রেরিত) ছন্দ ও ভাষার অবতারণা করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। (ঋগ্বেদ ৫।৮০।৫,৬ ; ৬।৪৬)

পদ্যে রচিত

ঋগ্বেদের প্রতিটি সূক্তের (hymn) সাধারণতঃ দুইটি করিয়া পাঠ পাওয়া যায়—সংহিতাপাঠ ও শাকল্যের পদপাঠ। (Winternitz vol. I, p 283) সংহিতাপাঠে শব্দগুলি সংঘবদ্ধ আকারে সমাস, সন্ধি প্রভৃতির নিয়মানুসারে সজ্জিত দেখা যায়। পদপাঠে প্রত্যেকটি পদকে সন্ধি, সমাস প্রভৃতির নিয়ম হইতে বিযুক্ত করিয়া পৃথগাকারে পাওয়া যায়। উভয়ক্ষেত্রেই পদসমুচ্চয় উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, প্রচিত, কম্প প্রভৃতি স্বরসম্বলিত দেখা যায়। ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত মাত্র স্বরবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। শাকল্য নামক ঋষি অতি প্রাচীনকালে এই পদপাঠ রচনা করিয়াছিলেন, অতএব ইহা অনার্ষ। কিন্তু নিরুক্তকার যাস্কেরও বহু পূর্ববর্তী এই শাকল্য। তাঁহার পদপাঠ ঋগ্বেদের পাঠোদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—পদপাঠ পূর্বে না সংহিতাপাঠ পূর্বে ইহা লইয়া যথেষ্ট বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এখনও নিশ্চিতরূপে কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে মনে হয় ঋষিগণ যে সকল মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন বা ধ্যানযোগে দর্শন করার পর তাঁহাদের মুখ হইতে যে সকল মন্ত্র নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই সংঘবদ্ধ ছিল, কারণ সাধারণ মানুষ কখনই সন্ধি বিযুক্ত করিয়া শব্দরাশি উচ্চারণ করেনা—সংহিতাপাঠে সন্ধি

সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ

ও সমাস সাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই আসিয়াছে—ইহাদের জন্য বিশেষ কোন বৈয়াকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় নাই। ভাষা আগে, তারপর ব্যাকরণ—এই মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইলে ঋগ্বেদের পদপাঠ সংহিতাপাঠের পরবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে। সংহিতাপাঠকে পদপাঠে ও পদপাঠকে সংহিতাপাঠে পরিবর্ত্তিত করা যায় পাণিনির বৈদিক প্রক্রিয়ার সূত্রাদির সাহায্যে।

ঋগ্বেদীয় সংহিতাপাঠ যাহাতে উত্তরকালে বিকৃত না হইয়া যায় তাহার জন্য বৈদিক ঋষিগণ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ঐ উদ্দেশ্যে জটাপাঠ, ক্রমপাঠ ও ঘনপাঠের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সংহিতামন্ত্রঃ

ওষধয়ঃ সংবদন্তেসোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈকৃণোতিব্রাহ্মণস্তংরাজন্ পারয়ামসি॥ (ঋগ্বেদ ১০।৯৭।২২)

মন্ত্রপাঠঃ

ওষধয়ঃ সং বদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্ তং রাজন্ পারয়ামসি॥

পদপাঠঃ

ওষধয়ঃ। সং। বদন্তে। সোমেন। সহ। রাজ্ঞা।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
যস্মৈ। কৃণোতি। ব্রাহ্মণঃ। তং। রাজন্। পারয়ামসি॥
৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

ক্রমপাঠঃ

ওষধয়ঃ সং। সং বদন্তে। বদন্তে সোমেন। সোমেন সহ।
১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫
সহ রাজ্ঞা। রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা॥
৫ ৬ ৬ ৬
যস্মৈ কৃণোতি। কৃণোতি ব্রাহ্মণঃ। ব্রাহ্মণস্তং। তং রাজন্।
৭ ৮ ৮ ৯ ৯ ১০ ১০ ১১

রাজন্ পারয়ামসি। পারয়ামসীতি পারয়ামসি ॥
১১ ১২ ১২ ১২

জটাপাঠঃ

ওষধয়স্ সং, সমোষধয়, ওষধয়স্ সম্
১ ২ ২ ১ ১ ২

সং বদন্তে, বদন্তে সং, সং বদন্তে।
২ ৩ ৩ ২ ২ ৩

বদন্তে সোমেন, সোমেন বদন্তে, বদন্তে সোমেন।
৩ ৪ ৪ ৩ ৩ ৪

সোমেন সহ, সহ সোমেন, সোমেন সহ।
৪ ৫ ৫ ৪ ৪ ৫

সহ রাজ্ঞা, রাজ্ঞা সহ, সহ রাজ্ঞা ॥ রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা ॥
৫ ৬ ৬ ৫ ৫ ৬ ৬ ৬

যস্মৈ কৃণোতি, কৃণোতি যস্মৈ, যস্মৈ কৃণোতি।
৭ ৮ ৮ ৭ ৭ ৮

কৃণোতি ব্রাহ্মণো, ব্রাহ্মণঃ কৃণোতি, কৃণোত ব্রাহ্মণঃ।
৮ ৯ ৯ ৮ ৮ ৯

ব্রাহ্মণ স্তং, তং ব্রাহ্মণো, ব্রাহ্মণ স্তম্।
৯ ১০ ১০ ৯ ৯ ১০

তং রাজন্, রাজং স্তং, তং রাজন্।
১০ ১১ ১১ ১০ ১০ ১১

রাজন্ পারয়ামসি, পারয়ামসি রাজন্ রাজন্, পারয়ামসি ॥
১১ ১২ ১২ ১১ ১১ ১২

পারয়ামসীতি পারয়ামসি ॥
১২ ১২

ঘনপাঠঃ [দ্রষ্টব্য সাতবালেকর ঋগ্বেদ পৃঃ ৮০৫-৮০৬]

রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা। সহ রাজ্ঞা। সোমেন সহ। বদন্তে সোমেন। সং বদন্তে। ওষধয়ঃ সং। সং বদন্তে। বদন্তে সোমেন। সোমেন সহ। সহ রাজ্ঞা। রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা।

পারয়ামসীতি পারয়ামসি। রাজন্ পারয়ামসি। তং রাজন্।

ব্রাহ্মণস্তং। কৃণোতি ব্রাহ্মণঃ। যস্মৈ কৃণোতি। কৃণোতি ব্রাহ্মণঃ।

ব্রাহ্মণস্তং। তং রাজন্। রাজন্ পারয়ামসি। পারয়ামসীতি পারয়ামসি ॥

সূত্র ঃ—(ক) পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা (পাণিনি ১।৪।১০৯)

(খ) পদবিচ্ছেদোঽসংহিতঃ (কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য)

(গ) ক্রমেন পদদ্বয়স্য পাঠঃ („ „ ৪।১৮),

(ঘ) ক্রমে যথোক্তে পদজাতমেব দ্বিরভ্যসেদুত্তরমেব পূর্বম্। অভ্যস্য পূর্বঞ্চ তথোত্তরে পদেঽবসানমেবং হি জটাঽভিধীয়তে।

(ঙ) অন্তাৎ ক্রমং পঠেৎ পূর্বমাদিপর্যন্তমানয়েৎ। আদিক্রমং নয়েদন্তং ঘনমাহুর্মনীষীণঃ।

পদপাঠের পর ক্রমপাঠ রচিত হয়। 'ঐতরেয় আরণ্যকে' ক্রমপাঠের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রত্যেক পদটি দ্বিরুক্ত হইয়াছে। পূর্বপদের সহিত পরপদ এবং পরপদের সহিত পরপদ সম্বন্ধ আছে।

ঋগ্বেদের একটি নাম হৌত্রবেদ। ঋগ্বেদীয় পুরোহিতের নাম পরবর্ত্তী কালে হোতা বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। যজ্ঞে ঋগ্বেদীয় পুরোহিতের কাজ আহুতি দেওয়া বা সায়ণের অনুযায়ী মতান্তরে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞের লক্ষ্যীভূত দেবতাকে আবাহন অরিয়া আনা। তাই হোতার সহিত ঋগ্বেদ সংহিতার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হোতার প্রসঙ্গ ঋকের মধ্যেই আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন—কারণ অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে অগ্নিকে হোতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তিনিই যজ্ঞের দেবতা, হোতা ও ঋত্বিক্।

হোতার সহিত সম্বন্ধ

ঋগ্বেদের ব্যাখ্যাপদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। ভিণ্টারনিৎস্ বলিয়াছেন, "This is one of the many points on which the

interpreters of the Rgveda diverge rather widely" (পৃঃ ৬৮)। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে ঋগ্বেদের পরিপূর্ণ ব্যখ্যা আজও পাওয়া যায় নাই এবং কোনো কালে পাওয়া যাইবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেক ঋকেরই হয়ত নিশ্চিত ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর নহে, কিন্তু আবার অনেক ঋক্‌ও আছে যাহাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কেন এমন হয় সে সম্বন্ধে ভিণ্টারনিৎস্ বলেন, "The reason lies in the great age of these hymns which to the Indians themselves, already in very early times had become unintelligible." (পৃঃ ৬৯) বৈদিক সাহিত্যের যুগেই ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের অর্থ রহস্যময় ও দুর্বোধ্য হইয়া গিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় মনীষিগণ নিঘণ্টু বা বৈদিক শব্দসমুদয়ের সাহায্যে ঋগ্বেদের মন্ত্রার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাস্কই ঋগ্বেদের প্রথম ব্যাখ্যাতা। নিরুক্তের মধ্যে বহুস্থলেই তিনি তৎকালেই দুর্বোধ্য ঋক্‌গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাস্কের পরবর্তী অনেক ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। বিজয়নগর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আচার্য সায়ণ ঋগ্বেদের অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই বিখ্যাত সায়ণভাষ্য। H. H. Wilson তাঁহার ঋগ্বেদ-অনুবাদে সায়ণকে অনুসরণ করিয়াই তাহার অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ অনেকেই কিন্তু ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন। Rudolph Roth ও H. Grassmann তাঁহাদের অন্যতম। আবার অনেক গবেষক ঋগ্বেদের ব্যাখ্যার বিষয়ে মধ্যপন্থী। Ludwig, Geldner ও Pischel তাঁহাদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। "While admitting that we must not blindly follow the native interpreters, they yet believe that the latter did, partly at least, draw upon an uninterrupted tradition and therefore should not be disregarded, and that simply because they are Indians and moreover better acquainted with the Indian atmosphere, as it were, than (the) Westerners, they often hit the right meaning," (Winternitz Vol I পৃঃ ৭১)

ঋগ্বেদের ব্যাখ্যার পদ্ধতি

ঋগ্বেদ তথা অন্যান্য বেদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রণালী প্রচলিত। তন্মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ সাধারণভাবে বৈদিক সাহিত্যকে inspired writing বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি বৈদিক সাহিত্যের তথা গ্রন্থের symbolic ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পণ্ডিত কপালী শাস্ত্রীও ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা অরবিন্দ-মতানুসারেই করিয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ (আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা) নূতনভাবে বেদের ব্যাখ্যা ও বেদচর্চা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যায় এক অভিনবপন্থায় বৈদিক সাহিত্যের মূলতত্ত্বগুলির আলোচনা হয়। অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের সূর্য্যপরত্বে ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার মতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বেদে সূর্য্যই একমাত্র দেবতা যিনি স্তুত হইয়াছেন, এইধারণা প্রচলিত ছিল। গণিত ও জ্যোতিষের সাহায্যে তিনি নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করিতেন যে বেদে সূর্য্যই একমাত্র দেবতা। সূর্য্যের বিভূতি তিন প্রকার:—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের মধ্যে সূর্য্যই বৃহত্তম ও প্রত্যক্ষ দৃশ্য। তিনিই হিরণ্ময় পাত্র। তিনিই সত্য বা ধ্রুবলোকের পথ আচ্ছন্ন করিয়া থাকেন ইত্যাদি। 'ঐতরেয় আরণ্যকে'র বিভিন্ন স্থলে সূর্য্যপরত্বে বৈদিক ঋষি, ছন্দ প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে উত্তরকালের কাব্য, নাটক, দর্শন প্রভৃতির পূর্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সংস্কৃতে ক্লাসিক্যাল (classical) যুগের যে কাব্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋগ্বেদ এবং বৈদিক সাহিত্যের কাছে ঋণী। এই সমস্ত কাব্য, পুরাণ, প্রভৃতিতে যে সব অলৌকিক কাহিনী বা রসঘন রহস্যের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার সূচনা ঋগ্বেদে ('Ṛgvedic legends through the ages' দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী যুগে যে সকল myths ও legends সৃষ্ট হইয়াছে সে সম্পর্কে ভিণ্টারনিৎস্ বলেন, "What renders these hymns so valuable for us is that we see before us in them a mythology in the making." (পৃঃ ৭৫) সত্যই দেখা যায়, পরবর্ত্তী যুগের কাহিনীগুলিতে সূর্য্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম. অগ্নি, অদিতি, পৃথিবী প্রভৃতিকে লইয়া যে সকল মনোরম উপাখ্যান

সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল উপখ্যানের নায়ক নায়িকা ঋগ্বেদের যুগেই আবির্ভূত হইয়াছেন ঋষিগণের মানসচক্ষে, যেমন সীতা এই বেদের চতুর্থ মণ্ডলে দেখা দিয়াছেন। (৪।৫৭।৬)

ঋগ্বেদে উত্তরকালের কাব্য ও নাটকের উপাদান

দৃশ্যকাব্য বা নাটকের উপরে ঋগ্বেদের প্রভাব সুপরিস্ফুট। ঋগ্বেদীয় সংবাদ বা আখ্যান সূক্তকে ।যেমন যম—যমী সংবাদ, পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ ইত্যাদি) কেন্দ্র করিয়া অধ্যাপক Maxmüller যে আখ্যান - মত প্রচার করিয়াছিলেন দৃশ্যকাব্যের মূল অন্বেষণ করিবার জন্য, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। Oldenbergএর মতে ঋগ্বেদ হইতে কবিতা ভাগ নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 'আখ্যান-মতে' ঋগ্বেদের গদ্যাংশ কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কবিতাভাগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই মত অবশ্য বিচারসহ নহে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দার্শনিক মতবাদের অস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায়। নিরুক্তকার হিরণ্যগর্ভ ও দেবী প্রভৃতি সূক্তকে আধ্যাত্মিক সূক্ত বলিয়াছেন। পুরুষসূক্তে বিরাট পুরুষের আবির্ভাব ও তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। দৈর্ঘতমস সূক্তে বহু দার্শনিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বৎসর যে ছয়ঋতু সমন্বিত ও দ্বাদশমাসবিশিষ্ট—ইহার সুস্পষ্ট ধারণা এই সূক্তে আছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে সূর্য্যকে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক বিশ্বের আত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—"সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"। এই মত আরণ্যক ও উপনিষদে দৃঢ়ীভুত হইয়াছে। ঐতরেয়ারণ্যকে ঋষিগণের নামও সূর্য্যপরত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনুক্রমণিকাকার তাই বলিয়াছেন—"একৈব বা মহানাত্মা দেবতা স সূর্য ইত্যাচক্ষতে স হি সর্বভূতাত্মা"। অর্থাৎ সমগ্র বেদে দেবতা মাত্র একটিই আছেন, তিনি সূর্য্য, তিনি সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ। প্রথম মণ্ডলের আর এক স্থলেও একদেবতাবাদ ধ্বনিত হইয়াছে—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" (১।১৬৪।৪৬)। হিরণ্যগর্ভসূক্তে কোন্ দেবতাকে পূজা করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। সায়ণ "ক" শব্দের অর্থ প্রজাপতি ধরিয়াছেন। প্রজাপতি শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। (ঋগ্বেদে দার্শনিক তত্ত্ব

সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য Radhakrishnan—*Indian Philosophy*, Vol I, pp 71-73, 80—105)। ভিণ্টারনিৎস্ বলেন, "there are about a dozen hymns in the Ṛgveda which we can designate as philosophical hymns, in which, along with speculations on the universe and the creation, that great pantheistic idea of the Universal Soul which is one with the universe, appears for the first time—an idea, which since that time has dominated the whole of Indian philosophy." (পৃঃ ৯৭) "These philosophical hymns form, as it were, a bridge to the philosophical speculations of the Upaniṣads" (পৃঃ ১০০)

ঋগ্বেদে দেবতার সংখ্যা এবং তাঁহাদের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। "দেব" শব্দের অর্থ কি প্রথমতঃ তাহাই দেখা যাক্। 'নিরুক্ত' বলেন, "দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো বা ভবতি।" (৭।১৫)। দীপ্তিমান্ যিনি তিনিই দেবতা। যিনি মুক্তহস্তে দান করেন তিনিই দেবতা। সূর্য, চন্দ্র ও দ্যৌঃ দেবতা, কারণ তাঁহারা সমস্ত বিশ্বকে আলো দান করেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের মতে "the process of God-making in the factory of man's mind cannot be seen so clearly anywhere else as in the Ṛg-veda. "(*Indian Ppilosophy* Vol. I, p. 73)। বৈদিকযুগের প্রাচীনতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মন প্রকৃতির উন্মাদয়িতৃ রূপ দেখিয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিত। প্রকৃতির মধ্যে তাঁহারা প্রাণের স্পর্শ অনুভব করিতেন। প্রকৃতিকে ভালবাসা ও তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করার অর্থ যে কি ঋষিগণ তাহা ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "To them nature was a living presence with which they could hold communion. Some glorious aspects of nature became the windows of heaven, through which the divine looked down upon the godless earth (ঐ p. 73).

দেবতা

বৈদিক যুগের দেবতার আবেস্তীয় যুগের দেবতার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ডাঃ মিলস্ বলেন, "The Avesta is nearer the Veda than

the Veda is to its own epic Sanskrit." ঋগ্বেদের সুর বা দেবতা আবেস্তায় অসুর আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের মিত্র আবেস্তায় মিথ্র। ঋগ্বেদের সোম আবেস্তায় হাউমো। সেই সুপ্রাচীন যুগে মানবমনে অসীম আকাশের ন্যায় অন্য কিছুই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আকাশ অনাদি, অনন্ত, অসীম; চিরন্তনকাল ও নিরুপাধিক ব্রহ্মের প্রতিমূর্তি। পৃথিবীও মানবজীবনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন; তিনি ধরিত্রী, তিনি ধাত্রী। তাই তিনিও দেবতারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। দিবস্পৃথিবী বা দ্যাবাপৃথিবী শুধু ঋগ্বেদে কেন পরবর্তী যুগেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

বরুণ আকাশের দেবতা; √বৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন এই নামের অর্থ সমস্ত জিনিষের আবরক। তিনি বিশাল আকাশকে সমাবৃত করিয়া আছেন। মিত্র তাঁর নিত্যসঙ্গী। ঋগ্বেদের শেষভাগে বরুণকে আমরা নিষ্ঠাবান্ নৈতিক নিয়ামবলীর দেবতা হিসাবে দেখি। তিনি অলক্ষ্যে জগৎ পর্যবেক্ষণ করেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। অপরাধী দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি ক্ষমা করেন। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল বলেন, "Varuṇa's character resembles that of the divine ruler in a monotheistic belief of an exalted type."

(*Vedic Mythology*, p. 3)

বরুণ ঋতের রক্ষক। ঋত শব্দের অর্থ ধর্ম্ম, নিয়ম, বিচার। "Ṛta denotes the order of the world." বরুণ এবং মিত্র আদিত্য নামেও প্রসিদ্ধ।

সূর্যই সবিতা। তিনি দশটি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। Plato তাঁহার Republic গ্রন্থে সূর্য-পূজার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সূর্য মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুঃ স্বরূপ। তিনি জগতের স্রষ্টা ও বিধাতা। তিনি মানুষের পাপপুণ্যের সাক্ষী (ঋগ্বেদ ৭।৬০) সবিতাও একজন সৌর দেবতা। তিনি একাদশটি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। সবিতা শুধু দিবসের সূর্যই নহেন, তিনি রাত্রিরও সূর্য। আমাদের বহুপঠিত পবিত্র গায়ত্রী সবিতারূপ সূর্যেরই স্তব,

"আসুন আমরা সবিতার সেই বরেণ্য তেজঃপুঞ্জের ধ্যান করি; তিনি আমাদের অন্তর উদ্ভাসিত করুন"।

বিষ্ণুরূপী সূর্য ত্রিজগৎ ধারণ করিয়া আছেন (১।২১।১৫৪) তিনি ত্রিপাৎ। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর স্থান গৌণ। ঋগ্বেদের ১।১৫৫।৬ ঋকে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

পূষন্ আর এক সৌর দেবতা। তিনি মানবের উপকারী সুহৃৎ এবং পথ ও পশুর রক্ষক। তিনি দন্তবিহীন, পশুপালক এবং পথভ্রষ্টের রক্ষক ও দেবতা।

প্রভাতকালই ঋগ্বেদে দেবী উষার স্থান লাভ করিয়াছে। রাস্কিনের মতে উষাকালের প্রভাব মানবমনের উপর অপরিসীম। "The boundless dawn from which flash forth every morning light and life becomes the goddess Usas, the brilliant maid of morning loved by the As'vins and the sun, but vanishing before the latter as he tries to embrace her with his golden rays."

(Radhakrishnan).

অশ্বিদ্বয় প্রায় পঞ্চাশটি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা যমজ ও উজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জের আধার, চিরসুন্দর ও চিরযুবা, দেববৈদ্য এবং দ্রুতগামী। "It is supposed that the phenomenon of twilight is their material basis. That is why we have two As'vins corresponding to the dawn and the dusk." (ঐ). নিরুক্তকারও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন।

অদিতি দ্বাদশ আদিত্যের জননী। অদিতি শব্দের অর্থ অনন্ত বিস্তার বা অসীমতা। অদৃশ্য শক্তির অধিকারিণী এই দেবতা। ইনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত শক্তির আধার। ইনিই আকাশ। "অদিতিই আকাশ, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই পিতা, মাতা ও পুত্র, অদিতিই বিশ্বেদেবগণ, অদিতিই পঞ্চজন, যাহা কিছু জাত, যাহা কিছু জনিষ্যমাণ—সবই অদিতি।" (ঋ. ১।৮৯) সাংখ্যদর্শনে ইনি প্রকৃতিরূপ লাভ করিয়াছেন।

প্রকৃতিপূজার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত অগ্নি। ইন্দ্রের পরেই ঋগ্বেদের দেবগণের মধ্যে অগ্নির স্থান। ন্যূনাধিক দুইশত সূক্তে ইনি স্তুত হইয়াছেন।

ইনি দেবগণের হোতা। "অগ্নিমুখাবৈ দেবা" বা দেবগণ অগ্নির মুখে বা মাধ্যমে ভোজন করেন। "The idea of Agni arose from the scorching sun, which by its heat kindled inflammable stuff." (ঐ).

সোমদেব আর্য্যদের প্রিয়তম দেবতা। ইনি অমরত্ব দান করেন, মানব মনে প্রেরণা জাগাইতে পারেন। "What we call spiritual vision, sudden illumination, deeper insight, larger charity and wider understanding—all these are the accompaniments of an inspired state of the soul. No wonder the drink that elevates the spirit becomes divine." সোমরস আর্য্যদের মস্তিষ্কে ও কল্পনায় অগ্নি সঞ্চার করিত, তাঁহারা ইহজগতের দুঃখ, ক্লান্তি, বেদনা ও জড়তা ভুলিয়া যাইতেন ক্ষণকালের জন্যও।

যম মৃত্যু ও মৃতের দেবতা। তিনি বিবস্বানের পুত্র। ঋগ্বেদে তিনটি সূক্তে তাঁহার কথা বলা হইয়াছে। তিনি মৃতের সম্রাট্। তিনিই প্রথম দেহত্যাগ করেন এবং পিতৃলোকে তিনিই সর্বপ্রথম গমন করেন। তিনিই প্রেতলোকের অধিপতি।

পর্জন্য আকাশের দেবতা। বাত বা বায়ু মানবের মনে ভয় সঞ্চার করেন। মরুৎগণও অনুরূপ স্বভাববিশিষ্ট।

ইন্দ্রই বেদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবতা। ভারতে আর্য্যগণ প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারেন যে এদেশের সবকিছুই নির্ভর করে উপযুক্ত বর্ষণের উপর। তাই বৃষ্টির দেবতা স্বভাবতই আর্য্যগণের জাতীয় দেবতারূপে সম্মানিত হন। ইন্দ্র অন্তরিক্ষের দেবতা। "This champion-god acquires the highest divine attributes, rules over the sky, the earth, the waters and the mountains and gradually displaces Varuṇa from his supreme position in the Vedic pantheon." (Radhakrishnan)। ঋগ্বেদের সজনীয় সূক্তে ইন্দ্রের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। (ঋ ২।১২)

ইহা ছাড়া, সিন্ধু, সরস্বতী, বাক্ প্রভৃতি ঋগ্বেদে স্তুত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের দেবতা সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা করিয়াছেন Dr. Ekendranath

Ghosh তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে—*Studies on Rigvedic Deities—Astromical nnd Meteorological*" ।]

ঋগ্বেদের যুগে যে সকল দেবতার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, তাঁহারা কি করিয়া উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্পর্কে ভিণ্টারনিৎস্ বলেন যে এই দেবগণ যেন ধীরে ধীরে ঋষিগণের মানসনেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রচণ্ড মার্তণ্ড, স্নিগ্ধ চন্দ্রমা, দীপ্তিমান্ অগ্নি, হাস্যময়ী উষা, অনন্ত আকাশ, চপলা বিদ্যুৎ, ক্ষমাশীলা ধরিত্রী, নদনদী, সাগর, গ্রহনক্ষত্রতারকা—এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীই স্তুত, পূজিত ও আহুত হইয়াছেন। অতি ধীরে ক্রমশঃ ঋগ্বেদে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ দেবতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সূর্য্য, সোম, চন্দ্র, অগ্নি, দ্যৌঃ, মরুদ্গণ, বায়ু, অপ্, উষস্, পৃথিবী প্রভৃতির নাম ইহাদের আদি স্বভাবের দ্যোতনা করে। রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন—"The religion of the undeveloped man, the world over, has been a kind of anthropomorphism···Naturally we project our volitional agency and explain phenomena by their spiritual causes." (পৃঃ ৭৩)।

ঋগ্বেদের যুগে আমরা তেত্রিশটি মাত্র দেবতার সন্ধান পাই। পৌরাণিক যুগে এই তেত্রিশ দেবতাই শেষ পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ তেত্রিশ কোটি দেবতাতে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া অনেকের ধারণা। নিরুক্তকার যাস্কও এই সকল দেবতার সংবাদ জানিতেন। যাস্ক ঋগ্বেদের দেবতাসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো, বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মাহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্মপৃথক্ত্বাৎ। (নিরুক্ত, ৭ম অধ্যায় ২য় পাদ) অর্থাৎ ঋগ্বেদে দেবতা আসলে তিনটি বা তিনজন। তাঁহাদের উপাধিভেদে বা কর্মভেদে তাঁহারা বিভিন্ন দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হন। দেবগণ ভূলোক, দ্যুলোক এবং অন্তরিক্ষলোকের অধিবাসী।

ঋগ্বেদের শাখা

ঋগ্বেদের শাখা একুশটি বলিয়া মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি জানিতেন। ইদানীং মাত্র দুইটি পাওয়া যায়—(১) শাকল (২) বাস্কল।

তিন

সামবেদ

ম্যাক্সমূলার সংহিতাযুগের সময় নির্ধারিত করিয়াছেন আনুমানিক ১২০০—১০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ। ভিণ্টারনিৎসের মতে সংহিতা-যুগ আনুমানিক ২৫০০–২০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ। সামবেদ সংহিতা নিশ্চয়ই ঋগ্বেদ সংহিতার পরবর্তী। কিন্তু ইহা সংহিতাযুগেই রচিত হইয়াছিল। সামবেদের কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন।

সংকলনকাল

সামবেদ দুইভাগে বিভক্ত—পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক। "The Sāmaveda proper, i. e., the Archika, is nothing but a collection of 585 yonis. The Pūrvārchika, together with the Āraṇyaka—Saṃhitā and the Uttarārchika, represents the text-part of the Sāmaveda. The Grāmageyagāna, the Aranyageyagāna, the Uhagāna and the Uhyagāna together constitute its second part. "(*Vedic Age*, p. 230). পূর্বার্চিকে কেবল যোনি বা শ্লোকগুলি আছে। এই যোনির প্রত্যেকটির সংগে এক একটি সাম বা সুর (melody) সংযোজিত হইয়াছে। সেই সাম আবার যে ঋষির আবিষ্কার তাঁহার নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছে। এই সামগুলি গ্রামগেয়গান এবং অরণ্যগেয়গান খণ্ডে পাওয়া যায়। পূর্বার্চিকের যোনিগুলি তিন অংশে বিভক্ত :—১-১১৪ শ্লোকে অগ্নির আবাহন আছে। ১১৫-৪৬৬ শ্লোকে ইন্দ্র স্তুত হইয়াছেন এবং ৪৬৭-৫৮৫ শ্লোকে সোম পবমানের স্তব আছে। উত্তরার্চিকে প্রায় ত্রিচ ও প্রগাথ শ্লোক দেখা যায়। ত্রিচ শব্দের অর্থ তিনটি ঋক্ বা মন্ত্রের সমষ্টি। আর প্রগাথ দুইটি মন্ত্রের সমষ্টি। উত্তরার্চিক খণ্ডে কখনই একটি মন্ত্রকে একাকী দেখিতে পাওয়া যায় না। সামবেদের প্রায় সমস্ত মন্ত্রই ঋক্‌সংহিতা হইতে গৃহীত।

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু

ঋক্ মন্ত্রের উপর স্বর বসাইয়া সামসঙ্গীত গীত হইত। উদ্‌গীথ কথাটি সামসঙ্গীতেরই অপর একটি নাম। বৈদিক যজ্ঞগুলিতে যে পুরোহিত সামগান করিতেন তাঁহার নাম উদ্গাতা। সাহিত্যিক মূল্য এই বেদের বিশেষ না থাকিলেও শ্রৌত যজ্ঞ প্রভৃতিতে ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

উদ্গাতা, ঋগ্বেদের সহিত সম্বন্ধ

সামবেদের প্রধান সার্থকতা গানেই। সামসংহিতা মূলতঃ কতকগুলি গানেরই সমষ্টি। নানাপ্রকার স্বরের কথা এবং চিহ্ন আমরা সামবেদে বা সামসংহিতায় দেখিতে পাই। এখনও দাক্ষিণাত্যের সামবেদী ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ নির্ভুলভাবে এই সংগীত অভ্যাস করিয়া থাকেন।

গানেই প্রধানতঃ সার্থকতা

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে সামবেদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সঙ্গীতের ইতিহাসের আদিম অধ্যায় সামসঙ্গীত ও তাহার বিশ্লেষণ। এই যে melody বা যোনিগত স্বরের কথা ও দৃষ্টান্ত সামবেদে আছে ও যে সপ্ত স্বরের সৃষ্টি এই বেদে দেখা যায়, তাহাই পরবর্তী যুগে পল্লবিত আকারে সঙ্গীতের বিশাল ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গীতের ইতিহাসেও সামসঙ্গীত সম্ভবতঃ আদিম অধ্যায়েরই সূচনা করে। ঋক্‌সংহিতায় আমরা দেখি উদাত্ত-অনুদাত্তাদি স্বরের প্রাধান্য, সামসংহিতায় কিন্তু ষড্‌জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি স্বরের প্রাধান্য।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ইহার স্থান

বৈদিকযুগে যজ্ঞকর্ম ব্যতীত সামবেদের কোনো সার্থকতা না থাকিলেও পরবর্তীযুগে ইহা চারিবেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি।" গদ্য বা কবিতার অপেক্ষা গানের সম্মোহনী শক্তি অনেক বেশী বলিয়াই হয়ত সামবেদ পরবর্তীযুগে নিজের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ইহার সম্বন্ধে গীতা

ষড্‌জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্তস্বরের সৃষ্টি সামসংহিতার যুগেই হইয়াছিল। সামসঙ্গীতের এই স্তোভগুলি বৈদিকযুগে বিশেষ হেয় ছিল।

কুকুরের চীৎকারের সহিত এই স্তোভের তুলনা সে যুগে করা হইয়াছে।

স্তোভ—আর্যদের স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা

বৈদিকযুগে যে সামবেদ "এয়ী"র মধ্যে নিকৃষ্ট ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সভ্যতা বা ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিন্তু সামবেদের বিশেষ সার্থকতা আছে। ভারতীয় যজ্ঞ, ইন্দ্রজাল ও গানের ইতিহাসে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

সভ্যতা ও ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহার সার্থকতা

সামবেদের একসহস্রটি শাখা ছিল, পুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ। ইহাদের মধ্যে আমরা মাত্র তিনটি শাখার সন্ধান পাই। তাহাদের মধ্যে সর্বজনবিদিত হইতেছে সামবেদের কৌথুমীয় শাখা। ইহাই বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ সামসংহিতা।

শাখা

চার

যজুর্বেদ

যজুর্বেদের দুইটি রূপ দেখা যায়—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল যজুর্বেদের সমগ্র অংশই পদ্যে রচিত। কৃষ্ণ যজুর্বেদে কেবল গদ্য।

ইহার দুই রূপঃ শুক্ল ও কৃষ্ণ

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইভাগে যজুর্বেদ অতি প্রাচীনকালেই বিভক্ত হইয়াছিল। বেদব্যাস বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ ও সুমন্তকে অথর্ববেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪।৭); কি করিয়া বৈশম্পায়নকে প্রদত্ত যজুর্বেদ পুনরায় দ্বিধাবিভক্ত হইল সে সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে।

দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার আখ্যান

"বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য অত্যধিক বিদ্যাভিমানের ফলে গুরুকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া লব্ধ বেদবিদ্যা উদ্গীরণ করেন এবং উপাসনা দ্বারা সূর্যকে

তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় বেদ গ্রহণ করেন। ইহাই শুক্ল যজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা পরিত্যক্ত বেদ কৃষ্ণ যজুর্বেদ নামে পরিচিত। বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যগণ তিত্তিরিপক্ষিরূপে উক্ত পরিত্যক্ত বেদকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা তৈত্তিরীয় নামেও প্রসিদ্ধ।" (উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬)।

বিভিন্ন শাখা

যজুর্বেদের অনেকগুলি শাখা আছে। পাণিনি একশত শাখার নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ পাঁচখানি—কাঠকসংহিতা, কপিষ্ঠল-কঠসংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, তৈত্তিরীয়সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতা। ইহাদের মধ্যে শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ীসংহিতার কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন—এই দুইটি রূপ আছে।

সংকলনকাল

যজুর্বেদের সংকলনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। তবে নিঃসংশয়ে ইহা যে ঋগ্বেদের পরবর্তী, ভৌগোলিক বিবরণ, আর্যসভ্যতাবিস্তার, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতির প্রাধান্য দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। যজুর্বেদ সংহিতাযুগেই সৃষ্ট হইয়াছিল এবং কালনির্ণয়ের দিক হইতে ঋগ্বেদের রচনাকালের কিছু পরেই ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বিষয়বস্তু

যজুর্বেদের বর্ণনীয় বিষয় বিভিন্ন শ্রৌতযজ্ঞ। কোন্ যজ্ঞ কোন্ তিথিতে কিরূপ অবস্থায় কিভাবে কাহার দ্বারা করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও বিশদ নির্দেশ এই বেদের সংহিতাগুলিতে আছে। ইহাকে সায়ণ 'আধ্বর্যব বেদ' বলিয়াছেন। যজুর্বেদের পুরোহিতের নাম অধ্বর্যু। তিনিই যজ্ঞের কর্তা। এই কারণেই সায়ণ প্রথমেই যজুর্বেদের ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন, কারণ "যজ্ঞার্হত্বাদ যজুর্বেদস্যৈব প্রাধান্যম্।" বাজসনেয়ি-সংহিতা যজুর্বেদের শাখাগুলির মধ্যে সর্বশেষে রচিত হইয়াছিল, সেজন্য বাজসনেয়িসংহিতায় যজুর্বেদের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভিণ্টারনিৎস্ বাজসনেয়িসংহিতার একটি পূর্ণ বিবরণ তাঁহার *History of Indian Literature* Vol. I এ দিয়াছেন। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। যজুর্মন্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নাই।

ঋগ্বেদের সহিত যজুর্বেদের সম্পর্ক বিশেষ কিছুই নাই। তবে যজ্ঞে উভয়েরই সার্থকতা আছে। যজ্ঞব্যতিরিক্তিও ঋগ্বেদের সার্থকতা আছে। কিন্তু যজুর্বেদের নাই। ঋগ্বেদ পদ্যে রচিত, যজুর্বেদের শুক্লা শাখাও পদ্যে কিন্তু কৃষ্ণশাখা গদ্যে। হোতা ঋগ্বেদের পুরোহিত। তিনি যজ্ঞস্থলে দেবতার আবাহন করেন; অধ্বর্যু যজুর্বেদের পুরোহিত, তিনি যজ্ঞের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের পুরোধা।

ঋগ্বেদের সহিত সম্পর্ক

যজ্ঞস্থলে ঋগ্বেদ অপেক্ষাও যজুর্বেদের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। ঋগ্বেদে যজ্ঞের সম্বন্ধে বা তাহার উপাদান ও বিধান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই, যদিও পরবর্তীকালে যজ্ঞের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া তাহার যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যজুর্বেদ সাক্ষাৎভাবে যজ্ঞের সহিত যুক্ত। যাগযজ্ঞের শাস্ত্রীয় বিচার ও মূল ইহাতেই আছে।

ঋগ্বেদ অপেক্ষাও ইহার প্রাধান্য

অধ্বর্য্যুর কাজ কি এবং তিনি কে সে সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। অধ্বর্য্যু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত যজ্ঞের যিনি পুরোধা। বৈদিক যজ্ঞে যজ্ঞীয় পশুবধকে হিংসাত্মক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না। সেইজন্যই ইহার এই নাম।

অধ্বর্যু

যজুর্বেদ প্রাচীনতম গদ্যের এবং গদ্যশৈলীর নিদর্শন। যে বিশাল গদ্যসাহিত্য পরবর্ত্তী যুগে নানা শাখাপ্রশাখায় নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, তাহার মূল এই যজুর্বেদই। এই গদ্য অতি প্রাচীন বলিয়া পরবর্ত্তী যুগের সংস্কৃত গদ্যের সহিত তাহার মিল কিছুই নাই বলিলেই চলে।

প্রাচীনতম গদ্যশৈলী

যজুর্বেদের কৃষ্ণশাখাই পরবর্ত্তী যুগের ব্রাহ্মণগুলির জনক, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—নানাদিকে ইহাদের সামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, কৃষ্ণযজুর্বেদেই ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম গদ্যের নিদর্শন রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগুলিও সকলেই গদ্যে লিখিত। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণ যজুর্বেদে বৈদিক যজ্ঞের সাধারণ ও বিশেষ প্রক্রিয়াগুলি

কৃষ্ণযজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগুলিরও মূল বক্তব্য যজ্ঞপ্রক্রিয়া। সামবেদে একমাত্র সোমযজ্ঞের কথাই আছে; কিন্তু যজুর্বেদে সকল যজ্ঞেরই প্রণালী পাওয়া যায়। ভাষাগত ও বিষয়গত সাদৃশ্য ব্রাহ্মণগুলির সঙ্গে যজুর্বেদের যত বেশী, অন্য বেদের সহিত কিন্তু তত দেখা যায় না।

এইযুগে ঋগ্বেদের আদর্শবাদ ও গভীর দর্শনের একান্ত অভাব

যজুর্বেদের যুগে ঋগ্বেদের আদর্শবাদ ও গভীর দর্শনের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য—যজ্ঞাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জটিল ব্যবস্থাপ্রণালী, অধ্বর্যুগণের ও সাধারণভাবে শ্রৌতযজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণের ক্রমশঃ প্রাধান্য প্রভৃতি। নির্দোষ ও পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞদ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে—এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। "ফলে ঋগ্বেদের যুগের দেবগণের প্রতি সরল ও অটল বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভর ও দেবগণের প্রীত্যর্থে ত্যাগশীলতা প্রভৃতির অবসান হইয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে মন্ত্রশক্তি, যজ্ঞক্রিয়ার অলৌকিক ও অতিমানবীয় ক্ষমতা প্রভৃতি মানবহৃদয় অধিকার করিতেছিল।" ("সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস"—জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, পৃঃ ২৪)।

ব্রাহ্মণদের ক্রমশঃ প্রাধান্য

যজ্ঞের প্রাধান্যের জন্য এই যুগে যজ্ঞকর্ত্তা বা যজ্ঞের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য যে ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজার অভিষেক হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ উচ্চবর্ণের অতিতুচ্ছ কার্য্যবলীতেও ব্রাহ্মণদের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলেই যে পৃথিবী সকলপ্রকার মঙ্গল লাভ করিতে পারে—এই বিশ্বাস জনসাধারণের চিত্তে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইতে থাকে।

বৃহৎ যজ্ঞের সহিত পরিচয়

যজুঃসংহিতায় আমরা দর্শপূর্ণমাস (অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ) ও অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়, চাতুর্মাস্য যাগ প্রভৃতি বৃহৎ যজ্ঞের পরিচয় পাই। এই যজ্ঞগুলি অতি দুরূহ, ইহাদের নিষ্পাদন বহুক্লেশসাধ্য। আর্য্যগণ এই যুগে সাম্রাজ্য বিস্তারের পর্ব শেষ করিয়া ধীরে ধীরে সামাজিক

জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বহুদিনব্যাপী বহু ব্যয় ও ক্লেশসাধ্য যজ্ঞগুলি তাই আর্য্যগণের নিরবচ্ছিন্ন, নির্বাধ জীবনেরই পরিচায়ক।

যজুর্বেদের সহিত শ্রৌতসূত্রের সম্পর্ক অন্য যে কোনো বেদ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। শ্রৌতসূত্র পরবর্ত্তী যুগে শ্রৌতযজ্ঞের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান এবং প্রাধান্যেরই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছে। আর যজুর্বেদে শ্রৌতযজ্ঞের বিভিন্ন প্রকারের বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে। যজুর্বেদ এক কথায় যজ্ঞের বেদ। ধর্মের ইতিহাসে যজুর্বেদের স্থান অতি উচ্চে।

শ্রৌতসূত্রের সহিত সম্পর্ক

পাঁচ

অথর্ববেদ

অথর্ববেদের সংকলন কাল সম্বন্ধে ভিণ্টারনিৎস বলিয়াছেন, "there are other facts which prove indisputably that our text of the Atharvaveda—Saṃhitā is later than that of the Ṛgveda-Saṃhitā." প্রথমতঃ অথর্ববেদে যে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নিঃসন্দেহেই ঋগ্বেদীয় যুগের পরবর্ত্তী। বৈদিক আর্যগণ এখন দক্ষিণ-পশ্চিমে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেশসমূহে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অথর্ববেদে বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রেরও পরিচয় আছে। অথর্ববেদ শুধু জাতিভেদের কথাই অবগত নহে, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যও এই যুগে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। অথর্ববেদের যুগে ব্রাহ্মণগণ প্রায় দেবগণের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। দ্বিতীয়তঃ "the part which the Vedic gods play in tha Atharveda points to a later origin for the Saṃhitā." অথর্ববেদেও আমরা ঋগ্বেদের যুগের অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তাঁহাদের পরস্পরের পার্থক্য আর বোঝা যায় না।

সংকলন কাল

সর্বশেষে অথর্ববেদে যে সব দার্শনিক ও ধর্মের তত্ত্বের কথা দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্টই সূচিত হয় যে এই সংহিতা সংহিতাযুগের সর্বশেষেই সংকলিত হইয়াছিল। এখানে আমরা বহু দার্শনিক শব্দ ও তাহাদের উন্নততর ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, যাহার নিদর্শন একমাত্র উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। তথাপি অথর্ববেদের সকল অংশই যে অন্যান্য সংহিতার সকল অংশ অপেক্ষা প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুর একটি প্রধান অংশ ব্যাধি দূর করিবার জন্য গান এবং মন্ত্রের ব্যবহার। এগুলিকে ভৈষজ্য বলা হয়। এই ঐন্দ্রজালিক সঙ্গীত এবং ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিম রূপ। এই সকল ঐন্দ্রজালিক সঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলিতে গীতিকাব্যের উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ ইহারা monotonous বা একঘেয়ে। একই কথা এবং একই শব্দের পুনরাবৃত্তি মনে বিরক্তির সঞ্চার করে। এই সকল শব্দের অর্থও ইচ্ছা করিয়াই স্পষ্ট করা হয় নাই। নানা প্রকার দৈত্যদানবের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের প্রয়োগও এই বেদে করা হইয়াছে। ইহারা নানাপ্রকার অসুখের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহারা রাক্ষস ও পিশাচ নামে এই বেদে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, স্ত্রী এবং পুরুষ দৈত্য, অপ্সরা এবং গন্ধর্বের কথাও দেখা যায়। ইহারা নদী এবং বৃক্ষে সাধারণতঃ বসবাস করিয়া থাকে। সুন্দর স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবনের জন্য কামনায় এই বেদে "আয়ুষ্যানি সূক্তানি" প্রবর্তিত হইয়াছে। কৃষক, বণিক্ ও গোপালকগণের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য "পৌষ্টিক সূক্ত" সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য "প্রায়শ্চিত্তানি" নামে কতকগুলি সূক্ত পাওয়া যায়। মানবজীবনে পারিবারিক অশান্তির কারণ অনেক সময়েই কুগ্রহ। সেজন্য পরিবারস্থ লোকের মধ্যে লুপ্ত ঐক্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেকগুলি সূক্ত দেখা যায়। অথর্ববেদের অনেকাংশে বিবাহ এবং প্রেমমূলক অনেকগুলি ইন্দ্রজালাত্মক গান আছে। রাজগণের জন্যও এরূপ অনেকগুলি ঐন্দ্রজালিক গানের সন্ধান পাওয়া যায়। ভিণ্টারনিৎস সেজন্য অথর্ববেদের সহিত ক্ষত্রিয়গণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে

বিষয় বস্তু

বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মণদের স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উপযুক্ত মন্ত্রও এই বেদে রহিয়াছে। অথর্ববেদের মধ্যে দুইটি "আপ্রী" সূক্ত আছে। বোধ হয় পরবর্ত্তী যুগে যজ্ঞের সহিত এই বেদকে সম্পর্কিত করিবার জন্যই এইগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বেদে নূতন ধরণের কয়েকটি সূক্ত দেখা যায়। তাহাদের নাম 'কুন্তাপ' সূক্ত। ইহা ছাড়াও কতকগুলি দার্শনিক তথ্যের অবতারণা কতকগুলি সূক্তে করা হইয়াছে।

এই বেদের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। অথর্ববেদীয় পুরোহিত সাধারণতঃ দরিদ্র ও অজ্ঞ গ্রামবাসীর পূজা-পার্বণাদিতে অতি প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি তাহাদের সরল ও অনাড়ম্বর প্রাচীন সংস্কারগুলি যথাযথ মানিয়া লইয়া পূজার্চনাদির বিধান দিতেন এবং নিজেই তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু যেহেতু রাজধর্মেরও কতকগুলি নির্দিষ্ট সংস্কার ছিল, অথর্ববেদীয় পুরোহিত সেজন্যই রাজার একমাত্র বিশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া রাজার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকাণ্ডে গণ্য হইতেন। অথর্ববেদীয় পুরোহিত রাজাকে জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলির জন্যও উপদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, ধর্ম ও দর্শনের উপদেষ্টা, নীতিজ্ঞ, চিকিৎসক ও ঐন্দ্রজালিক। সেইজন্য অন্যান্য বেদের পুরোহিত অপেক্ষা রাজার উপর এই বেদের পুরোহিতের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশী। এই বেদে অনেক ঔষধ ও চিকিৎসার কথা বলা আছে, যাহা চিকিৎসা ও ঔষধের ইতিহাসে অতিপ্রয়োজনীয় তথ্য। ঋগ্বেদের পরেই সংহিতাযুগে অথর্ববেদ স্বীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রাধান্য ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

অথর্ববেদে আমরা আর্য্য-অনার্য্যের সংঘর্ষের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। অথর্ববেদ ছিল জনসাধারণের বেদ। অতি প্রাচীনকালে যে অথর্ববেদ আস্তিক বেদত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না সেকথা পরে বলা হইবে। এস্থলে শুধু ইহাই জানা প্রয়োজন যে অথর্ববেদ অনার্য-ধর্ম ও কৃষ্টির একটি দর্পণ-স্বরূপ। যজ্ঞের সহিত প্রথমে ইহার সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই মনে হয়। অগ্নি cult এর উপরেই অথর্ববেদ বেশী

সংস্কৃতির সংঘর্ষ

প্রাধান্য দিয়াছে, যেমন দিয়াছে ইরাণীয় আবেস্তা (Zend Avesta) কিন্তু অন্য বেদত্রয় সোমযজ্ঞের প্রাধান্যই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। দীর্ঘদিন সংঘর্ষের পর ধীরে ধীরে অথর্ববেদ বৈদিক সমাজে স্বীয় আসন লাভ করিয়াছে।

অথর্ববেদীয় ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইতেছে যে ইহা অতি প্রাচীন বা আদিম (primitive)। ঋগ্বেদেও আমরা এই আদিম ধর্মের সন্ধান পাই না। অথর্ববেদ জনসাধারণের বেদ, পূর্বেই বলিয়াছি। এই বেদে জনসাধারণের সরল ও কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস, পূজার্চনাদির বিবিধ বৈশিষ্ট্য বিবৃত হইয়াছে। অথর্ববেদীয় ধর্মের প্রধান লক্ষ্য— "To appease (the demons), to bless (friends) and to curse". (*Vedic Age*, p. 438). অন্য কোন বেদে এগুলি দেখা যায় না, অথচ এগুলি প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মের ইতিহাসে আদিম ধর্ম্মের প্রকৃতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাতে আদিম ধর্ম

অথর্ববেদে ইন্দ্রজাল ও রহস্য পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়। ভারতীয় magic বা যাদুবিদ্যার মূল এই বেদে রহিয়াছে। "শত্রু মারণাদি, হিংস্র জন্তু হইতে ত্রাণ, অভিসম্পাত বা দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা প্রভৃতি ঐহিক ফলপ্রদ যজ্ঞাদিতে ব্যবহার্য মন্ত্র" অথর্ববেদের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ঋগ্বেদেও আমরা মন্ত্রতন্ত্রের ও ইন্দ্রজালের সন্ধান পাই। (ঋগ্বেদ ৭।৫৫ ; ১০।১২২ ; ১০।১৬৩)। ঋগ্বেদের মূল বিষয়বস্তু কিন্তু শুধু এইগুলিই নহে। অথর্ববেদে ইন্দ্রজাল ও মন্ত্রতন্ত্র মূল জ্ঞাতব্য বিষয়।

ইন্দ্রজাল ও রহস্য

অথর্ববেদে কাল (Time), কাম, স্কম্ভ প্রভৃতির আরাধনা করা হইয়াছে। স্কম্ভই এই বেদে প্রজাপতি, পুরুষ ও ব্রহ্মন্। তিনি সর্বভূতে অধিষ্ঠিত, অধিদেব, বেদপুরুষ এবং নৈতিকশক্তির উৎস (অথর্ববেদ ১০।৭।৭, ১৩, ১৭)। রুদ্র পশুর দেবতা। প্রাণকে প্রকৃতিপ্রদ ও জীবনীশক্তির উৎস বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। (১০।৭)। গোজাতির পবিত্রতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং ব্রহ্মলোক, নরক প্রভৃতির পরিচয়ও আছে।

দেবতা

অথর্ববেদের ভাষাগত বিচার করা সত্যই দুরূহ, কারণ অতিপ্রাচীন বিষয়ের বর্ণনা অনেক সময় ইহাতে অতি আধুনিক ভাষায় করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার ভিতরে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যাহা ঋগ্বেদেও archaic বলিয়া গণ্য হইতে পারিত।

ভাষা

অথর্ববেদের মন্ত্রাংশ ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে সর্বশেষে সংকলিত হইয়াছিল এবং তাহার অজস্র প্রমাণ এই সংহিতাতে আছে। এই বেদের পদ্য ও গদ্যময় ভাগগুলি প্রায় একই ভাষায় রচিত।

এই বেদের প্রাচীন নাম ছিল "অথর্বাঙ্গিরস" অর্থাৎ অথর্বন্ ও অঙ্গিরাঃ। অথর্বন শব্দের অর্থ magic formula ; অঙ্গিরস্ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অগ্নি প্রজ্বালনার্থ পুরোহিতগণের নাম। ইহারও অর্থ মন্ত্রতন্ত্র ও ইন্দ্রজাল। কিন্তু দুইটি শব্দের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। "The two expressions 'atharvan' and 'angiras', however, designate two different species of magic formulas ; atharvan is holy magic, bringing happiness while angiras means hostile magic···The old name Atharvāngirasah thus means these two kinds of magic formulae, which form the contents of the Atharvaveda." (Winternitz, Vol. I, p 120)

'অথর্বাঙ্গিরস' শব্দের অর্থ

অথর্ববেদে মোট ৭৩১টি সূক্ত আছে। এই সূক্তগুলিতে প্রায় ৬০০০ মন্ত্র আছে (শৌনকীয় রূপে)। ইহাতে কুড়িটি কাণ্ড বা অধ্যায় আছে। ৬০০০ মন্ত্রের মধ্যে প্রায় ১২০০ মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতেই অধিক ঋক্ সঙ্কলিত হইয়াছে। অথর্ববেদের ১৩টি কাণ্ডই প্রাচীন সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। (জাহ্নবী ভৌমিক)। ইহার বিংশ কাণ্ড অবিসংবাদিতভাবে পরবর্তী। এই বেদের দুইটি শাখা—শৌনক ও পৈপ্পলাদ। পৈপ্পলাদ শাখা অসম্পূর্ণ।

ঋগ্বেদের সহিত অথর্ববেদের সম্বন্ধ, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কতখানি দেখা যাউক। ভিণ্টারনিৎসের ভাষায়, "After all it is quite a different

spirit that breathes from the magic songs of the Atharvaveda than from the hymns of the Ṛgveda. Here we move in quite a different world." (Winternitz Vol. I p. 127)। ঋগ্বেদের সুর ভিক্ষারএবং অনুনয় বিনয়ের। অথর্ববেদের সুর কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। এখানে "the Brāhmaṇa priest is addressing his social inferiors from whom he need not turn off the shady side of his character. (*Vedic Age*, p. 408), যেমন ব্রহ্মজায়া সূক্ত, অথর্ববেদ ৫।১৭।৮। ঋগ্বেদে দানস্তুতি প্রভৃতিতে

ঋগ্বেদের সহিত সম্বন্ধ

ব্রাহ্মণগণের অনুনয় বিনয় দেখা যায়, ব্রাহ্মণের সুবিধার কথা জোর গলায় কোথাও বিশেষ বলা হয় নাই। অথর্ববেদে কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্ভাব্য সুখ সুবিধা অধিকারের কথা নির্লজ্জভাবে বিঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। অথর্ববেদে দেবগণ অপেক্ষা যজমানের অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্রাহ্মণগণকে যেন বেশী আকাঙ্ক্ষিত দেখা যায়। অথর্ববেদীয় পুরোহিত ত্রিবেদজ্ঞ, ইহা ছাড়া অথর্ববেদ তিনি জানিতেনই। তাহার নাম ব্রহ্মা। তিনি যজ্ঞের Superintendent বা সর্বাধিনায়ক। ঋত্বিক্গণের কাহারও মন্ত্র পাঠে কোন ভুল হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। ঋগ্বেদে যে ইন্দ্রজাল ও ঈর্ষ্যাত্মক বীজ উপ্ত হইয়াছিল, অথর্ববেদে তাহাই আভিচারিক সূক্তরূপে বিবর্তিত হইয়াছে। অথর্ববেদে ব্রাত্য একজন প্রধান দেবতা যাঁহার উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই। ইনি ব্রহ্মের প্রতিভূ। ইনি সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডে কীর্তিত হইয়াছেন। রুদ্র এই বেদে শর্ব, ভব, ঈশান, পশুপতি ও মহাদেব আখ্যা লাভ করিয়াছেন। বিধবাবিবাহ এখানে স্বীকৃত হইয়াছে (অথ ৯।৫।২৭-২৮)। ঋগ্বেদীয় দর্শন এই যুগে উন্নততর রূপ লাভ করিয়াছে। অথর্ববেদের প্রথম উনিশটি কাণ্ডের অংশ ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত, প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলিয়াছি। ঋগ্বেদ হইতে অথর্ববেদের ভাষাগত পার্থক্যও কিছু আছে। ঋগ্বেদ পদ্যময়, অথর্ববেদে গদ্য ও পদ্য—উভয়েরই সমাবেশ। ঋগ্বেদের ভাষা অপেক্ষা অথর্ববেদের ভাষা সুখবোধ্য। এই যুগে ঋগ্বেদের যুগ অপেক্ষা সামাজিক পরিবর্ত্তন ও

উন্নতি অনেক বেশী লক্ষিত হয়। ঋগ্বেদকে কেহ কেহ শ্রৌতমন্ত্রপাঠ ও অথর্ববেদকে গৃহ্যমন্ত্রপাঠ বলিয়া মনে করেন।

অথর্ববেদের সহিত গৃহ্যসূত্রের সম্পর্ক অতি নিবিড়। পুরোহিত গৃহকর্মগুলি সম্পন্ন করিতেন। এগুলি ছিল সরল ও অনাড়ম্বর এবং অগ্নির সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্রৌতযজ্ঞে সোম ও পশুবধেরই প্রাধান্য ছিল, গৃহযজ্ঞে এই দুইটির প্রাধান্য একেবারেই নাই। দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাট বিপদ আপদকে দূর করিয়া শান্তি ও সুখলাভের কামনাই গৃহকর্ম্ম ও গৃহসূত্রগুলির উদ্দেশ্য। অথর্ববেদের মূলবস্তু ইহাই। সেজন্য অথর্ববেদ গৃহসূত্রের জনক, যে হিসাবে যজুর্বেদ ও সামবেদ যথাক্রমে শ্রৌতসূত্রের জনক।

গৃহসূত্রের সহিত সম্পর্ক

আবেস্তা ও অথর্ববেদে কিছু সামঞ্জস্য দেখা যায়। আবেস্তায় primitive religionএর ছাপ প্রাচীন অংশগুলিতে আছে। অথর্ববেদেও যে ইহা পরিস্ফুট, পূর্বেই দেখাইয়াছি। আবেস্তার সহিত ঋগ্বেদ ও অন্যান্য বেদের (অথর্ববেদ ব্যতীত) যেন একটা রেশারেশি আছে। অথর্ববেদও এই কারণেই দীর্ঘদিন ত্রয়ীর বহির্ভূত ছিল। অথর্ববেদ ও আবেস্তা—উভয় গ্রন্থেই অগ্নি-উপাসনা আছে। ইন্দ্রজালও অতি-মানবীয় শক্তিতে উভয়েই আস্থাবান্। সংকলনের সময়ের দিক্ দিয়াও উভয়েই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী।

আবেস্তা ও অথর্ববেদ

এই বেদের অথর্বমন্ত্রগুলিতে শুভঙ্কর রূপের পরিচয় মিলে। এই মন্ত্রগুলি মানব সমাজের কল্যাণ বিধানে নিরন্তর ব্যাপৃত। চিকিৎসা ও তন্ত্র এবং আয়ুর্বিদ্যার ইতিহাসে অথর্ববেদ অক্ষয় স্থান চিরদিনই অধিকার করিবে। ভারতীয় যাদুবিদ্যার বীজও যে অথর্ববেদে তাহাও পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

প্রয়োজনীয়তা

অথর্ববেদ প্রথম হইতেই বৈদিক সাহিত্যে একটি অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহাতে একদিকে যেরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিত তত্ত্ব রহিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ রাজোচিত বিভিন্ন কর্ম এবং মারণ, উচাটন প্রভৃতিও রহিয়াছে, পূর্বেই বলিয়াছি। শাস্ত্রে বহুস্থলে বেদকে ত্রয়ী নামে উল্লেখ

করায় "অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, ত্রয়ী শব্দে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়কে বুঝায়; সুতরাং অথর্ববেদ বেদবহির্ভূত। বস্তুতঃ, অথর্ববেদের যজ্ঞে ব্যবহার নাই বলিয়াই উহা ত্রয়ীর মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। ইহাতে অথর্ববেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না। অথবা এইরূপও হইতে পারে যে, ত্রয়ী শব্দে বেদবিভাগ লক্ষিত না হইয়া মন্ত্রবিভাগই লক্ষিত হইয়াছে এবং মন্ত্রসমূহ তিন শ্রেণীতে (ঋক্, যজুঃ, সাম—পদ্য, গদ্য ও গীতি) বিভক্ত বলিয়া বেদসমূহ ত্রয়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, অথর্ববেদ যে বেদেরই অন্তর্ভুক্ত তাহার প্রমাণ বেদমধ্যেই রহিয়াছে। (ছান্দোগ্য ৭।১।২)।" (উপনিষদ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭)।

ত্রয়ী ও অথর্ববেদ

ছয়

ব্রাহ্মণ

"বেদের যে ভাগে যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ ও মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে, তাহার নাম ব্রাহ্মণ। এক হিসাবে ইহাকে বেদের আদিম ব্যাখ্যা বা বিবরণ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম (ন্) শব্দের অর্থ বেদ। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ইহা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই আলোচনা আছে।"

অর্থ

"ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উপদেশে পূর্ণ। ঐ সকল অনুষ্ঠান এত জটিল যে, যাজ্ঞিকের হস্তে এই সকল কর্ম অনুষ্ঠিত না দেখিলে, উহা হৃদ্‌গত করা প্রায় অসাধ্য। সংহিতা বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা করাই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য। বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, সংহিতাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য যজ্ঞ করাই ছিল না, যজ্ঞ ব্যতিরিক্তও তাহাদের পৃথক্ সত্তা নিশ্চয়ই ছিল। একমাত্র যজুর্বেদই সে হিসাবে যজ্ঞের

সংহিতার সহিত সম্বন্ধ

সহিত প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট। কিন্তু 'ব্রাহ্মণযুগে' ইচ্ছা করিয়াই সকল সংহিতাকে কোন না কোন প্রকারে যজ্ঞের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার দুর্বার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতাস্থিত মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কোন্ মন্ত্র কোন্ ঋত্বিক্ কর্তৃক কোন্ কর্মে কিরূপে বিনিযুক্ত হইবে, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, কোন্ কারণে কোন্ মন্ত্র কোন্ নির্দিষ্ট কর্মের উপযোগী, তাহার হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা আখ্যায়িকাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

ম্যাক্সমূলারের মতে ব্রাহ্মণগণের রচনা বা সংকলনকাল আনুমানিক ৮০০—৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। সংহিতাযুগের পরই ব্রাহ্মণযুগ, এবং ব্রাহ্মণযুগ নিশ্চয়ই সূত্রযুগের পূর্ববর্ত্তী। Winternitzএর মতে ব্রাহ্মণগণের রচনাকাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০০০—১৫০০ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত। ক্বচিৎ কোথাও কোথাও পদ্য আছে। কর্ম-কাণ্ডের উপরেই ব্রাহ্মণ লিখিত। কখন কি প্রকারে যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাইতে হইবে, কুশ কি প্রকারে কোথায় রাখিতে হইবে, কোন্ যজ্ঞে কি আহুতি কি প্রকারে দিতে হইবে—এই সকল কথাই ব্রাহ্মণগণের বিষয়বস্তু। আর সেই সময়ের প্রচলিত এবং লোক-পরম্পরায় আগত অনেক গল্প ও উপন্যাস এইগুলিতে আছে। এই সকল উপাখ্যানই পরবর্ত্তী যুগের পুরাণ ও ইতিহাসের আদি পুরুষ। "যদিও ব্রাহ্মণগুলির প্রধান লক্ষ্য কর্মকাণ্ডের উপর, তবুও এইগুলিতে ব্যাকরণ, দর্শন, আয়ুর্বেদ প্রভৃতির অস্পষ্ট আলোচনা আছে।"

বিষয়বস্তু

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ দুইটি—ঐতরেয় এবং কৌষীতকি (অথবা শাঙ্খায়ন)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে প্রাচীনতর এবং আকারে বৃহত্তর। কৌষীতকিতে বিষয়বস্তু আছে অনেক বেশী। "The Aitareya itself is plainly a composite work, its first five Panchikās being older than the last three." (*Vedic Age* p. 234)। সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। তাণ্ড্য, ষড়্বিংশ, মন্ত্রদৈবত, আর্ষেয়, সামবিধান, সংহিতোপনিষদ্, বংশ এবং জৈমিনীয়। ইহাদের মধ্যে কেবল জৈমিনীয়

এবং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণই বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ "তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পঁচিশটি অধ্যায় থাকায় ইহা আবার "পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ" নামেও প্রসিদ্ধ। পরে আবার একটি অধ্যায় যোগ করিয়া ইহাকে ষড়্বিংশ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই মত কতদূর বিচারসহ গবেষণার বিষয়। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখায় আছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। শুক্ল যজুর্বেদেরএকমাত্র ব্রাহ্মণ শতপথ। ইহাতে একশতটি অধ্যায় আছে। অথর্ববেদের একটিই মাত্র ব্রাহ্মণ—গোপথ।

কোন্ বেদের কোন্ ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণগুলির উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভিণ্টারনিৎস বলেন, "The Brāhmaṇas are as invaluable authorities to the student of religion, for the history of sacrifice and of priesthood, as the Saṃhitās of the Yajurveada are for the history of prayer." (*A Hist. of Ind Lit.* Vol I p. 187). যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণগুলির সম্পর্ক যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া, ব্রাহ্মণগুলিতেই পরবর্ত্তী বেদাঙ্গসমূহের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল বলিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন।

ইহাদের প্রয়োজনীয়তা

ব্রাহ্মণযুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি বলিতে বুঝায় যে এই যুগের ধর্ম কতকগুলি যজ্ঞ এবং স্তব ও প্রার্থনার সমষ্টিমাত্র। স্বর্গকামনা করিয়া যজমান যজ্ঞ করিলে দেবতা তুষ্ট হন ও প্রার্থিত বর দান করেন। গৃহপতি অগ্নিই যজ্ঞের পুরোহিত। দেবগণ অগ্নির মুখেই আহুতি গ্রহণ করেন। মানবের জীবন জন্ম হইতে কতকগুলি কর্মের বন্ধনে জড়িত। মানুষ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ইহ জীবনে সেগুলি যথাযথভাবে পালন করাই তাহার ধর্ম।

ইহাদের প্রকৃতি

এই যুগে ঋত্বিক্‌গণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। অগ্নিহোত্র, উপসদ্, ইষ্টি প্রভৃতি ছোট খাট যাগ ছাড়াও, গবাময়ন, চাতুর্মাস্য, অশ্বমেধ,

রাজসূয়, বাজপেয় ও সোমযজ্ঞ প্রভৃতিতে ঋত্বিক্‌গণ প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া যাগযজ্ঞের কাজ পাইতেন এবং ধর্মপ্রাণ ক্ষত্রিয়রাজগণ তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার লইয়াছিলেন বলিয়া যাবজ্জীবন তাঁহারা এই সমস্ত কর্মেই লিপ্ত থাকিতেন। ব্রাহ্মণ অবধ্য, ব্রাহ্মণ ক্ষমার্হ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অক্ষয় পুণ্য ও স্বর্গলাভ হয় বলিয়া ব্রাহ্মণগুলিতে বলা আছে। রাজার অভিষেকের সময় ঋত্বিক্ এবং পুরোহিতের প্রাধান্য অপরিসীম। এ বিষয়ে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের *A History of Hindu Public Life*, Part I দ্রষ্টব্য।

ঋত্বিক্‌গণের প্রাধান্য

অগ্নি, আদিত্যগণ, অদিতি, অশ্বিদ্বয়, ইড়া, সোম, ইন্দ্র, উষা, ঋতুগণ, তার্ক্ষ্য, ত্বষ্টা, দ্যাবাপৃথিবী, দ্যৌঃ, পিতৃগণ, পূষা, পৃথিবী, প্রজাপতি, বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি, ভারতী, মরুদ্‌গণ, মাতরিশ্বা, মিত্রাবরুণ, রুদ্র, বরুণ, বসুগণ, বাক্, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদেবগণ, বিষ্ণু, বৃষাকপি, সরস্বতী, সবিতা, সাবিত্রী, রাকা ও সিনীবালী, সূর্য প্রভৃতি দেবতার আরাধনা এই যুগের যজ্ঞগুলিতে দেখা যায়।

ব্রাহ্মণযুগে আর্য্যদের দেবতা

ব্রাহ্মণযুগের ভাষা প্রায়শই অতি প্রাচীন এবং ব্রাহ্মণগুলি সকলই গদ্যে রচিত। অতি সরল গদ্য এবং প্রাচীন আর্ষপ্রয়োগ ইহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

ইহাদের ভাষা ও রচনারীতি

ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু না থাকিলেও ইহারা যে কথা, উপাখ্যান ও আখ্যায়িকার আকর বা খনিবিশেষ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী যুগে যে সকল মহাকাব্য, উপাখ্যান, পুরাণ প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেরই বীজ ব্রাহ্মণগুলিতে পাওয়া যায়। লৌকিক সাহিত্যের অনেক শাখারই মূল যে দুই বৃহৎ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদেরও বীজ এই ব্রাহ্মণগুলিতে। অতএব পুরাণ ও মহাকাব্যযুগে যে সকল উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা সকলেই অবিসংবাদিতভাবে ব্রাহ্মণগুলির নিকট ঋণী। বিখ্যাত শুনঃশেপ ও রন্তিদেবের উপাখ্যান প্রভৃতি ব্রাহ্মণযুগের সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি।

Storehouse of legends and fables

ব্রাহ্মণযুগের সাহিত্যকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়—বিধি, অর্থবাদ ও উপনিষদ্। বিধি শব্দের অর্থ নিয়ম, "rule, precept"। অর্থবাদ বলিতে অর্থের ব্যাখ্যাকেই বুঝায়, "explanation of meaning."। আর উপনিষদ্ শব্দের অর্থ কি তাহা উপনিষদ্-অধ্যায়ে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগুলি প্রথমতঃ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে যজ্ঞগুলির নিয়ম কি বলিয়া গিয়াছে; তাহার পর যজ্ঞের কার্যাবলীর ও প্রার্থনাগুলির ব্যাখ্যা ও অর্থ কি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছে। তাহার পর উপনিষদ বা রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে।

বিধি, অর্থবাদ ও উপনিষদ্‌ক্রমে ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু বিভাগ

কৃষ্ণযজুর্বেদের সহিত ব্রাহ্মণগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কৃষ্ণযজুর্বেদের মধ্যে মন্ত্র বা প্রার্থনার অতিরিক্ত যজ্ঞের ব্যাখ্যা, আলোচনা ও বিভিন্ন মতের সমাবেশ আছে। ব্রাহ্মণগুলিরও লক্ষ্য একমাত্র যাগযজ্ঞের বিষয় বিবৃত করা। ইহা ছাড়াও কৃষ্ণযজুর্বেদের অধিকাংশই গদ্যে রচিত, ব্রাহ্মণগুলির রচনাও গদ্যেই।

কৃষ্ণযজুর্বেদের সহিত সম্পর্ক

"ব্রাহ্মণ" গার্হস্থ্যাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। সংহিতা বা মন্ত্র মুখস্থ করিয়া ছাত্রগণ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য আশ্রম সমাপ্ত হইত। অতঃপর বিবাহ সমাপনান্তে পত্নীর সহিত আহিতাগ্নি হইয়া তাঁহারা বিভিন্ন যাগযজ্ঞ করিতেন এই গার্হস্থ্যাশ্রমের সময়। ইহা ছাড়া অন্যান্য তিন আশ্রমের যথাযথ ভরণপোষণের ভারও এই দ্বিতীয় আশ্রমস্থ নরনারীর উপর অর্পিত থাকিত।

গার্হস্থ্যাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট

উত্তরকালে গীতায় কর্মকাণ্ডস্থ ব্রাহ্মণগুলির নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি ও ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। স্বর্গকামো যজেত, জ্যোতিষ্টোমো যজেত ইত্যাদির লক্ষ্য হইতেছে স্বর্গলাভ, পুত্র, পৌত্র, অশ্ব, রথ, পদাতি, ধন, ধান্য ও হিরণ্যলাভ। নিষ্কাম কর্মের উপাসনা ব্রাহ্মণে দেখা যায় না। কামনা ও বাসনা লইয়াই আর্য্যগণ যজ্ঞারম্ভ করিতেন এবং যজ্ঞের ফলাকাঙ্ক্ষাও

গীতায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি

ঐজন্য তাঁহাদের তীব্র ছিল। 'সুবীরাসো ভবেম', 'রত্নধাতমমগ্নিমীড়ে' ইত্যাদির মধ্যে লিপ্সা সুপরিস্ফুট।

ব্রাহ্মণগুলির উক্তি ও যুক্তির সমর্থনেই মীমাংসাদর্শন সৃষ্ট হইয়াছিল, মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। বিধি ও ও অর্থবাদের ব্যাখ্যাতেই মীমাংসা দর্শন ব্যাপৃত হইয়াছে। মীমাংসা শব্দের অর্থ "পূজ্য বিচার।" "নিখিল-কলাকলাপস্যাপি মূলভূতস্য বেদস্য নিকৃষ্টবাক্যার্থবর্ণনব্যাজেনাশেষপুরুষার্থরত্না-করস্য ভগবতো ধর্মস্য বাস্তবিকংতত্ত্বমবগময়িতুং প্রবৃত্তেয়ং দ্বাদশলক্ষণী ভগবতী মীমাংসা।" (তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলিঃ—সম্পাদকীয়ে)।

মীমাংসাদর্শনের সহিত সম্পর্ক

ব্রাহ্মণের অর্থ যেখানে পরিস্ফুট নয়, কিংবা যেখানে বৈদিক মন্ত্রের কোন যুক্তিসহ যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইতেছে না, মীমাংসা সেখানেই বৈদিক সাহিত্যকে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ-গুলিকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। যজ্ঞাচার্য্যগণের মতে মীমাংসাদর্শনের সম্যক্ জ্ঞান ভিন্ন বৈদিক কর্মকাণ্ডের জ্ঞান অসম্ভব। সায়ণাচার্য্য এইজন্যই প্রত্যেক বেদের ভাষ্যভূমিকায় মীমাংসার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন স্বপক্ষসমর্থনে।

সাত

আরণ্যক

ব্রাহ্মণগুলির "যে অংশে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই সাঙ্কেতিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে, তাহাকে আরণ্যক বলা হয়, কেননা ইহা অরণ্যে অর্থাৎ বনে পাঠ করা হইত, কারণ, এই সব কথা দুরূহ বলিয়া

অর্থ

যেখানে-সেখানে যাহাকে-তাহাকে শেখানো হইত না, এবং ইহা অবধারণ করিবার জন্য অতি নির্জন স্থান আবশ্যক হইত।" (বিধুশেখর শাস্ত্রী—উপনিষদ্)। আমাদের অনেক উপনিষদ্ই এই আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত।

আরণ্যকগুলির সংকলনকাল ঠিক কোন সময় বলা কঠিন। ব্রাহ্মণগুলির মধ্যেই আরণ্যক সন্নিবিষ্ট। ইহারই শেষভাগ আবার উপনিষদ্। যাহা

হউক, আরণ্যক যুগ উপনিষদ্‌যুগের পূর্ববর্তী বলিয়া অনেকে মনে করেন। আরণ্যকের ভাষাও সুপ্রাচীন। ইহাদের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের আভাস পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে দেখা যায়, ঋগ্বেদের আর্ষ-মণ্ডলের ঋষিগণের নাম সূর্যপরত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে প্রাণ প্রভৃতির আলোচনা বৈজ্ঞানিকভাবে করা হইয়াছে। উপনিষদে যে দার্শনিক তথ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সূচনা আরণ্যকে।

সংকলনকাল ও বিষয়বস্তু

আরণ্যকের উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"The excessive ritualism of the Brāhmaṇas produced a natural reaction. The Āraṇyaka texts are themselves virtually an admission that the correct performance of a compulsory ritual, that had developed to enormous proportion in the Brāhmaṇa period, could not be expected from all, young and old···There were again some parts of the sacrificial lore which were of an occult and mystical nature and which could be imparted to the initiated only in the privacy of the forest · They (the Āraṇyakas) are mainly devoted to an exposition of the sacrifice and priestly philosophy." (*Vedic Age* p. 447) এক কথায়, ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞাদির রহস্যময় ও দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদর্শনের জন্যই আরণ্যক উদ্ভূত হইয়াছিল।

ইহাদের উদ্ভবের কারণ

আরণ্যকে যাজ্ঞিক আচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া আছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। আরণ্যকে মানসিক ধ্যান বা মানস যজ্ঞের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কর্মযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই যে অধিকতর উপাদেয় ও শ্রেয় বৈদিক ঋষিগণ এই যুগে তাহার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই দিক্ দিয়া দেখিলে আরণ্যক কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যে সংযোগসেতু রচনা করিয়াছে, নিঃসংশয়ে বলা যায়।

যাজ্ঞিক আচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

আরণ্যক এক হিসাবে আর্যদের তৃতীয়াশ্রমের সহিত সম্পর্কিত। এই আশ্রমে ঋষিগণ ক্রিয়াকলাপের অপেক্ষা ধ্যান ও তত্ত্বান্বেষণেই অধিকতর শান্তিলাভ করিতেন। অরণ্যের শান্ত সমাহিত পরিবেশ সংসারের কলকোলাহল হইতে বহুদূরে অবস্থিত। সেই পরিবেশে নিজেদের সংসারের মায়া ও বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তত্ত্ব চিন্তার প্রকৃষ্ট অবসর পাওয়া যাইত।

আর্যদের বাণপ্রাস্থিক আশ্রমের সহিত সম্পর্ক

আরণ্যক আপামর সাধারণের নিকট প্রকাশিত করিবার উপায় ছিল না। এই জ্ঞানের উপযুক্ত আধার না পাইলে ইহা প্রকাশ করা যাইত না।

ইহাদিগকে গোপন বা রহস্যাবৃত রাখিবার কারণ

প্রধান শিষ্য বা উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট এই রহস্য একমাত্র প্রকাশ করিবার প্রথা ছিল। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐতরেয় আরণ্যকের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে খুব সম্ভব এই জন্যই বহু আরণ্যক উপযুক্ত আধারের অভাবে কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

প্রধান শিষ্য ও জ্যেষ্ঠপুত্র ইহাদিগকে জানিবার অধিকারী

আরণ্যক কাহারো কাহারো মতে কর্মকাণ্ডের শেষ অংশ, আবার কাহারো মতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম অংশ। শেষ মতটিই বিচারসহ বলিয়া মনে হয়। আরণ্যক এবং উপনিষদকে একসঙ্গে আমরা বেদান্ত বলিয়া থাকি। প্রথমে বেদান্ত শব্দের অর্থও তাহাই ছিল, বেদের শেষভাগ—কোন দর্শনবিশেষ নহে।

জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম অংশ

আরণ্যকের ভাষা ব্রাহ্মণযুগের ভাষার ন্যায়ই অতি প্রাচীন। ছোট ছোট শব্দের যোগে বাক্য রচনা আরণ্যকের রচনাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণের ভাষা অপেক্ষা আরণ্যকের ভাষা সহজেই বুঝা যায় কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ উপনিষদের মন্ত্র গুলির ন্যায় রহস্যপূর্ণ। ব্রাহ্মণের ন্যায় আরণ্যকও গদ্যে রচিত।

ভাষা ও রচনাশৈলী

আরণ্যকে বৈদিক দেবগণের symbolic ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, পূর্বেই বলিয়াছি। ঋষি এবং যজ্ঞের ব্যাখ্যাও symbolic। অর্থাৎ আরণ্যকে

সংহিতা ও ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের একটা rational explanation দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণগুলির যতপ্রকার শাখা আছে, আরণ্যকেরও শাখা ঠিক তত-গুলিই। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষাংশ ঐতরেয় আরণ্যক। ইহাতে পাঁচটি ভাগ আছে এবং প্রত্যেকটিকেই পৃথক্ পৃথক্ আরণ্যক নামে অভিহিত করা হয়। শাঙ্খায়ন অথবা কৌষীতকি আরণ্যক ঋগ্বেদের কৌষীতকি ব্রাহ্মণের উপসংহার মাত্র। ঐতরেয় আরণ্যকের সহিত ইহার বিষয়বস্তুরও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যক তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের continuation মাত্র। ইহাতে দশটি অধ্যায়, "অরণ" বা "প্রপাঠক" আছে। শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দশ খণ্ড প্রকৃতপক্ষে একটি আরণ্যক—বৃহদারণ্যক। সামবেদের আরণ্যক একটিই—জৈমিনীয় বা তলবকার শাখার অন্তর্ভুক্ত।

কোন্ বেদের কোন্ আরণ্যক

আরণ্যকগুলির মধ্যে ঐতরেয় আরণ্যকই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার পাঁচটি ভাগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রথমভাগে সোমযজ্ঞের যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা আছে। দ্বিতীয়ভাগে প্রাণ ও পুরুষতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা আছে। ইহার প্রকৃতি অনেকটা উপনিষদের ন্যায়। তৃতীয় ভাগে সংহিতা, পদ এবং ক্রমপাঠের allegorical এবং mystical অর্থ দেওয়া আছে। শেষ দুইভাগে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়—যেমন নিষ্কেবল্য শস্ত্রের বিবরণ, মহানাম্নী শ্লোকের অর্থ ও ব্যাখ্যা ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকও নানাবিষয়ের আলোচনা করিয়াছে।

দুই একটি প্রসিদ্ধ আরণ্যকের বিবরণ

আরণ্যক ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। "The Āraṇyakas...lay down upāsanās (or courses of meditation) upon certain symbols and austerities for the realization of the Absolute, which by now had superseded the

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ইহাদের স্থান

"heaven" of the Brāhmaṇa and the Upanishads as they are borrowed from the sacrifices. Finally the compromise between the two ways of karman and jñāna was consummated..." (*Vedic Age* p. 448)

Mysticism

আরণ্যকেই ভারতীয় mysticismএর সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। আরণ্যক ও উপনিষদে যাহার সূচনা, দর্শনগুলিতে তাহার বিকাশ এবং পরবর্তীকালে তন্ত্রশাস্ত্রে তাহার পরিণতি দেখিতে পাই। আরণ্যকের ন্যায় তন্ত্রেরও symbolগুলি রহস্যময়। আজও আরণ্যকের অনেক symbolএর প্রকৃত অর্থ জানা যায় নাই।

আট

উপনিষদ্‌

বেদকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই দুই বিষয়ে কোনো পৃথক্ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বৈদিক গ্রন্থে কর্ম বা জ্ঞানের আলোচনার ন্যূনাধিক্যে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ক্রমে তাঁহাদের চিন্তার পরিবর্ত্তন সূচিত হইতে থাকে। কিছু না কিছু কামনা করিয়া তাঁহারা যজ্ঞ করিতেন, কিন্তু উহাতে উত্তরোত্তর কামনার বৃদ্ধিই হয়, দুঃখেরও অবসান হয় না, শান্তিও আসেনা। তাই অনেকের ধারণা হইল কর্মের দ্বারা সংসারের দুঃখ অতিক্রম করিতে পারা যায় না। আবার অনেক বৈদিক কর্মে পশুহিংসা থাকায় অনেকেরই তাহা ভাল লাগিল না। মানবের কল্যাণের অন্য পথ নিশ্চয়ই আছে ভাবিয়া অনেকে জ্ঞানের পথের অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিলেন। এই জ্ঞানবাদীদেরই উক্তি জ্ঞানকাণ্ড। আমাদের উপনিষদ্ যে এই জ্ঞানকাণ্ডেরই অন্তর্গত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আবার উপনিষদ্‌গুলি ব্রাহ্মণাত্মক বেদের শেষভাগও বটে। বহু উপনিষদ্ আরণ্যকের অন্তর্গত। কেবল একখানি মাত্র উপনিষদ্ মন্ত্র বা সংহিতার মধ্যে। ইহার নাম ঈশোপনিষদ্—শুক্ল যজুর্বেদের চল্লিশ অধ্যায়।

কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড

উপনিষদের এক নাম বেদান্ত (বেদ-অন্ত), বেদের শেষ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। কাহারো কাহারো মতে, বেদের শেষ লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য বা শেষ সিদ্ধান্ত ইহাতে সংগৃহীত, সেইজন্য ইহা বেদান্ত।

বেদান্ত

উপনিষদ্ শব্দের অর্থ কি? (১) যাহারা ব্রহ্মবিদ্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া ("উপ-") নিশ্চয়ের সহিত ("নি-") ইহার অনুশীলন করেন, ইহা তাঁহাদের সংসারের বীজস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতিকে নাশ করে ("$\sqrt{}$ সদ্")। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষদ্।

উপনিষদ্ শব্দের অর্থ

(২) যেখানে লোকেরা চারিদিকে ("পরি-") বসে ("√সদ্") তাহাকে আমরা বলি পরিষদ্। ঠিক সেইরূপ শিষ্যেরা গুরুর নিকটে ("উপ") গিয়া যেখানে বসিতেন ("নি-√সদ্") মূলতঃ সেই ছোট-ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ্। কালক্রমে এই সকল উপনিষদে বা বৈঠকে যে বিদ্যার (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার) আলোচনা হইত তাহারও নাম হইল উপনিষদ্। (৩) উপনিষদ্ শব্দের আর একটি অর্থ হইতেছে "রহস্য"। অতি গম্ভীর ও দুর্গম বলিয়া এই উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় নির্বিচারে যেখানে-সেখানে সকলের নিকট প্রকাশ করা হইত না বলিয়া ইহা ছিল রহস্য। পৃথিবীরাজ্য দান করিলেও উপনিষদ্ অতিপ্রিয় শিষ্য বা জ্যেষ্ঠপুত্র ভিন্ন আর কাহাকেও দান করা হইত না ১।

অতি গম্ভীর এই বিদ্যা

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব এইচারি বেদেরই উপনিষদ্ আছে। ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয়ারণ্যকের মধ্যে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মধ্যে। কেন উপনিষদ্ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে। অথর্ববেদের সহিত মুণ্ডক ও প্রশ্নোপনিষদের পরম্পরা সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

চারি বেদেরই উপনিষদ্ আছে

উপনিষদ্গুলির মধ্যে কতক প্রাচীন, কতক বা পরবর্তী। ভাষা, রচনার রীতি ও আলোচ্য বিষয় প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখিলে কোন্ উপনিষদ্ প্রাচীন ও কোনটি পরবর্তী বুঝা শক্ত হয় না—উহাদের মধ্যে কতক পদ্যে, কতক গদ্যে, আবার কতক গদ্য ও পদ্য উভয়েই রচিত।

১। ঈশা—ঈশা (অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা) শব্দটি আরম্ভে থাকায় ইহার নাম এইরূপ। ইহা খুবই ছোট ও ইহার দুইটি মন্ত্র ছাড়া সবই পদ্যে রচিত।

'দশোপনিষদ'

২। কেন—কেন শব্দটি আরম্ভে থাকায় নাম এইরূপ—আকারে খুবই ছোট—গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে।

৩। কঠ—কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠশাখার সহিত সম্বন্ধ আছে—পদ্যে রচিত।

১। শ্বে. উ. ৬৷২২—'নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।'

৪। প্রশ্ন—ছয়টি প্রশ্নের সমাধান করার জন্য এই নাম—গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে।

৫। মুণ্ডক—ইহার ৩।২।১০এ বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি যথাবিধি "শিরোব্রত" করে, তাহাকেই ইহার আলোচিত ব্রহ্মবিদ্যা দান করিতে পারা যায়। মুণ্ডের ব্রতের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই নাম। শিরোব্রতে মাথায় অগ্নিধারণ করিতে হয়। ইহাতে গদ্য ও পদ্য দুইই আছে।

৬। মাণ্ডূক্য—মণ্ডূক ঋষি ইহাকে প্রকাশ করায় ইহার এই নাম।

৭। তৈত্তিরীয়—কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের যে অংশ তৈত্তিরীয় আরণ্যক ইহা তাহারই অন্তর্গত—গদ্যে রচিত।

৮। ঐতরেয়—ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত—গদ্যে রচিত।

৯। ছান্দোগ্য—ছান্দোগ্য বা সামবেদের ব্রাহ্মণের প্রথম অংশ আরণ্যক বলিয়া গণ্য হয়। এই উপনিষদ্‌খানি ইহারই অন্তর্গত। আকারে ইহা বেশ বড়, গদ্যে রচিত ; মাঝে মাঝে পদ্যও আছে।

১০। বৃহদারণ্যক—শুক্ল যজুর্বেদের সুপ্রসিদ্ধ শতপথ ব্রাহ্মণের এক অংশকে আরণ্যক বলা হয়। ইহারই শেষভাগ এই উপনিষদ্। ইহা আকারে বৃহৎ এবং প্রধানতঃ আরণ্যক বলিয়া ইহার এই নাম—অধিকাংশই গদ্য, তবে মধ্যে মধ্যে পদ্যও আছে।

১১। কৌষীতকি—ঋগ্বেদেরই অন্য একটি ব্রাহ্মণ কৌষীতকি। কৌষীতকি আরণ্যক তাহারই অন্তর্গত এবং এই আরণ্যকের একটি অংশ এই উপনিষদ্।

১২। শ্বেতাশ্বতর—কৃষ্ণযজুর্বেদের শ্বেতাশ্বতর শাখার সহিত সম্বন্ধ আছে। ইহা সমগ্রই পদ্যে।

১৩। মৈত্রায়ণী—কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়ণী শাখার অন্তর্গত। ইহা মৈত্রী উপনিষদ নামেও প্রসিদ্ধ। ইহা গদ্যে রচিত, তবে মধ্যে মধ্যে পদ্যও দেখা যায়।

প্রসিদ্ধ দশোপনিষদ বলিতে উল্লিখিত প্রথম দশখানি উপনিষদই বুঝিতে হইবে। আচার্য শঙ্কর মাত্র এই দশখানি উপনিষদের উপরই ভাষ্য লিখিয়াছেন।

"উপনিষদের প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে সমগ্র মানবের প্রথম ও প্রধান কথা, আর তাহা হইতেছে তাহার আত্মাকে বা নিজেকে লইয়া। এই আমি আছি, ইহার পর আর থাকিব না, এই চিন্তা সে সহিতে পারে না। সে চায়, যে প্রকারে হউক, তাহাকে থাকিতেই হইবে। দুঃখের, অশান্তির তো তাহার ইয়ত্তা নাই। কীরূপে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? পরম সম্পদ্, পরম আনন্দ, পরম শান্তি কী পাওয়া যায়? আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা এইসব বিষয়ে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ উপনিষদ্‌গুলিরই মধ্যে পাওয়া যায়।"[১]

আত্মবিচার

উপনিষদে বিদ্যাকে দুইরকমের বলা হইয়াছে, 'অপরা' অর্থাৎ নিকৃষ্ট, আর 'পরা' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি বিদ্যার নাম অপরা বিদ্যা, আর যাহা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। উপনিষদে এই পরা বিদ্যাই আলোচিত হইয়াছে।

'পরা' ও 'অপরা' বিদ্যা

উপনিষদ্ গম্ভীর, অথচ অতি উপাদেয়। ভাববিশালতায় ইহা অতুলনীয়। ভারতের সমস্ত ধর্মের মূল উপনিষদ্। ইহাদের মূল তত্ত্বটি লওয়া হইয়াছে উপনিষদ্ হইতেই। ভারতীয় দর্শন সমূহের মূল তত্ত্বগুলির অধিকাংশেরই স্ফুরণ হইয়াছে উপনিষদ্ হইতে। তাই উপনিষদ শুধু ভারতেরই নহে, সমস্ত জগতেরই অমূল্য সম্পদ্! ভিণ্টারনিৎস্ যথার্থই বলিয়াছেন[২]—"In fact the whole of the later philosophy of the Indians is rooted in the Upaniṣads.

ভাববিশালতায় অতুলনীয়

পূর্বে বলা হইয়াছে, মানবের প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে তাহার আত্মা বা নিজের কথা। সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে বলিয়া আত্মাকে আত্মা বলা হয়। পরে আমরা দেখিতে পাইব এই আত্মাই হইতেছে বিশ্বাত্মা। এই আত্মাই সব। তাই এই

আত্মা=ব্রহ্ম

১। বিধুশেখর ভট্টাচার্য—উপনিষদ্ পৃঃ ১২-১৩

২। A History of Indian Literature Vol I পৃঃ ২৬৪

সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে বলিয়াও ইহা আত্মা। আর এই জন্যই ইহার একটি নাম ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

আমরা দেখিয়াছি, আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই হইতেছে উপনিষদের আলোচ্য। এই আত্মবিদ্যা কী এবং কেনই বা আলোচ্য, বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে তাহার বিশদ আলোচনা আছে।[১] ছান্দোগ্য উপনিষদেও নারদ ও সনৎসুজাত সংবাদে এই তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে।[২] মৈত্রেয়ী বলিয়াছেন, "যাহাতে অমৃত হইতে পারিব না তাহার দ্বারা আমি কী করিব?"[৩] সনৎসুজাত বলিয়াছেন—"তাহাই প্রভূত, মানুষ যেখানে অন্য কিছু দেখেনা, অন্য কিছু শোনেনা, অন্য কিছু জানেনা। আর যেখানে অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শোনে অন্য কিছু জানে তাহা অল্প।[৪] যাহা প্রভূত তাহা অমৃত, আর যাহা অল্প তাহা মরণশীল।" মুণ্ডক বলিয়াছেন—"ইহা অমৃত ব্রহ্মই; সম্মুখে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, দক্ষিণে উত্তরে, উপরে নীচে ব্রহ্মই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মই।"[৫]

আত্মবিদ্যা কী?

আমাদের তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্ত বা সুযুপ্তি (অর্থাৎ যে অবস্থায় নিদ্রিত মানুষ কোনরূপ স্বপ্ন না দেখিয়া একেবারে শান্ত হইয়া থাকে)। এই তিন অবস্থার অনুভবের পরস্পর ভেদ আছে। এই তিন অবস্থাতেই যে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র আত্মা তাহা নহে। একই আত্মার তিন অবস্থায় তিন রকমে অনুভব হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থার অতিরিক্ত আর এক অবস্থা আছে, যাহার সহিত পূর্বোক্ত ঐ তিন অবস্থার কোনো সংসর্গ নাই,

প্রসিদ্ধ তিন অবস্থা, তুরীয়

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৬ ; ৩।৮ ; ২।৪ এবং ৪।৫

২ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭

৩ 'যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিং কুর্যাম্?'

৪ ছান্দোগ্য ৭+২৩+১—নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। ইত্যাদি.

৫ মুণ্ডক ২।২।১১

যাহা উহাদের অতীত। এই অবস্থার আত্মাকে তুরীয় অথবা উত্তম বা পুরুষোত্তম বলা হয়।[১] এই আত্মাই আসল আত্মা।

"তরোয়ালের কোশ বা খাপ থাকে। তরোয়াল খাপের মধ্যে থাকিলে খাপখানাই দেখা যায়। আসল তরোয়ালখানা দেখা যায় না, খাপের মধ্যে তাহা ঢাকা থাকে। আত্মারও যেন এইরূপ কোশ আছে। আর এই কোশ একটি মাত্র নয়, পাঁচ পাঁচটি। একটির ভিতর অন্যটি, তার ভিতর অন্য একটি, এইরূপে পরে পরে। আত্মার আসল রূপটি এই কোশগুলির দ্বারা ঢাকা আছে।" ঐ পাঁচটি কোশের প্রথমটি হইতেছে অন্নময়, দ্বিতীয়টি প্রাণময়, তৃতীয়টি মনোময়, চতুর্থটি বিজ্ঞানময় এবং পঞ্চম আনন্দময়। আসল আত্মা হইতেছে এই সমস্ত কোশের অতীত।[২]

পঞ্চকোশাতীত আত্মা

কেনোপনিষদে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম হইতেছেন কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাকেরও বাক্, প্রাণেরও প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু। সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্ যায় না, মন যায় না। যিনি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত হন না, প্রত্যুত বাগিন্দ্রিয়ই যাঁহাদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম। ইহার তাৎপর্য এই যে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়, ইহাদের সমস্ত শক্তি বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি, তাহাদের নিজের নহে। মানুষ দেহ বা ইন্দ্রিয়গুলিকেই ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে; প্রকৃত পক্ষে যাঁহা হইতে উদ্ভব তিনিই ব্রহ্ম। মুণ্ডকোপনিষদে যক্ষের গল্পে ইহা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের স্বরূপ

যাহার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম। অগ্নি ইহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য ইহার চক্ষু, দিক্ ইহার কর্ণ, বায়ু ইহার প্রাণ, বিশ্ব ইহার হৃদয়, পৃথিবী ইহার চরণ, আর ইনি নিজেই হইতেছেন অন্তরাত্মা

১ "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" গীতা ১৫।১৮,
মাণ্ডূক্য ৭

২ বিধুশেখর ভট্টাচার্য—উপনিষদ্ পৃঃ ২৭—২৮

(মুণ্ডক)। ইনি শুভ্র, জ্যোতিরও জ্যোতি। যজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর উপাখ্যানেও ব্রহ্মতত্ত্ব বিশদীকৃত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রহ্ম অক্ষর, রসহীন, গন্ধহীন, চক্ষুহীন, কর্ণহীন, বাগিন্দ্রিয়হীন, মনোহীন, তেজোহীন, প্রাণহীন, মুখহীন, মাত্রাহীন। তাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই। সেই অক্ষর একই ও অদ্বিতীয় ("একমেবাদ্বিতীয়ম্")। শ্বেতকেতু আরুণির উপাখ্যানে 'তৎত্বমসি শ্বেতকেতো' বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়

ব্রহ্মসাধনা কি করিয়া করা যাইতে পারে, এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। দম, দান ও দয়া না থাকিলে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না। আসক্তি হইতেছে মানবের বন্ধন; অন্য কোনো বন্ধন নাই। ভারতের সমস্ত ধর্মের মূলে ইহাই দেখা যায়। উপনিষদের ধর্মেরও মূলে ইহাই রহিয়াছে। কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার উপাখ্যানে কথোপকথনের মধ্য দিয়া কামনা বাসনা, ও আসক্তি ত্যাগ করিতে পারিলে যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় তাহাই বুঝান হইয়াছে। দুইটি জিনিষ আছে; একটি শ্রেয় (অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাদের বেশী ভাল হয়), আর অন্যটি হইতেছে প্রেয় (অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাদের বেশী ভাল লাগে)। ইহাদের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের কাছে ইহারা উভয়েই আসে। তবে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্, যোগী। আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে তর্ক করা চলে না। ইনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। যে ব্যক্তির বিজ্ঞান হইতেছে সারথি, আর মন হইতেছে রজ্জু, তিনি বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন। এই আত্মাকে বেদাধ্যয়নের দ্বারা, মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারা পাওয়া যায় না। সত্যদ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা ও নিত্য ব্রহ্মচর্যদ্বারা ইঁহাকে লাভ করা যায়। "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥"[১] যিনি সমস্ত ভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং সমস্ত ভূতকে আত্মার মধ্যে দেখেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যাঁহা হইতে আর উৎকৃষ্ট কিছু নাই, যাঁহা হইতে আর কিছু ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর নাই, যিনি দ্যুলোকে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া

ব্রহ্মসাধনার উপায়

১ মুণ্ডক উপনিষদ্ ২।২।৪

আছেন, সেই পুরুষই এই সমস্তকে পূর্ণ করিয়া আছেন।[১] সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় ও কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।[২]

উপনিষদের গল্প

প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে উপনিষদের অনেক প্রসিদ্ধ গল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে। গল্পগুলি ভাবগাম্ভীর্যে ও ভাষামাধুর্যে মহীয়ান্।[৩] প্রত্যেকটি গল্পই এক একটি রূপক এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কোনো না কোনো তত্ত্ব প্রকাশ করা। "Example is better than precept" কথাটি যথাযথভাবে উপনিষদ্ সাহিত্যে অনুসৃত হইয়াছে।

চতুর্থাশ্রমের সহিত সম্পর্ক

উপনিষদ্ আর্যজীবনের চতুর্থাশ্রমের সহিত সম্পর্কিত। সন্ন্যাসের সময় আর্যঋষিগণ সংসারের যাবতীয় মোহময় সম্পর্ক হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া অজর অমর সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তায় বিলীন হইয়া থাকিতেন। বেদের কর্মকাণ্ডাত্মক কার্যাবলীর বৈফল্য তাঁহাদের ধ্যানী দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইত। নশ্বর জীবনের পরপারে কি আছে জানিবার জন্য তাঁহাদের ধ্যানী দৃষ্টি তখন সর্বদাই ব্যগ্র হইয়া থাকিত।

পরবর্তী যুগের ধর্ম ও দর্শনের উপর ইহাদের প্রভাব

পরবর্তী যুগের ধর্ম ও দর্শনের উপর উপনিষদের প্রভাব কতখানি, প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা এই ত্রয়ীকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। ইহারাই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি। ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায় প্রস্থান, গীতাকে স্মৃতিপ্রস্থান এবং উপনিষৎসমূহকে শ্রুতি প্রস্থান বলে।[৪] শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির প্রামাণ্য দুর্বল এবং বিরোধস্থলে শ্রুতিই গ্রাহ্য। উপনিষদের ভাবমন্দাকিনী সর্বতোভাবে ব্রহ্মসূত্রের মধ্য দিয়া ও আংশিকভাবে গীতায় প্রবাহিত হইয়াছে।

---

১ "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।"

২ মুণ্ডক ২।২।৮

৩ গল্পে উপনিষৎ—সুধীর কুমার দাসগুপ্ত

৪ উপনিষৎ গ্রন্থাবলী পৃঃ ১১—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বেদকে অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন না—পূর্বেই বলিয়াছি। ম্যাক্সমূলারের মতে "সর্বপ্রাচীন উপনিষৎ অন্ততঃ ৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে রচিত হয়।" ম্যাকডোনেলের মতও তাই। ডাঃ "রাধাকৃষ্ণণের মতে খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৪০০-৩০০ অব্দের মধ্যে উপনিষৎসমূহ রচিত হয়। ভিন্টারনিৎসের মতে রচনাকালানুক্রমে উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ ঃ—প্রথম—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকি ও কেন ; দ্বিতীয় ঃ—কঠ, ঈশ,শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক ও মহানারায়ণ ; তৃতীয়—প্রশ্ন, মৈত্রায়ণীয় ও মাণ্ডূক্য এবং চতুর্থ—অবশিষ্ট সমস্ত।"

Externalism of Vedic religionএর বিরুদ্ধে ইহার প্রতিবাদ

উপনিষদ বৈদিক ধর্মের বহির্মুখিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।'[১] কর্মকাণ্ডাত্মক যে বিদ্যা তাহা মানবকে ভোগমুখী করে। কিন্তু ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই সুখ। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"[২] উপনিষদের অনেক গল্পেই দেখা যায় বেদশাস্ত্রে পারঙ্গম যাজ্ঞিক বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কাছে তর্কে পরাস্ত হইয়া ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিতেছেন। বহির্মুখী যে বৈদিক ধর্ম তাহা প্রেয়েরই নামান্তর। কিন্তু প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়ই যে নিশ্চিতরূপে আশ্রয় করা উচিত, উপনিষদ্ বারংবারই তাহা জানাইয়াছে।

গীতার যুক্তি

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণও বেদের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। "বেদ ত্রিগুণাত্মক—অর্জ্জুন, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও"।[৩] অবিবেকী মূঢ়গণ বেদের অর্থবাদেই পরিতুষ্ট, কিন্তু ভোগ ও প্রভুত্বের প্রাপ্তিসাধক নানাবিধ ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্যদ্বারা যাহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের অন্তঃকরণে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না। "ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর পরিচ্ছিন্ন ফলদায়ক

---

১ কঠ উপ ১।২।২৩, মুণ্ডক উপ ৩।২।৩

২ ঈশা উপ ১

৩ গীতা ২।৪৫

বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে ব্রহ্মবিদের আর কোন প্রয়োজন থাকেনা—তখন তিনি কর্মকাণ্ডীয় পরিচ্ছিন্ন ফলসমূহের অতীত অখণ্ড পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধিতেই কৃতার্থ হইয়া যান।"[১]

ব্রহ্ম দুই প্রকার—সাকার ও নিরাকার। ঈশোপনিষদে একটি শ্লোকেই উভয় প্রকার ব্রহ্মের কথা সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে—"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবি র্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥"[২]

সাকার ও নিরাকর ব্রহ্মবাদ

এখানে সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীরী, অক্ষত, শিরাহীন নির্মল ও অপাপবিদ্ধ যে ব্রহ্ম তিনি নিরাকার। আর যিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম, স্বয়ম্ভু তিনিই সাকার ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষ, তিনিই মায়োপহিতচৈতন্যাত্মক ঈশ্বর।

উপনিষদ্ এক কথায় বলিতে চাহিয়াছে—"বিশ্বই ব্রহ্ম কিন্তু ব্রহ্মই আত্মা।" উপনিষদের সাধারণ শিক্ষা এবং মূল বক্তব্য সম্বন্ধে Deussenএর মতানুসারেই বলা যায়[৩]—"(1) The Atman is the knowing subject and as such can never become an object for us, and is therefore itself unknowable. It can only be defined negatively.…(2) As the Atman is the metaphysical unity expressing itself in all empirical plurality—a unity found only in our consciousness—it is the sole reality. To know the Atman is, therefore, to know everything. There is really no plurality.…(3) The pantheism of the Upanishads is but a compromise between the two opposite points of view—the metaphysical one which does not recognise any reality outside of the Atman, ie, consciousness

ইহাদের সাধারণ শিক্ষা

---

১ দ্রষ্টব্য অশোকনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত গীতা ২য় অধ্যায় পৃঃ ২০৭-৮

২ ঈশা উপ ৮

৩ Vedic Age, পৃঃ ৪৯৭

and the empirical one according to which a manifold universe exists external to us···(4) Thus when it is stated that the universe is the Atman. the identity remains very obscure. This obscurity was sought to be removed by borrowing the well-known empirical category of causality and representing that the Atman is the chronologically antecedent cause and the universe is its effect, its creation."

উপনিষদে সন্ন্যাস এবং যুক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায়। জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ লইয়া উপনিষদে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য শঙ্করের ক্ষুরধার যুক্তিতে জ্ঞানের এবং সন্ন্যাসের প্রাধান্যেই আমরা তাহার ফল দেখি। নিষ্কাম কর্মের যে কথা আমরা গীতায় শুনিতে পাই, তাহার মূলও এই উপনিষদে। ইহাই কর্মসন্ন্যাস। সর্বফল ভগবানে সমর্পণ করাই হইতেছে কর্মযোগ। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ।"[১] সাধারণ যুক্তি লইয়া উপনিষদের ব্রহ্ম বা উপনিষদপুরুষকে জানা যায় না। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, What is logic of the infinite, is magic to the finite। আচার্য্য শঙ্করের নেতিবাদও উপনিষদের তত্ত্বের নিকট স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

Asceticism, Intellectualism

ঋগ্বেদে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে, উপনিষদে সেই একেশ্বর বাদ অদ্বৈততত্ত্বে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই পরিণতিরই এক স্তরে দেখা যায় যে দেবতাকে যখন আরাধনা করা হইতেছে তখন তাঁহাকেই একেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি একমাত্র দেবতা বলিয়া মনে করা হইতেছে; পূর্বেই বলিয়াছি উপনিষদের মূল মন্ত্রই

উপনিষদের 'monism' বা অদ্বৈততত্ত্ব

১ কঠ উপ ১।২।১৫

হইতেছে বিশ্বই ব্রহ্ম, আর ব্রহ্মই আত্মা। অর্থাৎ উপনিষদ্ খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে দেখিয়াছেন, বহুর মধ্যে এককে দেখিয়াছেন, অসংখ্য অল্পের মধ্যে ভূমার উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন। বিশ্লেষের মধ্যে সংশ্লেষকে জানিবার উপায় উপনিষদে আছে। একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়—উপনিষদ্ বিশ্বসৃষ্টির মূলে এই তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

(শ্বে. উ. ৬।১১)। আবার পরবর্ত্তী মন্ত্রেই বলা আছে—"একং বীজং বহুধা যঃ করোতি।" উপনিষদ্ সেই অদ্বৈত সত্যসুন্দরের উপাসনায় ব্যাপৃত।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥" (শ্বে. উ. ৬।৭)

ব্রহ্মই জগতের কারণ বা ultimate cause কিনা, শ্বেতাশ্বতরের ব্রহ্মবাদী এই প্রশ্নের সমাধান চাহিয়াছেন। ইহার উত্তরের মধ্যেই Upanisadic monismএর সন্ধান আছে।

আস্তিক ও নাস্তিক মতের উপর উপনিষদের প্রভাব সমভাবেই পরিস্ফুট। উপনিষদ্ জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয় দেখাইয়াছে।[১] ইহাই পরবর্ত্তী যুগে গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই মার্গত্রয়ে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের সকল আস্তিক ধর্মের মূলে রহিয়াছে উপনিষদের কোনো না কোনো বাণী। হিন্দুধর্মের যে নানা শাখা-প্রশাখা, সকলেই উপনিষদ্রূপ বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে। আবার জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক প্রভৃতি দর্শনের মূলেও এই উপনিষদ্। এমনকি, ইস্লামও উপনিষদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছে। [দ্রষ্টব্য Sufism and Vedānta—Ramā Chaudhuri)

আস্তিক ও নাস্তিক মতের উপর প্রভাব

পাশ্চাত্ত্যমনের উপরেও উপনিষদ্ অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সকল পাশ্চাত্ত্য মনীষীই এক বাক্যে উপনিষদের জয়গান গাহিয়াছেন। অনেকে ইহাকে জ্ঞানের আকর বা খনি আখ্যাতেও অভিহিত করিয়াছেন।

১ ঈশোপনিষদই ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বিখ্যাত জার্মাণ মনীষী ও দার্শনিক Schopenhauer উপনিষদ্‌কে "the production of the highest human wisdom". বলিয়াছেন।[১] তিনি প্রায়ই বলিতেন যে "it (i.e, the Upanisad) has been the solace of my life and will be the solace of my death"[২]

পাশ্চাত্ত্যমনের উপর প্রভাব

উপনিষদের তত্ত্বগুলির মূলে pessimism আছে না optimism আছে বিচার করিয়া দেখা উচিত। ভিণ্টারনিৎস্ বলেন, "The old Vedic Upaniṣads contain but the germs of pessimism in the doctrine of the non-reality of the world. Only the Brahman is real, and this is the Atman, the soul..."[৩] কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বা গুণের অস্তিত্ব উপনিষদ স্বীকার করেন নাই। সেজন্য ক্লেশ, দুঃখ বা বেদনা প্রভৃতি ইহলৌকিক ধর্মের কোন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। যিনি ব্রহ্মানন্দকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই। কারণ যিনি একত্বকে জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে মোহই বা কি? শোকই বা কি?[৪] ব্রহ্মের অপর নাম আনন্দ। আত্মা আনন্দময়। ব্রহ্ম আনন্দময়—এই বাণীতেই Upaniṣadic optimismএর পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', ইত্যাদি।[৫]

উপনিষদ তত্ত্বের মূলে pessimism না optimism?

ভিণ্টারনিৎস্ সেজন্যই বলিয়াছেন—"Thus the doctrine of the Upaniṣads is at bottom not pessimistic,"[৬] কিন্তু যতই উচ্ছ্বাসের সহিত ব্রহ্মানন্দের জয়গান কীর্তিত হইয়াছে, ততই পার্থিব অস্তিত্বের অপূর্ণতা, নশ্বরতা, অসারতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য "after all, the pessimism of later Indian philosophy has its roots in the Upaniṣads."[৭]

ভিণ্টারনিৎসের মত

১ দ্রষ্টব্য *A History of Indian Literature* Vol I, পৃঃ ২০
২ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২৬৭
৩ *A History of Indian Literature* Vol I পৃঃ ২৬৪
৪ 'তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।' (গীতা)
৫ তৈঃ উপ ৩।৬
৬ *A History of Indian Literature* Vol I পৃঃ ২৬৩
৭ ঐ। উপনিষদের শিক্ষা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য রাধাকৃষ্ণনের *Indian Philosophy* Vol I পৃঃ ১৩৯

নয়

বেদাঙ্গ

উপনিষদ্ যুগের পর আসিল বেদাঙ্গ যুগ। এই যুগে ঋষিদের দৃষ্টি ছিল নানাদিকে। তাহার ফলেই বেদাঙ্গের উৎপত্তি। বেদের অঙ্গ 'বেদাঙ্গ'। বেদ বুঝিতে গেলে এইগুলির বিশেষ প্রয়োজন। বেদাঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ।

ক প্রয়োজন ? কয়টি ? কাহাকে বলে ?

বিশাল বৈদিক সাহিত্য অভ্রান্তভাবে পঠনপাঠনের ব্যবস্থার জন্যই ছয় বেদাঙ্গের সৃষ্টি। ১

বেদপন্থীরা বেদকে স্বত উদ্ভূত বা ঈশ্বর-প্রকাশিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বেদাঙ্গগুলি মুনিঋষিদের রচিত, কাজেই কতকগুলি রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। মুনি বা ঋষির অর্থ জ্ঞানী, পণ্ডিত। সেকালে সমস্ত শাস্ত্রই মুখস্থ করিয়া রাখার প্রথা ছিল, ইহার কারণ লিখিত পুস্তকাদির অভাব। অল্প কথা মনে রাখার পক্ষে সুবিধা। সেজন্য অল্প কথায় শাস্ত্রের তাৎপর্য রচিত হইত। ইহাদের সূত্র আখ্যা দেওয়া হয়। সূত্র সবগুলিই প্রায় গদ্যে রচিত, কচিৎ পদ্যেও দেখা যায়। সূত্র কাহাকে বলে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।" ২

পৌরুষেয়ত্ব

ম্যাক্সমূলারের মতে সূত্রযুগ বা বেদাঙ্গযুগ উপনিষদ যুগের পরবর্তী। অর্থাৎ তাঁহার মতে আনুমানিক খৃষ্ট পূর্বাব্দ ৬০০—২০০র মধ্যে তাহারা রচিত হইয়াছিল। ভিণ্টারনিৎস্ পাণিনি ব্যাকরণের রচনাকাল আনুমানিক ৪০০

---

১ দ্রষ্টব্য V. Varadachari—*A Htstory of Samskrita Literature* পৃঃ ৩১

২ দ্রষ্টব্য P. Chakravarti—*Philosophy of Sanskrit Grammar*

খৃঃ পূর্বাব্দ ধরিয়াছেন।[১] পাণিনি ব্যাকরণ একটি প্রধান বেদাঙ্গ। অতএব তাঁহার মতে বেদাঙ্গের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ৬০০—৪০০ অব্দই বলা যায়। জনৈক লেখকের মতে বেদাঙ্গের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ১০০০—৪০০ অব্দ। তবে এই মত সম্পূর্ণ বিচারসহ না হইলেও কোন কোন সূত্রগ্রন্থ যে ব্রাহ্মণযুগের সমসাময়িক ভিণ্টারনিৎস নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

রচনাকাল

সায়ণ বলিয়াছেন—"অতিগম্ভীরস্য বেদস্যার্থমববোধয়িতুং শিক্ষাদীনি ষড়ঙ্গানি প্রবৃত্তানি।.........সাধনভূতধর্মজ্ঞানহেতুত্বাৎ ষড়ঙ্গসহিতানাং কর্মকাণ্ডানামপরবিদ্যাত্বম্।" অর্থাৎ বেদের অর্থ অতিশয় গম্ভীর বলিয়া তাহা বুঝিবার জন্য শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে।

সাধারণ বিষয়বস্তু

যাহাতে বর্ণজ্ঞান ও স্বরাদি উচ্চারণের নিয়মাদির উপদেশ আছে তাহার নাম শিক্ষা বেদাঙ্গ। শিক্ষা শব্দে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তানের ব্যাখ্যাই বুঝায়। বর্ণ বলিতে অকারাদি বুঝায়। স্বর বলিতে উদাত্তাদি বুঝায়। মাত্রা অর্থে হ্রস্বাদি, বল অর্থে অকারাদি বর্ণ-সমূহের উচ্চারণপ্রযত্নকে বুঝায়। সাম অর্থে শিক্ষার সাম্য (সমতা) বলা হইয়াছে। অতিদ্রুত, অতিবিলম্বিতাদি গীতিদোষরহিত মাধুর্যাদি গুণযুক্ত উচ্চারণকেই সাম্য বলা হয়। সন্তান শব্দের অর্থ সংহিতা বা সন্ধি। এই সমস্ত বিষয় ব্যাকরণেও বলা হইয়াছে। শিক্ষাকালীন বর্ণস্বরাদির ব্যতিক্রম উপস্থিত হইলে দোষ হয়, তাহা শিক্ষা গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—

শিক্ষা

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

সেইজন্য মন্ত্রের স্বর ও বর্ণাদি বিষয়ক অপরাধ বা ত্রুটি পরিহারের জন্যই শিক্ষারূপ বেদাঙ্গের অপেক্ষা রহিয়াছে। এই নিমিত্ত বেদার্থবোধের জন্য সর্বাগ্রে শিক্ষারূপ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করা কর্তব্য। শিক্ষার কতক বিষয়

১ *A History of Indian Literature* Vol I পৃঃ ৪২

প্রাতিশাখ্য নামক গ্রন্থরাজির অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাগ্রন্থের নাম :—আপিশলি শিক্ষা, ভারদ্বাজ শিক্ষা, নারদীয় শিক্ষা, পাণিনীয় শিক্ষা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বেদাঙ্গ—কল্প। যাগপ্রয়োগ এই শাস্ত্রে সমর্থিত হয়, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে কল্প নামক সূত্রগ্রন্থ বেদাঙ্গ হইয়াছে। কল্পসূত্র চারি প্রকার—শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও শুল্বসূত্র। শ্রৌতসূত্রের মধ্যে আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রই প্রধান।

শ্রৌত, ধর্ম, গৃহ্য ও শুল্ব

শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যজ্ঞের বিধান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণাদির নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য, শুদ্ধ্যশুদ্ধি আর চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্য প্রভৃতির বিধান আছে। এই ধর্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বহুবিধ পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। গৌতম, আপস্তম্ব, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, বৈখানস প্রভৃতির লেখা ধর্মসূত্র সমধিক প্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তীযুগে স্মৃতি সংহিতা, স্মৃতির টীকা প্রভৃতি লইয়া এই বিভাগের বহুল প্রচার হইয়াছে। স্মৃতিগুলির অবলম্বন প্রধানত ধর্মসূত্র আর অংশত শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র।[১] গৃহ্যসূত্রে দ্বিজগণের উপনয়নাদি সংস্কার প্রভৃতির বিধান আছে। সে যুগের সামাজিক আদর্শ ও অবস্থা বুঝিতে হইলে গৃহ্য ও ধর্ম সূত্র পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভিণ্টারনিৎসের মতে নৃতত্ত্ববিদ্গণেরও গৃহ্যসূত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন ভারতের বিধিব্যবস্থা গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র হইতেই জানা যায়।

কল্প

শুল্বসূত্রগুলি (বা শূল্বসূত্র) শ্রৌতসূত্রের সহিত সংযুক্ত। শুল্ব শব্দের অর্থ 'string' বা সূত্র। ইহাতে যজ্ঞবেদির মাপ, আকার ও নির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে এই শুল্বসূত্রে যে রেখাগণিতের (বা Geometryর) বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা পৃথিবীর প্রাচীনতম। কর্ণ, ভুজ, লম্ব প্রভৃতির নাম শুল্বশূত্রে পাওয়া যায়।

---

১ এইস্থলে বিচার্য্য যে, ছন্দোবদ্ধ স্মৃতিগুলি ধর্মসূত্রের পূর্ববর্ত্তী, না পরবর্ত্তী ? পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের মতেই ছন্দোবদ্ধ স্মৃতি (Metrical Smṛti) ধর্মসূত্রের পর্ববর্ত্তী মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

শ্রুতি হইতে আগত অর্থাৎ ত্রয়ীর নির্দেশ অনুসারে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হইত তাহাই শ্রৌত। আর গৃহে বিনা আড়ম্বরে যে প্রাত্যহিক কর্মের অনুষ্ঠান হইত, তাহাই গৃহ্য। যাহা শ্রৌত নহে, তাহাই সাধারণতঃ স্মৃতি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় বেদাঙ্গ ব্যাকরণ। ইহা প্রকৃতি (ধাতু ও শব্দ) প্রত্যয় (সুপ্ ও তিঙ্) প্রভৃতির প্রয়োগের দ্বারা পদের স্বরূপ ও অর্থ নির্ণয় করিয়া থাকে; এইজন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রেরও বেদার্থবিচারে যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে। ব্যাকরণ শব্দগঠন ও ভাষা নিয়ন্ত্রণের শাস্ত্র। অতি প্রাচীনকালে প্রাতিশাখ্য নামে প্রতি বেদের প্রতি শাখার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ ছিল। তাহাতে কোন্ বেদে কোন্ শব্দ কি প্রকারে উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য, স্বরসঞ্চার, সন্ধি, ছন্দ, প্রভৃতি বিষয় উক্ত হইয়াছে। প্রাতিশাখ্যকে ব্যাকরণের আদিরূপ বলা যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে সুসজ্জিত প্রাতিশাখ্যই ব্যাকরণ। বর্ত্তমানে ব্যাকরণের প্রাচীনতম গ্রন্থ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী। খৃষ্টপূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ভিণ্টারনিৎস মনে করেন।[১] অষ্টাধ্যায়ী সর্বজনবিদিত। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও বলেন যে সমস্ত পৃথিবীতে এমন পরিপূর্ণ একখানি ব্যাকরণও আর নাই। অষ্ট্যাধায়ীতে ৩৮৬৩টি সূত্র আছে। আপিশলি, শাকল্য, গার্গ্য, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ পাণিনির পূর্ববর্ত্তী। ইহারা ছাড়াও 'প্রাচ্য', 'উদীচ্য' প্রভৃতি বৈয়াকরণের উল্লেখ পাণিনি করিয়াছেন। ইহাদের রচিত গ্রন্থ কিছুই পাওয়া যায় না। মহাভাষ্যে আছে—রক্ষা, উহ, আগম, লঘু, অসন্দেহ—এই কয়েকটিই ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন।[২] (বিস্তারিত বিবরণের জন্য সায়ণের ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা এবং মহাভাষ্যের পস্পশা আহ্নিক দ্রষ্টব্য।)

ব্যাকরণ

চতুর্থ বেদাঙ্গ নিরুক্ত। অর্থজ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া পদসমূহ যাহাতে

১ দ্রষ্টব্য A History of Indian Literature, Vol I পৃঃ ৪২

২ ব্যাকরণের প্রয়োজন বিষয়ে একটি কারিকা প্রচলিত আছে।

"যদ্যপি বহু নাধীষে পঠ পুত্র ব্যাকরণম্। স্বজনঃ শ্বজনো মাভূৎ সকলঃ শকলস্তথা" ॥

উক্ত হইয়াছে তাহার নাম নিঘণ্টু। নিরুক্তগ্রন্থ নিঘণ্টুধৃত শব্দরাশির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখাইয়াছে। নিরুক্ত যথাক্রমে নৈঘণ্টুক, নৈগম এবং দৈবত—এই তিনকাণ্ডে বিভক্ত। কোন্ পদ কোন্ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহার বিচার ইহাতে আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ আজও স্বীকার করেন যে বেদ বুঝিতে গেলে নিরুক্তপাঠ অপরিহার্য্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম অভিধানের নিদর্শন নিঘণ্টু। কাহারও কাহারও মতে যাস্কাচার্য্য নিঘণ্টুকর্ত্তা; যাস্কই পুনরায় এই নিঘণ্টুর উপর ভাষ্য লেখেন। ইহাই "নিরুক্ত"। নিঘণ্টুতে এক এক বস্তুর যত নাম হইতে পারে সেগুলি একত্র করিয়া সুসজ্জিত আছে। নিঘণ্টু ও নিরুক্ত—উভয়েই নিঃসংশয়ে খৃষ্টপূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কেহ কেহ নিঘণ্টুকেও অপৌরুষেয় বলেন।

নিঘণ্টু ও নিরুক্ত

বেদার্থ বুঝিবার জন্য ছন্দশাস্ত্রেরও উপযোগিতা আছে। এই কারণেই স্থানে স্থানে ছন্দবিশেষের বিধান বলা আছে। সাত প্রকার ছন্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়েই কিছু বলিয়াছি। ২৪ অক্ষরে গায়ত্রী, ২৮ অক্ষরে উষ্ণিক্; এইরূপ উত্তরোত্তর চারি অক্ষর বর্ধিত হইলে অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দ অবগত হওয়া যায়। এই ছন্দ বুঝিবার জন্য যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, পিঙ্গলাচার্য্যের 'ছন্দঃসূত্র' তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। কোন্ প্রকারের কবিতায় কত অক্ষর, কত পঙ্‌ক্তি থাকিবে, পঙ্‌ক্তির মধ্যে কত অক্ষরের পর যতি থাকিবে ইত্যাদি বিষয় ইহাতে লিখিত আছে।

ছন্দ—পিঙ্গল

ষষ্ঠ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞকালসিদ্ধির জন্য জ্যোতিষের প্রয়োজন হয়। এই সকল কালবিশেষে যজ্ঞ করিবার বিধি। কালবিশেষ অবগত করাইবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের উপযোগিতা আছে। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে দিন গণনা করা হইত। অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিষেশ যজ্ঞ কর্ত্তব্য। এজন্যই জ্যোতিষের সৃষ্টি।

জ্যোতিষ

শিক্ষাগ্রন্থে বলা হইয়াছে—ছন্দ বেদের পাদদ্বয়, কল্প হস্তদ্বয়, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা ঘ্রাণ, ব্যাকরণ মুখ—সেইহেতু এই পাদাদি স্বরূপ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গসহ বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য।[১]

'সূত্রযুগ' বৈদিক সাহিত্যের শেষ যুগ বা অধ্যায়। পৌরুষেয় রচনার কাল হিসাবে ইহাকে "সূত্রযুগ" নামে পৃথক্ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই যুগে বিশাল বৈদিক সাহিত্যকে সংক্ষেপে আয়ত্ত করার চেষ্টা দেখা যায়। আর এই চেষ্টা যে কত সুচারুরূপে ফলবতী হইয়াছে পাণিনি প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠেই তাহা বিশেষভাবে প্রতীত হয়। অর্ধমাত্রা কম করিতে পারিলেও বৈয়াকরণ তথা সূত্রকার পুত্রোৎসবের আনন্দ লাভ করিতেন।

সূত্রযুগ

ভিণ্টারনিৎস্ বেদাঙ্গসাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন —(ক) The Literature of Ritual বা কল্প। ইহার মধ্যে রহিয়াছে শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্বসূত্রগুলি। (খ) The Exegetic Vedāṅgas বা ভাষ্য অথবা বিবৃতিমূলক বেদাঙ্গ। এই বিভাগে তিনি শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষের আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় মতে বেদাঙ্গের যে বিভাগ তাহা আমরা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দেখাইয়াছি।

ভিণ্টারনিৎসের মতে বেদাঙ্গের বিভাগ

বেদাঙ্গের প্রসঙ্গে অপর দুইটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় নাই। কারণ সেগুলি প্রকৃত পক্ষে বেদের অঙ্গীভূত নহে। তথাপি বৈদিক সাহিত্য পঠন-পাঠনের পক্ষে তাহাদের উপযোগিতা অনস্বীকার্য্য। ঐ দুইটি গ্রন্থই ছন্দোবদ্ধ বা metrical। উহাদের রচয়িতা শৌনক। একটির নাম 'বৃহদ্দেবতা',

'বৃহদ্দেবতা'

১। "ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ (শিক্ষা ৪১, ২৪)

অপরটি 'ঋগ্বিধান'। ভিণ্টারনিৎসের মতে উহারা শৌনকের রচিত নহে, শৌনক শাখার কোন লেখকের রচনা হইতে পারে।[১] 'বৃহদ্দেবতা' ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন সূক্তস্থিত দেবগণের নির্ঘণ্ট মাত্র; ইহাতে ঐ সকল দেবগণের বিষয়ে কাহিনী ও উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। ভিণ্টারনিৎস্ এইজন্য ইহাকে "an important work from the point of view of Indian narrative literature" বলিয়া মনে করেন। 'বৃহদ্দেবতা' একটি অতি প্রাচীন আখ্যানমূলক গ্রন্থ। 'ঋগ্বিধান'ও অনুরূপভাবে ঋগ্বেদ-সংহিতার বিভাগ, প্রতি সূক্ত বা প্রতিটি ঋকের অলৌকিক ক্ষমতা প্রভৃতির বিবরণমাত্র।

'ঋগ্বিধান'

'অনুক্রমণী' গ্রন্থগুলিও বেদাঙ্গের পর্য্যায়ে পড়ে না। ভিণ্টারনিৎস্ ইহাদিগকে "catalogues", "lists", "indexes" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহারা বিভিন্ন বিষয়ে বৈদিক সংহিতাগুলির ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছে। এইগুলির মধ্যে শৌনকের 'ঋগ্বেদানুক্রমণী' ও কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'ই সমধিক প্রসিদ্ধ।

'অনুক্রমণী'

১। দ্রষ্টব্য :—Winternitz—*A History of Indian Literature* Vol I পৃঃ ২৮৬

এপিক ও পৌরাণিক যুগ

দশ

এপিক

এপিক শব্দটি বিদেশী। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই শব্দটি প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমেই ইহার অর্থ ভালরূপে বুঝা দরকার।

এপিক—
Epic of Growth
ও
Epic of Form

সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে এপিক দ্বিবিধ,—Epic of Growth বা Authentic Epicএ এবং Epic of Form বা Literary Epic। প্রথমোক্ত Epic এমন একটি মহাকাব্য যাহাতে সমগ্র দেশের যুগচেতনা প্রতিফলিত হয়। ইহা শূরযুগের শূরকাব্য ; ইহাতে প্রধান রস শৃঙ্গারাশ্রিত বীর এবং নায়ক জনহিতার্থে যুদ্ধব্যাপৃত বীরপুরুষ। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, ইহার আখ্যানভাগ যেন সর্বসাধারণের নিজস্ব সম্পদ ; কবি স্বীয় কবিত্বগুণে ইহাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা কাব্যে রূপায়িত করেন মাত্র। শেষোক্ত এপিক কবির মানসী সৃষ্টি ; ইহার পরিবেশ ও পটভূমিকার সহিত যেন সর্ব্বসাধারণের সংযোগ নাই। অনেক ক্ষেত্রেই কবি প্রথম প্রকারের এপিকের অংশবিশেষ অবলম্বনে স্বীয় যুগের ভাবে ভাবিত হইয়া ইহা রচনা করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের এপিক কাব্যকে পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—Popular Epic অর্থাৎ জনপ্রিয় মহাকাব্য ও Court Epic অর্থাৎ রাজসভাশ্রিত মহাকাব্য। প্রথম প্রকারের এপিক রচিত হইয়াছিল যুগপ্রতিনিধি কবি কর্ত্তৃক এবং জনসাধারণের জন্য, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর এপিক সৃষ্ট হইয়াছিল প্রধানতঃ রাজকীয় সাহায্যপুষ্ট কবি কর্ত্তৃক, রাজার মনস্তুষ্টি এবং মুষ্টিমেয় কাব্যরসপিপাসু ব্যক্তিগণের চিত্তবিনোদনের জন্য। সুতরাং একটিতে আছে সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী, অপরটিতে রহিয়াছে কাব্য নৈপুণ্য প্রদর্শনের সচেতন প্রয়াস। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে জনপ্রিয় মহাকাব্যই আলোচ্য।

Popular Epic
ও
Court Epic

ভারতবর্ষে এই এপিক কাব্যের উদ্ভব যে কোন সুদূর অতীতে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের সংবাদ-সূক্তগুলি (dialogue hymns) এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলীর আখ্যান, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ পরবর্ত্তী কালের জনপ্রিয় এপিকের অগ্রদূত স্বরূপে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল। সুপ্রাচীন কাল হইতেই, যাগযজ্ঞাদিতে এবং অন্যবিধ কতক অনুষ্ঠানে দেব দেবী এবং বীরগণের কাহিনী আবৃত্তি করা হইত। তাহা ছাড়া, রাজ দরবারে রাজার এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণের স্তুতিগান করিবার রীতিও প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সূত ও কুশীলব নামে দুইটি সংপ্রদায়ের সৃষ্টি হইল। সূতগণ রাজকীয় সাহায্যপুষ্ট হইয়া বিশেষ উপলক্ষ্যে রাজবংশের জয়গান করিত। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যইয়া চাক্ষুষ বর্ণনা রাজাদের নিকট করিত। 'মহাভারতে' ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধবর্ণনাকারী সঞ্জয় এই শ্রেণীর সূতের উদাহরণ স্বরূপ। ইহা ছাড়া, কুশীলবগণ স্থানে স্থানে বীরত্ব-গাথা গাহিয়া গাহিয়া ভ্রমণ করিত, এবং এইরূপে ইহা জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইত। 'রামায়ণে' বর্ণিত আছে যে, রামের পুত্রদ্বয়, কুশ ও লব, বাল্মীকির নিকট হইতে রামের কাহিনী শিক্ষা করিয়া উহা নানাস্থানে জনসাধারণের নিকট গাহিয়া ভ্রমণ করিত। কাল-ক্রমে পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত এই জনপ্রিয় কাহিনী ও গাথাগুলি সাহিত্যিক আকার ধারণ করিয়া জনগণের সমাদরের বস্তু হইয়া উঠিল ; কিন্তু, সর্বসাধারণের প্রিয় বলিয়া অনেকেই এই সাহিত্যিক রূপে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সংযোজন, বিযোজন ও পরিবর্ত্তন প্রভৃতি করিলেন ; করাও সহজ ছিল, কারণ সে যুগে হস্তলিখিত পুথিই ছিল সাহিত্যের বাহন। বলা বাহুল্য, এই জনপ্রিয় কাহিনীগুলি সাহিত্যের রূপ পাইবার পূর্বেই নানা আকার ধারণ করিয়াছিল ; মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনীর পরিবর্ত্তন অনিবার্য। সংক্ষেপে এইরূপই ভারতবর্ষে এপিকের উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস।

ভারতীয় এপিকের উৎপত্তি

সূত ও কুশীলব

এপিকের চলিত ও সাহিত্যিক রূপ

এগার

রামায়ণ

রামায়ণের স্বরূপ

'রামায়ণ' যেরূপে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহাতে সাতটি কাণ্ড আছে। কাণ্ডগুলি যথাক্রমে এইরূপ ঃ—

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

(১) বাল কাণ্ড (২) অযোধ্যা কাণ্ড (৩) অরণ্য কাণ্ড
(৪) কিষ্কিন্ধা কাণ্ড (৫) সুন্দর কাণ্ড (৬) যুদ্ধ কাণ্ড
(৭) উত্তর কাণ্ড

এই সাতটি কাণ্ডের মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় চব্বিশ হাজার।

'রামায়ণকে' প্রাচীনকাল হইতেই 'আদিকাব্য' বলা হইয়াছে। জনপ্রিয় বীরত্ব-গাথার সহিত ইহাতে কাব্যের উপাদানের প্রচুর সংমিশ্রণ আছে। পরবর্ত্তী যুগের মহাকাব্যে উপমা ও শ্লেষাদি অলঙ্কার-বাহুল্যের সূচনা রামায়ণের রচনাতেই দেখা যায়।

রামায়ণের বিভিন্ন রূপ

বর্ত্তমানে আমরা তিনটি রূপে 'রামায়ণ'কে পাইয়া থাকি ; যথা—(১) পশ্চিম ভারতীয় (বা, উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় অথবা কাশ্মীরী) রূপ

তিনটি রূপ

(২) বঙ্গদেশীয় রূপ

(৩) দক্ষিণ-ভারতীয় রূপ

এখন প্রশ্ন এই যে, একই 'রামায়ণে'র এতগুলি রূপ উদ্ভূত হইল কি করিয়া? সম্ভবতঃ, রামায়ণের মূল কাহিনীটি ভারতের বিভিন্ন অংশে ভাটগণের মুখে মুখে চলিতে চলিতে বিকৃত হইয়া পড়ে এবং উহার সাহিত্যিক রূপটি স্থানভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

রূপান্তরের কারণ

এই রূপগুলিতে শ্লোকসমূহের ক্রম, সংখ্যা ও পাঠে পরস্পরের ভেদ দেখা যায়।

বিভিন্ন রূপের পরস্পর প্রভেদ

রামায়ণের রচয়িতা

বাল্মীকিকে কবিগুরু এবং আদিকবি বলা হয়। 'রামায়ণ' তাঁহারই রচিত বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু বাল্মীকি নামে যথার্থ কোন কবির অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিংবদন্তী এই যে, তিনি রত্নাকর নামে এক দস্যু ছিলেন এবং পরে তাঁহার জীবনে অদ্ভূত পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি পরে তপস্যারত অবস্থায় বল্মীক (অর্থাৎ উইমাটী) দ্বারা আবৃত হইয়া পড়েন—ইহা হইতেই তাঁহার নাম হয় বাল্মীকি। রামায়ণের রচয়িতা যিনিই হইয়া থাকুন, তিনি মূল কাহিনীর সাহিত্যিক রূপের স্রষ্টা মাত্র ; এপিক কাহিনীটি সাহিত্যিক রূপের বহুকাল পূর্বেই প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাল্মীকি সাহিত্যিক রূপের স্রষ্টা

রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ

আধুনিক অনেক পণ্ডিতের মতে, 'রামায়ণে'র প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডকে পরবর্ত্তীকালে মূল 'রামায়ণে'র সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই মত প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণ-গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত :—

প্রথম ও সপ্তমকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত—যুক্তি

(১) এই দুই কাণ্ডের রচনাশৈলী ও ভাষা অপর পাঁচটি কাণ্ডের তুলনায় নিকৃষ্ট

(২) অরণ্যকাণ্ডে দেখা যায়, লক্ষ্মণের বিবাহ তখনও হয় নাই ; কারণ, রামচন্দ্র শূর্পনখাকে 'অবিবাহিত' লক্ষ্মণের নিকট যাইতে বলিলেন। কিন্তু, বালকাণ্ডে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র ও তাঁহার অপরাপর ভ্রাতৃগণের এককালেই বিবাহ হইয়াছিল

(৩) এই দুই কাণ্ডেই রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতাররূপে পরিগণিত ; কিন্তু অপর কোন কাণ্ডেই তাঁহার এই পরিচয় নাই। দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত রামচন্দ্র একজন মানুষই, তবে অসীম বীর্যশালী পুরুষ

(৪) এই দুই কাণ্ডে নানাপ্রকার আখ্যান উপাখ্যান থাকায় মূল ঘটনা-প্রবাহ প্রায়ই ব্যাহত হয় ; কিন্তু অপর কাণ্ডগুলিতে ঈদৃশ ব্যাপার বিরল।

(৫) প্রথম কাণ্ডে বর্ণিত কোন ঘটনা সম্বন্ধেই অপর কাণ্ডগুলিতে কোন উল্লেখ নাই।

'রামায়ণে'র বহু পুথির সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহার ষষ্ঠকাণ্ডের অন্তর্গত সীতার অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপারটিও পরবর্তীকালের রচনা।[১]

ষষ্ঠকাণ্ড অংশতঃ প্রক্ষিপ্ত

যুগ যুগ ধরিয়া মুখে মুখে গীত হইতে হইতে রামায়ণকাহিনী একটি সার্বজনীন বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। গায়কের রুচি ও তাঁহার শ্রোতৃবর্গের রুচি অনুযায়ী সম্ভবতঃ মূল আখ্যানে সংযোজন, বিযোজন, পরিবর্তন প্রভৃতি করা হইয়াছিল। সাহিত্যে যখন এই কাহিনী রূপায়িত হইল, তখনও গ্রন্থরচয়িতৃগণ পবিত্র রাম-চরিত লিখিতে বসিয়া উহার মূল ও প্রক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে প্রভেদ করার কথা মনেই করিতে পারিলেন না; যাহাই 'রামায়ণ' নামে প্রচলিত দেখিতে পাইলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিলেন। ফলে, ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিক রূপে ইহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিল।

প্রক্ষিপ্ত অংশের উদ্ভব

রামায়ণের রচনাকাল

'রামায়ণে'র রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার; এই দুরূহত্বের একটি প্রধান কারণ এই যে, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বর্তমানে যে রূপে 'রামায়ণ'কে আমরা পাইতেছি তাহাতে মূল গ্রন্থের সহিত পরবর্তীকালে দুইটি সম্পূর্ণ কাণ্ড (প্রথম ও সপ্তম) এবং নানা স্থানে শ্লোকসমূহ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং প্রথমেই আমাদের দেখা প্রয়োজন, মূল 'রামায়ণ'টি কখন রচিত হইয়াছিল এবং উহার ও পরবর্তী অংশের মধ্যে ব্যবধান কতকালের।

রচনাকাল নির্ণয়ে অসুবিধার কারণ

পূর্বেই দেখিয়াছি, মূল অংশেই রামচন্দ্র একজন অসীম শৌর্যসম্পন্ন পুরুষ, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশে তিনি ঈশ্বরের অবতার। 'মানুষ' রামচন্দ্র 'ঈশ্বরে'

১। দ্রঃ *Journal of the Oriental Institute*, Baroda, Vol. V, p.292

পরিণত হইতে নিশ্চয়ই বহুকাল অতীত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, প্রক্ষিপ্ত অংশে বাল্মীকিকে দেখা যায় রামচন্দ্রের সমকালীন অরণ্যবাসী ঋষিরূপে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মূল রামায়ণের গ্রন্থকার পরবর্ত্তী অংশে পৌরাণিক ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন; এই ব্যাপার ঘটিতেও সম্ভবতঃ বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুই অংশের রচনাকালের মধ্যে ব্যবধান ঠিক কতটুকু এবং ইহাদের রচনাকাল ঠিক কি তাহা অনির্ণেয়।

মূল ও প্রক্ষিপ্ত অংশের রচনাকালের ব্যবধান

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অনুসারে 'রামায়ণ' 'মহাভারতের' পূর্ববর্ত্তী। এইরূপ মনে করার প্রধান কারণ, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী 'কৃষ্ণ' অবতার অপেক্ষা 'রাম' অবতার পূর্ববর্ত্তী। এই যুক্তির প্রধান ত্রুটি এই যে, রামায়ণের মূল অংশে রামচন্দ্রকে আদৌ অবতার মনে করা হয় নাই। সামাজিক প্রথার তুলনা করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, সতীদাহের কথা 'মহাভারতে' আছে এবং 'রামায়ণে' নাই; সুতরাং 'রামায়ণ' 'মহাভারতে'র পূর্ববর্ত্তী। এই যুক্তিও অবিসংবাদিত নহে, কারণ উভয় গ্রন্থেরই মূল অংশে সতীদাহ প্রথার কোন উল্লেখ নাই। পণ্ডিত য্যাকবি (Jacobi) মনে করেন, 'রামায়ণ' পূর্ববর্ত্তী এবং ইহারই প্রভাবে 'মহাভারত' এপিক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই মতের সমর্থনে অখণ্ডনীয় কোন প্রমাণ নাই। বরঞ্চ, ভিণ্টারনিৎস্ প্রভৃতি পণ্ডিতের মতে 'মহাভারত'ই পূর্ববর্ত্তী। তাঁহাদের যুক্তি প্রথমতঃ এই যে, দুইটি গ্রন্থের তুলনা করিলে দেখা যায় কাব্য হিসাবে 'রামায়ণ' অনেক উন্নত এবং পরবর্ত্তী মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ, 'মহাভারতে' 'যুধিষ্ঠির উবাচ', 'কুন্তী উবাচ' প্রভৃতিতে প্রাচীন জনপ্রিয় গাথার (ballad) ছাপ রহিয়াছে; কিন্তু 'রামায়ণে' গাথার রূপের কোন নিদর্শন নাই। তৃতীয়তঃ, দুইগ্রন্থে প্রতিফলিত সামাজিক অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মহাভারতের সমাজে লোক জন অধিকতর যুদ্ধপরায়ণ; মহাভারতের কবি যেন যুদ্ধবিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিয়া

'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র রচনাকালের পৌর্বাপর্য

য্যাকবীর মতে 'রামায়ণ' পূর্ববর্ত্তী

ভিণ্টারনিৎসের মতে 'মহাভারত' পূর্ববর্ত্তী

বর্ণনা করিতেছেন। আর অপর গ্রন্থে কবির বর্ণনা যেন আখ্যানমূলক। নারীর বহুপতিত্ব (polyandry) প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা 'মহাভারতে' আছে, 'রামায়ণে' নাই।

ভিণ্টারনিৎস্ এর মতে, রাম-গাথা প্রাচীনতর হইলেও এপিক 'রামায়ণে'র উদ্ভব হইয়াছিল সম্ভবতঃ বুদ্ধোত্তর যুগে। কতক জাতকের গল্পের সহিত রামোপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে জাতকের গল্পে রামোপাখ্যানের সহিত পরিচয় লক্ষিত হইলেও, কোথাও রাবণ বা হনুমান্ প্রভৃতির উল্লেখ নাই। তাহা ছাড়া, দশরথ জাতকের সম্বন্ধে বারটি গাথার মধ্যে মাত্র একটি বর্তমান 'রামায়ণে' পাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ এবং তৃতীয় শতাব্দীতে, যখন বৌদ্ধগ্রন্থ 'তিপিটক' রচিত হয় তখন, সম্ভবতঃ রামোপাখ্যান প্রচলিত ছিল ; কিন্তু উহা তখনও এপিক রূপ ধারণ করে নাই। 'রামায়ণ'কে বুদ্ধোত্তর যুগের রচনা বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাতে বুদ্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে দেখান হইয়াছে যে, যে স্থানটিতে এই উল্লেখ আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত।

ভিণ্টারনিৎস্—
এপিক রামায়ণ
বুদ্ধোত্তর যুগে রচিত

'রামায়ণে' ব্যবহৃত ভাষার সাক্ষ্য হইতে য্যাকবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহা প্রাক্-বুদ্ধ যুগে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার যুক্তি এইরূপ। জনগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার কল্পে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক পালি ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, পালিই তখন সর্ব-সাধারণের ভাষা ছিল। এমন কি, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতকেও নিশ্চয়ই এই ভাষাই জনগণের ভাষা ছিল, কারণ বুদ্ধদেব 'সকায় নিরুত্তিয়া' অর্থাৎ জনসাধরণের নিজের ভাষাতে স্বীয় ধর্মপ্রচারের অনুমতি দিয়াছিলেন ; এই ভাষাও পালি ভাষা। ইহা হইতে মনে হয়, বুদ্ধদেবের সময়েই কথ্যভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিলনা।

য্যাকবি—'রামায়ণ'
প্রাক্-বুদ্ধ যুগে রচিত

'রামায়ণ' সংস্কৃতে রচিত। জনপ্রিয় এপিক্ হিসাবে ইহা জনগণের

ভাষাতেই রচিত হইয়া থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং, এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল যখন সংস্কৃতই সর্বসাধারণের ভাষা ছিল ; সুতরাং ইহা প্রাক্-বুদ্ধ যুগের রচনা।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বেবর (Weber) মনে করেন, গ্রীস্ দেশের কবি হোমারের হেলেন এবং ট্রয়ের যুদ্ধকাহিনী অনুকরণে 'রামায়ণ' রচিত। কিন্তু, 'রামায়ণে' যে যে স্থানে 'যবন' শব্দটির উল্লেখ আছে তাহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। তাহা ছাড়া, 'যবন' শব্দটি যে শুধু গ্রীক্‌দিগকেই বুঝাইত, বর্ত্তমানে অনেকেই তাহা মনে করেন না। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হোমারের গল্পে ও 'রামায়ণে'র আখ্যানে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিকতর।

'রামায়ণে' গ্রীক্ প্রভাব

পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে 'রামায়ণ' ঠিক কোন কালের রচনা তাহা বুঝা যায়না। 'মহাভারত', বুদ্ধদেবের অভ্যুত্থান ও 'তিপিটকে'র সঙ্গে তুলনায় ইহার রচনাকালের আপেক্ষিক পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যায় মাত্র। তবে, ইহার রচনাকালের নিম্নসীমা কতগুলি প্রমাণবলে নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যাইতে পারে। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে' 'রামায়ণে'র প্রভাব কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন। এই 'বুদ্ধচরিত' আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত। ঐ শতকের রচনা কুমারলাতের 'কল্পনামণ্ডিতিকা'তে জনসাধারণের মধ্যে 'রামায়ণে'র আবৃত্তির উল্লেখ আছে। চীনদেশীয় গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে, বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর সময়ে 'রামায়ণ' বৌদ্ধগণের সুবিদিত গ্রন্থ ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জৈন বিমল সূরি স্বীয় প্রাকৃত কাব্য 'পউমচরিঅ'তে রামোপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বীয় ধর্মালম্বিগণের নিকট বাল্মীকির গ্রন্থের প্রাকৃতরূপ উপস্থাপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই পূর্ণাঙ্গ 'রামায়ণ' যে শুধু রচিত হইয়াছিল তাহা নহে, যথেষ্ট প্রসিদ্ধিও লাভ করিয়াছিল। ভিণ্টারনিৎস্‌ও নানা যুক্তিপ্রমাণ বিবেচনা করিয়া প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তেই

বর্ত্তমান 'মহাভারতে'র রচনাকালের নিম্নসীমা— খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতক

উপনীত হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, 'রামায়ণ' সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতকে বর্ত্তমানরূপ ধারণ করিয়াছিল।

রামায়ণের রূপকত্ব

Lassen ও Weber—রূপক

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ল্যাসেন (Lassen) ও বেবরের (Weber) মতে, রামায়ণের মূল কাহিনী একটি রূপক মাত্র। তাঁহারা মনে করেন যে, রামচন্দ্র আর্যসভ্যতার প্রতীক, এবং রাবণের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান দাক্ষিণাত্যে আর্য-প্রভাব বিস্তারের রূপক। য্যাকবি মনে করেন যে, ইহা প্রাচীন ভারতের একটি পুরাবৃত্তমাত্র।

য্যাকবি—পুরাবৃত্তমাত্র

'রামায়ণ' যে রূপের রচনাই হউক, ইহা হইতে আমরা দাক্ষিণাত্যের দুইটি সভ্যতার পরিচয় পাই—একটি বানর-সভ্যতা ও অপরটি রাক্ষস-সভ্যতা। প্রথমটি আর্যগণের অনুকূল ও দ্বিতীয়টি তাঁহাদের প্রতিকূল।

রামায়ণের প্রভাব

পরবর্ত্তী কালের সাহিত্যে ও মানবজীবনের নানা ক্ষেত্রে 'রামায়ণের' প্রভাব সুস্পষ্ট ও অপরিসীম। কালিদাস, ভট্টি ও কুমারদাস প্রভৃতি কবি তাঁহাদের মহাকাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই গ্রন্থ হইতে। ভাস, কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি নাট্যকারগণের অনেক নাট্যগ্রন্থের উপজীব্য 'রামায়ণ'। বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'বাশিষ্ঠ রামায়ণ' প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া 'মহাভারতের' বনপর্বে (২৭৩-২৯১ অধ্যায়) ও 'শ্রীমদ্ভাগবতের' নবম স্কন্ধের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে রামোপাখ্যান বর্ণিত আছে। এই সমস্ত নিদর্শন হইতে এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতবর্ষের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ইহার প্রভাব প্রবল। দেবতার মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্য মুদির দোকানে পর্য্যন্ত নিয়মিত রামায়ণ পাঠের প্রচলন ছিল এবং এখনও যে নাই একথা বলা যায় না। আজ পর্য্যন্তও অমঙ্গল দূর করার জন্য রামায়ণ পাঠ বিধেয় বলিয়া মনে করা হয়। রামের ভ্রাতৃবাৎসল্য, পত্নীপ্রেম ও পিতৃভক্তি,

সংস্কৃত সাহিত্যে

জীবনে

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, ভরতের ত্যাগ ও সীতার পাতিব্রত্য—আজও ভারতে এই সকল আদর্শ জাজ্বল্যমান। পরবর্ত্তীকালে নানা প্রাদেশিক ভাষাতে বাল্মীকির 'রামায়ণের' অনুবাদ বা মূল কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তুলসী দাসের 'রামচরিতমানস', এবং কৃত্তিবাসের বাংলা 'রামায়ণ' প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাড়াও 'অদ্ভূত রামায়ণ' রচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও মহাবীরের পূজা ও অভিনয় ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। উত্তরকালে রামায়ণের প্রভাব সম্বন্ধে এই গ্রন্থেই ভবিষ্যদ্‌বাণী রহিয়াছে ঃ—

প্রাদেশিক সাহিত্যে

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥ (বালকাণ্ড—২।৩৬-৩৭)

এই উক্তি অনেক পরিমাণে সার্থক হইয়াছে।

বার
মহাভারত

মহাভারতের স্বরূপ

ভরতবংশীয়গণের মহাযুদ্ধের বিরাট কাহিনীর নাম 'মহাভারত'। মহাভারত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই গ্রন্থেই দেওয়া হইয়াছে এইরূপে—মহত্বাদ্‌ভারবত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে। (আদিপর্ব—১।৩০০)

'মহাভারত' গ্রন্থকিনা

কিন্তু প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, আমরা যে অর্থে 'গ্রন্থ' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি, ইহা সেই অর্থে গ্রন্থ নহে ; কারণ ইহা এক ব্যক্তির বা এক যুগের রচনা নয়। ইহার রচনার ইতিহাস আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। মহাভারতের স্বরূপ কি তাহাই বর্ত্তমানে আলোচ্য। কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিরোধ, যুদ্ধ ও নানা অবস্থাবিপর্যয়ের পরে ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের জয়লাভ—ইহাই এই এপিকের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নানা বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। মূল বিষয়বস্তু ছাড়াও প্রাচীন ভারতের নানা বীরত্বের গাথা, বিচিত্র আখ্যান, উপাখ্যান ও পুরাকাহিনী, নীতিমূলক কথা ইত্যাদিও এই গ্রন্থে রহিয়াছে। নলদময়ন্তী ও সাবিত্রী সত্যবান প্রভৃতি আখ্যানের আদিম সাহিত্যিক রূপটি পাওয়া যায় মহাভারতে।

বিষয়বস্তু

'মহাভারতে'র বর্ত্তমান রূপ অষ্টাদশ পর্বে রচিত ; মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এইজন্যই ইহাকে বলা হয় শতসাহস্রী সংহিতা। ইহা ছাড়া 'হরিবংশ' নামে ইহার একটি খিল বা পরিশিষ্ট আছে। উহার শ্লোকসংখ্যা ১৬,৩৭৪।

শতসাহস্রী সংহিতা

এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তু লইয়া রচিত বলিয়া এই বিপুল এপিককে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন 'a whole literature', অর্থাৎ, একটি সমগ্র সাহিত্য। বস্তুতঃ, এই একটি এপিকে সমগ্র প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিত্রটি প্রতিফলিত হইয়াছে।

সমগ্র সাহিত্য

ভগবদ্গীতা

ইহা 'মহাভারতে'র ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে রচিত। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭৫০। যুদ্ধে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি লইয়া ইহার রচনা। এই 'গীতা' ভারতবর্ষে বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল এবং অদ্যাবধি ইহা ভারতীয়গণের প্রত্যহ পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যদেশে ইহা অনুবাদের মাধ্যমে বা স্বীয়রূপে শতাধিক বৎসর ধরিয়া তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে, 'গীতা'তে জীবনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও নানা সমস্যা সংগ্রামের মধ্যে মানুষকে শান্তি ও মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। জ্ঞানী, কর্মী এবং ভক্ত এই ত্রিবিধ লোকই ইহাতে মুক্তির সন্ধান পাইয়া থাকে। প্রায় সমস্তপ্রকার ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের সমর্থনই গীতায় পাওয়া যায়। এই দুইটি কারণেই 'গীতা' যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। এরূপ গ্রন্থ ভারতে আর নাই। ভারতে কেন, পণ্ডিত হামবোল্ডের (Humboldt) মতে, 'গীতা' "perhaps the only truly philosophical poem which we can find in all the literatures known to us"; অর্থাৎ, যত সাহিত্য আমাদের জানা আছে, তাহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ইহাই একমাত্র দার্শনিক কাব্য।

আকার ও বিষয়বস্তু

ইহার জনপ্রিয়তা ও তাহার কারণ

Humboldt কর্তৃক প্রশংসা

'গীতা' সম্ভবতঃ আদিমরূপে আমাদের নিকট পৌছে নাই। ইহা মনে করার কতগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, 'গীতা'তে অনেকগুলি বিরোধী ব্যাপার দেখা যায়। একই মোক্ষলাভের তিনটি পথ; যথা, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা একটি অসামঞ্জস্যকর ব্যাপার। কিন্তু, কাহারও কাহারও মতে সংসারে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিপ্রবণ এই তিন প্রকার লোক আছে বলিয়া এই তিনটি পথে কোন বিরোধ নাই।

গীতায় আদিম রূপের অভাব

তৎসম্বন্ধে যুক্তি
(১) বিরোধ

কোন কোন স্থানে বেদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি দেখা যায় (২।৪২ আদি শ্লোকে), আবার স্থানবিশেষে যজ্ঞের প্রশংসা রহিয়াছে (৩।১০); ইহার সঙ্গে আসক্তিহীন কর্মের প্রংশসার সামঞ্জস্য করা কঠিন। একই 'যোগ' শব্দটির অর্থ একবার বলা হইয়াছে 'সমত্ব' (২।৪৮), আবার বলা হইয়াছে 'কর্মসু কৌশলম্' (২।৫০) কখনও সাংখ্যদর্শনের মত ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে, কখনও বা বেদান্তদর্শনের মত অবলম্বন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনা (১১শ অধ্যায়) পুরাণলক্ষণাক্রান্ত এবং অন্যান্য অধ্যায় হইতে স্বতন্ত্র। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, পরবর্তীকালে 'গীতা'র অতিশয় জনপ্রিয়তাবশতঃ ইহাতে অনেক অংশ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(২) রচনাশৈলীর তারতম্য

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট 'গীতা'কে 'মহাভারতের' অংশ বলিয়া জানিতেন। খৃঃ অষ্টম নবম শতাব্দীতে 'গীতা' শঙ্করাচার্যের দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণ হইতে মনে হয়, সম্ভবতঃ খৃষ্টোত্তর যুগের পূর্ব-ভাগেই গীতা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল।

'গীতার' রচনাকাল—খৃষ্টোত্তর যুগের পূর্বভাগ

মহাভারতে গীতার পরিপূরক স্বরূপ 'অনুগীতা' নামক একটি অংশ আছে। অপর একটি দার্শনিক অংশের নাম 'সনৎসুজাতীয়'। নারায়ণের প্রতি ভক্তি অবলম্বনে রচিত 'মহাভারতের' অংশবিশেষের নাম 'নারায়ণীয়'।

অনুগীতা, সনৎসুজাতীয় ও নারায়ণীয়

মহাভারতের রচয়িতা ও রচনার ইতিহাস

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ধারণা এই যে 'মহাভারত' ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই 'মহাভারত'কে একজনের বা এক কালের রচনা মনে করেন না। ইহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, রচনাশৈলী ও ভাষার বিভিন্নরূপ, বর্ণিত ঘটনা-বলীর পরস্পরবিরোধ এবং কৃষ্ণের দেবত্বে পরিণতি প্রভৃতি হইতে মনে হয়,

ভিন্টারনিৎস—মহাভারত এককালের বা একব্যক্তির রচনা নয়

ইহা একজনের বা এককালের রচনা হইতে পারেনা। এই মতটি প্রকাশ করিতে যাইয়া ভিণ্টারনিৎস্ বলিয়াছেন, যদি আমাদের বিশ্বাস করিতে হয় যে, 'মহাভারত' এক ব্যক্তির রচিত তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তিটি "was at one and the same time, a great poet and wretched scribbler, a sage and an idiot, a talented artist and a ridiculous pedant", অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ছিলেন একাধারে মহাকবি ও অতি নগণ্য লেখক, মহাজ্ঞানী ও মহামূর্খ এবং প্রতিভাবান্ শিল্পী ও হাস্যাস্পদ পণ্ডিতম্মন্য লোক।

যুক্তি

এই বিশাল গ্রন্থটি যে এককালের রচনা নয়, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়। 'মহাভারতের' শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিত আছে— ইদং **শতসহস্রং** তু লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্ (১.১.১০১); অন্য একটি স্থানে আছে—**চতুর্বিংশতিসাহস্রীং** চক্রে ভারতসংহিতাম্ (১.১.১০২)। অপর এক স্থানে লিখিত আছে—**অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি** চ (১.২.১৩১)। এই সকল উক্তি হইতে ইহাই মনে হয় যে, এই সুবিশাল গ্রন্থ তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে; আদিগ্রন্থে শ্লোকসংখ্যা ছিল ৮,৮০০, পরবর্তীকালে ইহা হইল ২৪,০০০। সর্বশেষে ইহাতে ১০০,০০০ শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইল। সুতরাং, বিভিন্নকালে বিভিন্ন ব্যক্তিকর্তৃক রচিত অংশসমূহের সমাবেশই এই 'মহাভারত', এই সিদ্ধান্তই বর্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাভারত রচনার তিন স্তর
(১) ৮,৮০০ শ্লোক
(২) ২৪,০০০ "
(৩) ১০০,০০০ "

মহাভারতের রচনাকাল

'মহাভারতে'র কাহিনী কোন সুদূর অতীত হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা নির্ণয় করার কোন উপায় নাই। কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত এবং কুরু পঞ্চাল প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 'শংখায়ন শ্রৌতসূত্রে' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে' ভারত ও

'মহাভারতে'র প্রাচীনত্ব
(১) ব্রাহ্মণ
(২) শ্রৌতসূত্র
(৩) গৃহ্যসূত্র
(৪) অষ্টাধ্যায়ী
(৫) মহাভাষ্য
(৬) জাতক

মহাভারতের কথা আছে। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে যুধিষ্ঠির, ভীম, বিদুর ও মহাভারত প্রভৃতি শব্দগুলি আছে। 'মহাভাষ্যে' পতঞ্জলি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে 'মহাভারতে'র অনেক বীরের উল্লেখ এবং মুখ্য ঘটনাগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে 'মহাভারতে'র একটি সাহিত্যিক রূপ প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সাহিত্যিক রূপ

এখন প্রশ্ন এই, কখন ইহা বর্ত্তমানরূপ ধারণ করিয়াছিল? পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত হোল্‌জ্‌ম্যান (Holtzmann) মনে করেন, সেই সময় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতকের কাছাকাছি। কিন্তু, এই মত যে সমর্থনযোগ্য নয়, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে কুমারিলভট্ট এমন কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন যেগুলি বর্ত্তমান 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ভূমিদানসংপর্কিত লেখমালাতে বর্ত্তমান 'মহাভারতে'র ত্রয়োদশ পর্বের অংশবিশেষ উদ্ধৃত আছে।

বর্তমান রূপের রচনাকাল

Holtzmann —খৃঃ ১৫শ বা ১৬শ শতকের নিকটবর্ত্তী কাল

উক্তমতের বিরুদ্ধে যুক্তি

ভিণ্টারনিৎস্ এর মতে, 'মহাভারতে'র সর্বশেষ রূপটির উদ্ভব খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পরে হয় নাই। ইহার উৎপত্তির উর্দ্ধসীমা সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী; কারণ, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ ইহাতে আছে। 'রামায়ণে'র কাল-নির্ণয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঐ গ্রন্থ হইতেও ইহা প্রাচীনতর। বর্ত্তমান 'মহাভারতে'র রচনাকাল নির্ণয় করার প্রধান অন্তরায় এই যে, ইহাতে পূর্বকালীন ও উত্তরকালীন রচনা রহিয়াছে। তবে, ইহার সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন অংশটিও সম্ভবতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগে রচিত; কারণ, শিশুনাগ বংশের যে দুইটি বিখ্যাত রাজাকে, (অর্থাৎ বিম্বিসার ও

ভিণ্টারনিৎস্—সর্বশেষ রূপ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে

যুক্তি

অজাতশত্রু) লইয়া ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের অরুণোদয়, সেই দুইটি রাজার কোন উল্লেখ 'মহাভারতে' নাই।

মহাভারতের প্রভাব

এই সুবিশাল গ্রন্থ যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষে যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাহিত্যে ইহার প্রভাব দেখা যায় মহাকবিগণের রচনায়। ভাসের 'উরুভঙ্গ' কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' ও শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' প্রভৃতি নাট্য-ও কাব্য-গ্রন্থ ইহারই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। ভাররবাসীর জীবনেও ইহার প্রভাব অপরিসীম। শিশুকাল হইতেই 'মহাভারতে'র আদর্শপূর্ণ কাহিনীগুলি এই দেশবাসীর চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। এখনও শত শত গৃহে ইহার অংশবিশেষ নিত্যপঠিত হয়। হিন্দুর শ্রাদ্ধে ইহার কতক অংশ অবশ্য পাঠ্য। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"[১]—এই উক্তিই ইহার প্রতি অসীম শ্রদ্ধার পরিচায়ক। ইহাকে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে কার্ষ্ণবেদ ও পঞ্চমবেদ। এই গ্রন্থের যে অংশ 'গীতা' বা 'ভগবদ্গীতা' নামে খ্যাত, তাহা হিন্দুদের বাইবেল স্বরূপ।

সংস্কৃত সাহিত্যে

জীবনে

'মহাভারতে'র কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন নব্যভারতীয় ভাষায় বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বাংলাভাষায় রচিত এই জাতীয় গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে কাশীরামদাসের 'মহাভারত'ই সুবিখ্যাত ও ব্যাপকভাবে পঠিত।

প্রাদেশিক সাহিত্যে

---

১ তুলনীয়—যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ (আদিপর্ব—৬২।২৬)

তের

পুরাণ

'পুরাণ' শব্দের অর্থ

ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, বৌদ্ধগ্রন্থ, অথর্ববেদ

'পুরাণ' শব্দটি অতি প্রাচীন। ইহার আদিম অর্থ 'আখ্যান' অর্থাৎ পুরাকাহিনী। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে এই শব্দটি সাধারণতঃ 'ইতিহাস' অর্থে প্রচলিত; কিন্তু, 'ইতিহাস' বা 'ইতিহাসপুরাণ' বলিতে বিশেষ কোন গ্রন্থকে বুঝাইতনা। অথর্ববেদে প্রযুক্ত 'পুরাণ' শব্দটি সম্ভবতঃ গ্রন্থবিশেষকে বুঝাইত।

পুরাণের বিষয়বস্তু

কোন কোন পুরাণে, পুরাণের বিষয়বস্তু নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে :—

পঞ্চলক্ষণ

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ (বিষ্ণুপুরাণ—৩।৬।২৪)

ইহার অর্থ এই যে, পুরাণগুলি সৃষ্টি, (প্রলয়ের পর) নূতন সৃষ্টি, দেবতা ও ঋষিগণের বংশাবলী, মন্বন্তর ও রাজবংশাবলী—এই পাঁচটি বিষয় লইয়া রচিত।

এই পাঁচটি লক্ষণ পুরাণের বিষয়বস্তুর আংশিক পরিচয়মাত্র। কোন কোন পুরাণে এই পাঁচটির অনেক অধিক বিষয়ও আছে। আবার কোন কোন গ্রন্থ সংপূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় লইয়া রচিত। দর্শন, অলঙ্কার, ছন্দ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়েরই আলোচনা কোন কোন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'অগ্নিপুরাণে' আলোচিত অলঙ্কারশাস্ত্র এই শাস্ত্রের ইতিহাসে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

পুরাণের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থগুলিতে সংপ্রদায়বিশেষের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাধারণতঃ দেবতাবিশেষের প্রাধান্য অনুসারে অষ্টাদশ মহাপুরাণগুলিকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে লিখিত পুরাণ সাত্ত্বিক, শিবের উদ্দেশ্যে তামসিক ও ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে রচিত পুরাণসমূহ রাজসিক। পুরাণগুলিকে (১) বৈষ্ণব (২) শৈব ও (৩) ব্রাহ্ম এইরূপ তিনটি শ্রেণীতেও বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

পুরাণে সাংপ্রদায়িক প্রভাব

মহাপুরাণ ও উপপুরাণ—ইহাদের সংখ্যা ও নামকরণ

পুরাণ সাহিত্যে দুইপ্রকার গ্রন্থ আছে; যথা—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণগুলি প্রায়শঃই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর; ইহাদের প্রাধান্যও অধিকতর বলিয়া পরিগণিত। এই দুই জাতীয় গ্রন্থে মূলতঃ বিশেষ প্রভেদ নাই। তবে উপপুরাণগুলি প্রায়ই সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মাচরণের সহায়ক হিসাবে রচিত বলিয়া মনে হয়। উপপুরাণগুলির মধ্যে কোন কোনটি বিশেষ কোন মহাপুরাণের পরিশিষ্ট হিসাবে রচিত বলিয়া কথিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থও আছে।

মহাপুরাণের সংখ্যা সাধারণতঃ অষ্টাদশ বলিয়া কথিত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, পুরাণের সংখ্যা চার। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, আদিতে মাত্র একটি পুরাণ ছিল, এবং পরবর্তীকালে উহা হইতেই অপর পুরাণগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। ভিণ্টারনিৎস এই মত সমর্থন করেন না।

মহাপুরাণগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ—আঠার, চার ও এক

কোন কোন প্রসঙ্গে উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে মহাপুরাণগুলির উল্লেখে যেমন তাহাদের নামের ঐক্য রহিয়াছে উপপুরাণগুলির বিভিন্ন তালিকায় তাহাদের নামের তেমন ঐক্য দেখা যায় না।

উপপুরাণ আঠারটি—বিভিন্ন তালিকায় নামকরণের অনৈক্য

মহাপুরাণগুলির নাম নিম্নলিখিতরূপ ঃ—১। ব্রহ্ম ২। পদ্ম ৩। বিষ্ণু ৪। শিব ৫। ভাগবত ৬। নারদ ৭। মার্কেণ্ডেয় ৮। ভবিষ্য বা ভবিষ্যৎ ৯। অগ্নি ১০। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। ১১। লিঙ্গ ১২। বরাহ ১৩। স্কন্দ ১৪। বামন ১৫। কূর্ম ১৬। মৎস্য ১৭। গরুড় ১৮। ব্রহ্মাণ্ড।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম

কোন কোন পুরাণে এই তালিকা দেওয়া আছে। কোন কোন তালিকায় শিবপুরাণের পরিবর্ত্তে বায়ুপুরাণের নাম পাওয়া যায়।

রঘুনন্দনের মতে, উপপুরাণগুলির নাম নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

১। সনৎকুমার ২। নরসিংহ ৩। বায়ু ৪। শিবধর্ম ৫। আশ্চর্য ৬। নারদ ৭। নন্দিকেশ্বর ৮। উশনস্ ৯। কপিল ১০। বরুণ ১১। শাম্ব ১২। কালিকা ১৩। মহেশ্বর ১৪। কল্কি ১৫। দেবী ১৬। পরাশর ১৭। মরীচি ১৮। ভাস্কর বা সূর্য।

অষ্টাদশ উপপুরাণ

চণ্ডী

মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বা সপ্তশতী চণ্ডী নামে সুপরিচিত। সাতশ' মন্ত্রে ইহাতে আদ্যাশক্তির দৈত্যদানব বধ প্রভৃতি মহিমাকীর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহা হিন্দুগণের অনেক ধর্ম্মকার্য্যে পঠিত হইয়া থাকে এবং বহু ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ইহা নিত্যপাঠ্য। ইহার রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বে।

দেবীমাহাত্ম্য বা সপ্তশতী

খৃঃ ষষ্ঠ শতকের পূর্বে রচিত

ভাগবত

ইহাকে ভারতবর্ষে সশ্রদ্ধভাবে বলা হয় শ্রীমদ্‌ভাগবত। ইহা দ্বাদশটি স্কন্ধে রচিত; শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮,০০০। গ্রন্থটির প্রধান বিষয়বস্তু কৃষ্ণের জীবনী, লীলাকীর্ত্তন, বিষ্ণুর অবতারসমূহের বর্ণনা ও কলিযুগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি। ইহা, বিশেষতঃ ইহার দশম স্কন্ধটি, ভারতবর্ষে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অতিশয় প্রিয়। বৈষ্ণবগণই ভাগবতকে সর্বাধিক শ্রদ্ধা করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহাকে নিত্যপাঠ্য মনে করেন।

আকার ও বিষয়বস্তু

জনপ্রিয়তা

ভাষায়, রচনা-কৌশলে ও ছন্দে ইহা পুরাণসমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য।

রচনাকৌশল, রচয়িতা ও রচনাকাল

বিষয়বস্তুতে বিষ্ণুপুরাণের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কেহ কেহ ইহাকে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব কর্তৃক রচিত বলিয়া মনে করেন। ভিণ্টারনিৎসের মতে, খৃষ্টীয় দশম শতকে ইহা সম্ভবতঃ রচিত হইয়াছিল।

পুরাণের রচনাকাল

পুরাণগুলির মূলভিত্তি বেদে। বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের অনেক কাহিনী পুরাণে আছে। পুরাণজাতীয় গ্রন্থের রচনা বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত। 'মহাভারতে'র অনেক অংশ এবং সংপূর্ণ 'হরিবংশ' পুরাণের আকারে রচিত। 'রামায়ণের' শেষভাগও পুরাণাকারের রচনা। কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্মসূত্র গ্রন্থে পুরাণ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গৌতম-

খৃঃ পূর্ব চতুর্থ পঞ্চম শতকের পূর্বে

ধর্মসূত্র' (১১।১৯) এবং 'আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রের' (২।২৬।৬) নাম করা যায়। এই ধর্মসূত্র গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক পঞ্চম কি চতুর্থ শতক। সুতরাং ইহাদের মধ্যে যে পুরাণের উল্লেখ আছে, তাহা ঐ সময়ের পূর্বে রচিত। অন্যান্য

খৃঃ ৭ম শতকের পূর্বে

পুরাণগুলি সপ্তম শতকের পূর্বে রচিত। কারণ ইহাদের মধ্যে যে সমস্ত রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ রাজগণের কোন উল্লেখ নাই।

খৃঃ ১ম শতকের নিকটবর্তী কাল

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থগুলির সহিত কোন কোন পুরাণের এত সাদৃশ্য যে, মনে হয়, ঐ পুরাণগুলি ঐ সময়ের নিকটবর্ত্তীকালেরই রচনা।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে

পুরাণের অর্বাচীনত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত

পুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণের অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে পুরাণ সাহিত্যের সহিত বাণভট্টের পরিচয়ের প্রমাণ আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বিখ্যাত মীমাংসক

কুমারিল পুরাণগুলিকে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় নবম শতকে শঙ্করাচার্য পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, সমস্ত পুরাণই বিগত সহস্র বৎসরের রচনা, একথা বলা চলে না।

বিরুদ্ধযুক্তি

পূর্বে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, যে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের উপর পুরাণ-গুলি প্রতিষ্ঠিত সেই ধর্মদ্বয়ের উৎপত্তি অতিশয় অর্বাচীন। কিন্তু, আধুনিক গবেষণাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন কোন শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে, এমন কি সম্ভবতঃ বুদ্ধপূর্ব্ব যুগেই। বর্ত্তমান কালের গবেষণায় ইহা বিশিষ্ট প্রমাণ-মূলে স্বীকৃত হইয়াছে যে এক একটি পুরাণের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নকালে রচিত হইয়াছিল।

ঐতিহ্য—পুরাণসমূহের রচয়িতা ব্যাসদেব

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বেদসংকলয়িতা ও মহাভারতপ্রণেতা ব্যাসদেবই পুরাণ সমূহের রচয়িতা ; সুতরাং পুরাণগুলির রচনাকাল অতি প্রাচীন।

পুরাণের মূল্য

পুরাণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অবিসংবাদিত। কতগুলি রাজবংশ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা বিশেষ মূল্যবান। ঐ যুগের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে পুরাণগুলিকেই প্রধান উপজীব্য ধরিয়া নিতে হয়। পুরাণে বর্ণিত রাজবংশ-গুলির মধ্যে শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য, শুঙ্গ, অন্ধ্র ও গুপ্ত সমধিক উল্লেখযোগ্য। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইহাদের মধ্যে অতিরঞ্জন, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অবান্তর বিষয়সমূহ হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য পৃথক্ করিয়া নেওয়া কষ্টসাধ্য।

ঐতিহাসিক মূল্য

রাজনৈতিক ইতিহাস

ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস, বিশেষতঃ ধর্মের ইতিহাস, আলোচনা করিতে হইলে পুরাণের সাক্ষ্য অপরিহার্য। পুরাণগুলির মূল্য সম্বন্ধে ভিণ্টারনিৎস লিখিয়াছেন :—

সামাজিক ইতিহাস

"They afford us far greater insight into all aspects and phases of Hinduism—its mythology, its idol-worship, its

theism and pantheism, its love of God, its philosophy and its superstitions, its festivāls and ceremonies an its ethics than any other works."

ভৌগোলিক তথ্য

ইহাদের মধ্যে তাৎকালিক ভৌগোলিক তথ্যও অনেক আছে।

সাহিত্যিক মূল্য

সাহিত্য হিসাবে পুরাণগুলি খুব উচুদরের নয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'অগ্নিপুরাণে' অলঙ্কারশাস্ত্রের যে কথা আছে তাহা ঐ শাস্ত্রের ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য্য।

পুরাণের প্রভাব

জনপ্রিয়তার প্রমাণ ও কারণ

এককালে পুরাণের প্রভাব যে ব্যাপক ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কথিত আছে, "ইতিহাসপুরাণাভ্যাংবেদং সমুপবৃংহয়েৎ"। জনপ্রিয় না হইলে এতগুলি বিশাল গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত না এবং সমগ্র ভারতময় পুরাণের অসংখ্য পুঁথি থাকিত না। পুরাণগুলি জনগণের প্রিয় হওয়ার কারণও ছিল। সমাজে সকলের বেদপাঠ বা বৈদিক ধর্মচর্যার অধিকার ছিলনা; কিন্তু স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতির পুরাণপাঠে, পুরাণ শ্রবণে এবং পৌরাণিক ধর্ম আচরণে অধিকার ছিল। পুরাণ-বর্ণিত ব্রতাদির অনুষ্ঠান সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল।

সাহিত্যিক প্রভাব

পৌরাণিক আখ্যানগুলি এত উপভোগ্য হইয়াছিল যে, কোন কোন আখ্যান অবলম্বনে প্রকৃষ্ট কাব্যনাটকাদি রচিত হইয়াছিল। পদ্ম-পুরাণে বর্ণিত শকুন্তলা-উপখ্যানের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ধর্মজীবনে প্রভাব

ধর্মজীবনে পুরাণগুলি যুগে যুগে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সংপ্রদায়গুলির মুখ্য গ্রন্থই পুরাণ; পৌরাণিক ধর্মই তাহাদের ধর্মজীবনের মূল বস্তু। পূর্বে বর্ণিত 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'র অন্তর্গত 'চণ্ডী' নামে অভিহিত দেবী-মাহাত্ম্যটি কতকাল ধরিয়া যে হিন্দুদের একটি ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায়না।

ক্লাসিক্যাল যুগ
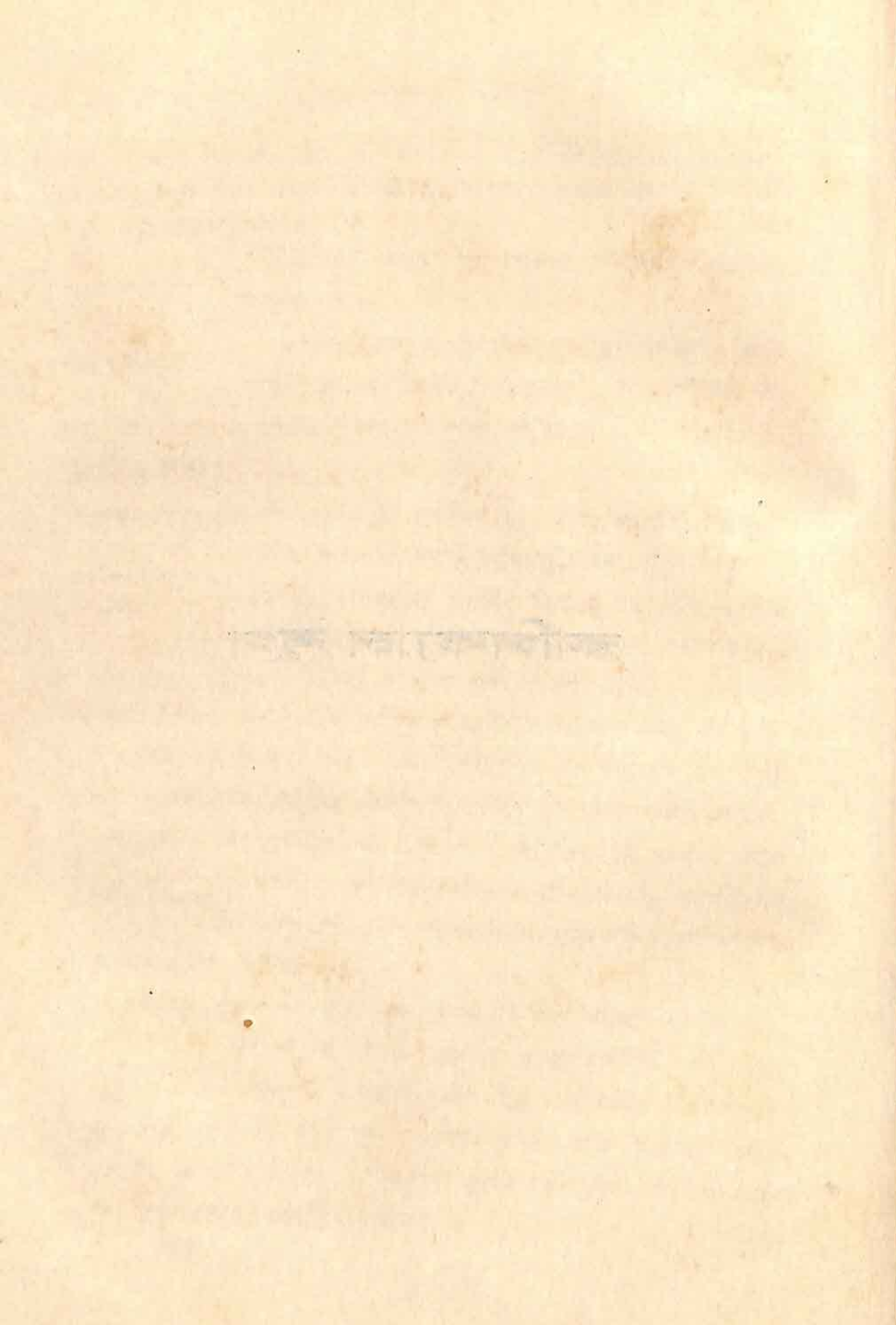
চৌদ্দ

সংস্কৃত কাব্য

সংস্কৃতে 'কাব্য' শব্দের অর্থ

সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের বুঝা দরকার, 'কাব্য' শব্দটির অর্থ কি। বাংলায় আমরা 'কাব্য' বলিতে কবিতা বুঝি এবং কবিতা-রচয়িতাকে কবি বলিয়া থাকি, অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ রচনাকে 'কাব্য' নামে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃতে কিন্তু 'কাব্য' শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'; অর্থাৎ, যে বাক্যে রস আছে তাহাই কাব্য। ইহাতে এমন কথা বলা হয় নাই যে, শুধু ছন্দোবদ্ধ বাক্যকেই 'কাব্য' আখ্যা দেওয়া হয়।

কাব্য রসাত্মক বাক্য

সংস্কৃত কাব্যের প্রকারভেদ

আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্যের মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতরূপ :—

শ্রব্য ও দৃশ্য ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ
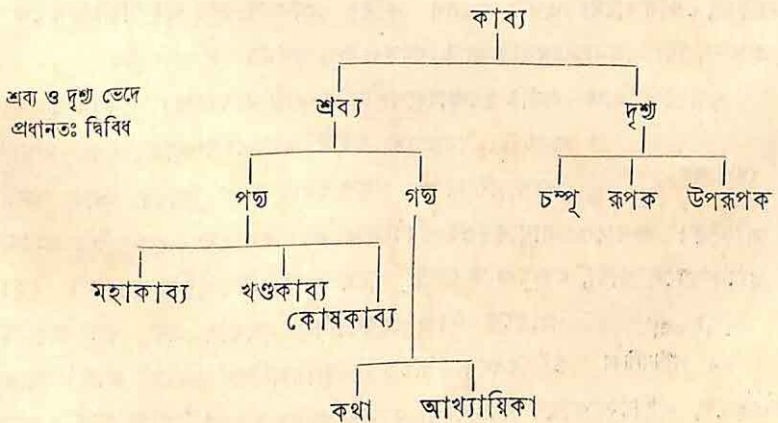
যাহা শ্রবণ করিবার যোগ্য, তাহাই শ্রব্য। ছন্দে রচিত শ্রব্যকাব্যকে বলা হয় পদ্যকাব্য। ইহার তিনটি উপবিভাগ; মহাকাব্য খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য। মহাকাব্যের নায়ক বহুগুণসম্পন্ন ও সদ্বংশজাত, প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত এবং বর্ণনীয় বিষয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি। ইহাতে সর্গসংখ্যা অন্যূন আটটি এবং ইহা নানা ছন্দে রচিত। কালিদাসের 'রঘুবংশ', ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়', শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত', মাঘের 'শিশুপালবধ' প্রভৃতি মহাকাব্য। মহাকাব্যের 'একদেশানুসারি' কাব্যের নাম খণ্ডকাব্য; অর্থাৎ, খণ্ডকাব্যে মহাকাব্যের লক্ষণ আংশিকভাবে বিদ্যমান। কালিদাসের 'মেঘদূত' একটি খণ্ডকাব্য। পরস্পর নিরপেক্ষ এবং ব্রজ্যাক্রমে রচিত শ্লোকসমূহের নাম কোষকাব্য (anthology) বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলী', শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি-(বা, সূক্তি-) কর্ণামৃত', জহ্লণের 'সুভাষিতমুক্তাবলী' এবং রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী' প্রভৃতি কোষকাব্য। এই জাতীয় গ্রন্থে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগকে 'ব্রজ্যা' নামে এক একটি ভাগে সাজান হয়। ইহাদের মধ্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য উপভোগ্য। তাহা ছাড়া, কোষকাব্যে এমন অনেক কবির শ্লোক পাওয়া যায় যাঁহাদের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায়না, এমনকি নাম পর্যন্তও লুপ্ত প্রায়।

শ্রব্যকাব্য
(ক) পদ্য
১। মহাকাব্য
২। খণ্ডকাব্য
৩। কোষকাব্য

বৃত্তগন্ধোজ্ঝিত অর্থাৎ ছন্দোলেশহীন রচনার নাম গদ্য। ইহার সূক্ষ্মভাগ ছাড়িয়া দিলে স্থূল দুইটি ভাগ দেখা যায়; যথা—কথা ও আখ্যায়িকা। গদ্যকাব্যের এই দ্বিবিধ ভাগ অতি প্রাচীন। কথাতে সাধারণতঃ বিষয়বস্তু হয় সরস এবং গদ্যে রচিত হইলেও স্থানে স্থানে আর্যা, বক্ত্র ও অপবক্ত্র নামে ছন্দে রচিত শ্লোক থাকে। ইহার প্রারম্ভে পদ্যে দেবতাদির নমস্কার এবং খল প্রভৃতির চরিত্রবর্ণনা থাকে। আখ্যায়িকা কথারই ন্যায়; প্রভেদ এই যে, ইহাতে কবির বংশবর্ণনা ও অন্য কবির বৃত্তান্ত, শ্লোক প্রভৃতি থাকে

(খ) গদ্য
১। কথা
২। আখ্যায়িকা

এবং অধ্যায়গুলির নাম হয় 'আশ্বাস' 'আশ্বাস' এর প্রারম্ভে অন্যবিষয়ের বর্ণনাচ্ছলে আর্যা, বক্ত্র বা অপবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোকের দ্বারা ভাবী বিষয়ের সূচনা করা হয়। অমরসিংহ বলিয়াছেন, 'আখ্যায়িকা উপলব্ধার্থা' এবং "প্রবন্ধকল্পনা কথা'; অর্থাৎ, আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক এবং কথার প্রতিপাদ্য বিষয় কাল্পনিক। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' এবং বাণের 'কাদম্বরী' কথাকাব্য; বাণের 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকা। কথা ও আখ্যায়িকার পরস্পর ভেদ যে প্রাচীন কালেই তেমন মানিয়া লওয়া হইত না, তাহার প্রধান সাক্ষী দণ্ডী। তিনি 'কাব্যাদর্শে' বলিয়াছেন, "কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ, সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা', অর্থাৎ কিনা একই জাতীয় রচনার এই দ্বিবিধ নাম।

(গ) চম্পূ

গদ্য ও পদ্যমিশ্রিত কাব্যকে বলা হয় 'চম্পূ'। ত্রিবিক্রমভট্টের 'নলচম্পূ', সোমদেবের 'যশস্তিলক' প্রভৃতি এই জাতীয় কাব্য।

দৃশ্যকাব্য

(ক) রূপক—দশ

(খ) উপরূপক —অষ্টাদশ

যাহা দর্শন করিবার যোগ্য তাহাকে বলা হয় 'দৃশ্য'। দৃশ্য কাব্য বলিতে নাট্যসাহিত্যকে বুঝায়। আমাদের একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলায় নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি শুধু তাহাই দৃশ্যকাব্য নয়। এক কথায় বলা যায়, সব নাটকই দৃশ্যকাব্য, কিন্তু সমস্ত দৃশ্যকাব্যই নাটক নয়। দৃশ্যকাব্যের প্রধান দুইটি ভাগ 'রূপক' ও 'উপরূপক'। নাটক, প্রকরণাদিভেদে রূপক দশটি এবং নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি ভেদে উপরূপক অষ্টাদশটি।

পনর

কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আদিকাব্য ও আদিকবি

বাল্মীকির শ্লোক

ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিষাদবিদ্ধ দেখিয়া বাল্মীকির শোক যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্লোকে উৎসারিত হইয়াছিল, সেই শ্লোকটিকেই [১] সাধারণতঃ আদি-শ্লোক বলিয়া গণ্য করা হয়। সেজন্যই বাল্মীকি কবিগুরু এবং রামায়ণ আদিকাব্য। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগ সম্বন্ধে এই ধারণা কতক পরিমাণে সত্য হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে বাগ্‌দেবী কাব্যরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন সুদূর অতীতে আর্যগণের আগমনের সমকালে।

বৈদিক যুগ হইতে কাব্যের ক্রমবিবর্ত্তন

ঋগ্বেদে কাব্য

আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্‌বেদ। ঋগ্বেদে কোন কোন সূক্ত ভাবে ও ভাষায় যথার্থ কাব্যরসপূর্ণ। পুরূরবা ও উর্বশীর আখ্যান এবং অপর সংবাদসূক্তগুলি ও উষাদেবীর বর্ণনা[২] প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় কাব্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

উপনিষদে কাব্য

উপনিষদেরও স্থানে স্থানে কাব্যলক্ষণাক্রান্ত শ্লোক দেখা যায়।

১। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ বালকাণ্ড—২।১৫
এই ঘটনাটিকে কালিদাস অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নলিখিতরূপে :—
নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ (রঘু—১৪।৭০)

২। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতে পারে :—
এষা প্রতীচী দুহিতা দিবো নৄন্
যোষেব ভদ্রাণি রিণীতে অপ্‌স্বঃ।
ব্যূর্ণ্বতী দাশুষে বার্যাণি
পুনর্জ্যোতির্যুবতিঃ পূর্বথাকঃ॥ (ঋগ্বেদ—৫।৮০।৬)

এপিকযুগে কাহিনীর মনোজ্ঞতা সৃষ্টি করিল কবি-প্রতিভা। রামায়ণে, বিশেষতঃ সুন্দরকাণ্ডে, উৎকৃষ্ট কাব্যের অভাব নাই। মহাভারতেরও স্থানে স্থানে নানারসপ্রধান কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

এপিকে কাব্য

ক্লাসিক্যাল যুগে কাব্যের পরিবেশ ও স্বরূপ

বৈদিক ও এপিক যুগে কাব্য যেন কবিমানস হইতে স্বতউৎসারিত হইয়াছিল।

ক্লাসিক্যাল যুগে কাব্যের চর্চা এবং পরিপুষ্টি সাধিত হইল রাজার পৃষ্ঠ-পোষকতায়। রাজসভার পরিবেশে এই যুগের কাব্যের উৎপত্তি বলিয়া রাজাদের কাহিনীই অধিকাংশ কাব্যের উপজীব্য। রাজার অনুপ্রেরণাতেই এই যুগে কাব্যের উদ্ভব হইল বটে, কিন্তু কাব্যপাঠক বা কাব্যরসিক যাঁহারা সমাজে ছিলেন, তাঁহাদের রুচির দ্বারা কাব্যের রূপটি নিশ্চয়ই অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' গ্রন্থে তদানীন্তন সমাজের যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাহাতে নাগরকের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি স্বভাবতঃই তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। নদী বা রম্য দীর্ঘিকার সন্নিহিত উদ্যানবেষ্টিত গৃহে নাগরক বাস করেন। তাঁহার বাসগৃহ নানা বিলাসোপকরণে সুসজ্জিত। বাদ্যযন্ত্র, গ্রন্থ ও অক্ষক্রীড়ার আয়োজন পার্শ্বে রহিয়াছে। প্রাতে স্নানান্তে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও অন্যান্য বিলাসোপকরণে সজ্জিত নাগরক ক্রীড়াকৌতুকে কাল অতিবাহিত করেন। দ্বিপ্রহরে নিদ্রান্তে তিনি পুনরায় বেশভূষা করিয়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করেন। সন্ধ্যাবেলায় সঙ্গীতসুখ ভোগ করেন। নাগরকের এইরূপ ছিল দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। নানাগুণযুক্তা বারাঙ্গনাগণের স্থানও এই সমাজে লক্ষণীয়। ইহাদের গৃহে নাগরক আমোদপ্রমোদ করিতেন। সুতরাং দেখা যায়, তদানীন্তন সমাজে কামশাস্ত্রের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই জন্যই সম্ভবতঃ এই যুগের কাব্যে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য এত বেশী।

রাজসভা

নাগরক

একদিকে যেমন নাগরক ছিলেন, অপরদিকে তেমনই রসিক বা সহৃদয় ব্যক্তিও ছিলেন। এই শেষোক্ত কাব্যপাঠক নানারূপ উচ্চাঙ্গের সমালোচনাদ্বারা কাব্যের গুণাগুণ বিচার করিতেন। স্থতরাং, অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া কবিকে কাব্যরচনা করিতে হইত। পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া অনেক সময় কবির রচনা হইয়াছে কৃত্রিম; এই সমস্ত রচনাতে কবির স্বাভাবিক মনোভাব ব্যক্ত হয় নাই, তিনি কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা খ্যাতিমোহে পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় দিয়াছেন, কবিত্বের নহে।

সহৃদয় ব্যক্তি

পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভারতবর্ষের সাহিত্যে কাব্য রচিত হইয়াছিল স্থপ্রাচীন যুগে ঋগ্বেদে। তৎপর, নানা অবস্থার মধ্য দিয়া কাব্য-ধারা প্রবাহিত হইয়া ক্লাসিক্যাল যুগে, বিশেষতঃ গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুপ্তরাজত্ব—কাব্যের চরম উন্নতি

ম্যাক্স্‌মূলারের Renaissance theory

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মূলার মনে করিতেন যে, অনবরত গ্রীক্, শক ও কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিকগণের আক্রমণের ফলে খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতক পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং গুপ্তরাজগণের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই সাহিত্য পুনর্জীবিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার সাময়িক লোপ ও পুনরভ্যুত্থান

উক্তমতের বিরুদ্ধে যুক্তি

ম্যাক্স্‌মূলারের এই Renaissance theory (রেনেসাঁ মতবাদ) সেই যুগে খুবই সমাদর লাভ করে। কিন্তু, পরবর্তীকালের গবেষণার ফলে দেখা যায়, ঐ পণ্ডিতের মত সমর্থনযোগ্য নয়। রুদ্রদামনের গীর্ণার প্রশস্তি (Girnar inscription) প্রায় ১৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত। ইহাতে কাব্য-কলার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর অপর একটি প্রশস্তি যদিও প্রাকৃতে রচিত, তথাপি ইহাতে প্রচুর পরিমাণে কাব্যলক্ষণ বিদ্যমান। ইহা সিরি পুলুমায়ির নাসিক প্রশস্তি।

গীর্ণার প্রশস্তি

নাসিক প্রশস্তি

প্রশস্তির সাক্ষ্য ছাড়িয়া দিলেও, সাহিত্যে এমন নিদর্শন আছে যাহা হইতে ম্যাক্স্‌মুলারের মতের ভ্রান্তি-নিরসন হইতে পারে। 'কাব্যালঙ্কার'-এর টীকায় নমিসাধু পাণিনির 'পাতাল-বিজয়' নামক মহাকাব্য হইতে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাণিনির 'জাম্ববতী-বিজয়' নামক কাব্য হইতে রায়মুকুট 'অমরকোষ' এর টীকায় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন কোষ-কাব্যেও পাণিনির নামে শ্লোক দেখা যায়।[১] খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া পাণিনিকে সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে একটি 'বাররুচকাব্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কাব্যলক্ষণাক্রান্ত বহু শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কবি পাণিনি

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সাক্ষ্য—বাররুচকাব্য ও শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি

'সৌন্দরানন্দ' ও 'বুদ্ধচরিত' অশ্বঘোষের দুইটি উৎকৃষ্ট কাব্য। অশ্বঘোষের কাল খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি কোন সময়ে বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। ইহা দ্বারাও ম্যাক্স্‌মুলারের মতের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইতে পারে।

অশ্বঘোষ

ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে প্রাকৃতযুগ

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে একটি প্রাকৃত যুগ ছিল এবং পরবর্তীকালে ইহার আদর্শেই সংস্কৃত কাব্য গড়িয়া উঠে। এই মতের সমর্থনে অখণ্ডনীয় কোন যুক্তি বা অবিসংবাদিত কোন প্রমাণ নাই।

প্রমাণের অভাব

১ 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সুভাষিতাবলী' দ্রষ্টব্য।

ষোল

বৃহৎকথা

মূল বৃহৎকথার স্বরূপ, রচয়িতা ও রচনার ইতিহাস

প্রসিদ্ধি এই যে, ইহা ভূতভাষা বা পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাকৃত গ্রন্থের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে; পরবর্ত্তীকালের কাব্যের উপর ইহা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার জন্য ইহার আলোচনা এস্থলে আবশ্যক। গুণাঢ্য নামে জনৈক ব্যক্তি ইহার রচয়িতা বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে যে, গুণাঢ্য এবং কাতন্ত্রব্যাকরণ-প্রণেতা সর্ববর্মা উভয়েই রাজা সাতবাহনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে রাজাকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করিবার বিষয় লইয়া তাঁহাদের উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ইহাতে পরাস্ত হইয়া গুণাঢ্য সংস্কৃত ভাষার চর্চা পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে বাস করিতে থাকেন। সেখানে তিনি পৈশাচী ভাষা আয়ত্ত করিয়া ঐ ভাষায় সাত লক্ষ শ্লোকে বিশাল গ্রন্থ 'বৃহৎকথা' রচনা করেন। পরবর্ত্তীকালে 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত তিনটি গ্রন্থই ছন্দোবদ্ধ। কিন্তু দণ্ডীর সাক্ষ্য হইতে মনে হয় মূল 'বৃহৎ-কথা', 'কথা' শ্রেণীর গদ্যকাব্য।

বৃহৎকথার রচয়িতা ও স্বরূপ

গুণাঢ্য

রচনাকাল—পরবর্ত্তী রূপ

মূল প্রাকৃত গ্রন্থটি লুপ্ত। বাণভট্ট ও সুবন্ধুর গ্রন্থে 'বৃহৎকথার' যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে মনে হয়, ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পরে হইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন, মূল 'বৃহৎ কথা' খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের রচনা। মূল বৃহৎকথার বিষয়বস্তু বা তাহার আদিম আকার জানিবারকোন উপায় নাই। বর্ত্তমানে ইহা অবলম্বনে রচিত কাশ্মীরী ও নেপালী—এই দুইটি রূপ পাওয়া যায়। কাশ্মীরী রূপের দুইটি গ্রন্থ আছে,

কাশ্মীরী ও নেপালী রূপ

যথা, ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' (১০৩৭ খৃষ্টাব্দ) ও সোমদেবের 'কথা-সরিৎ-সাগর' (১০৬৩—৮১ খৃষ্টাব্দ)। বুধস্বামীর 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহে' (খৃষ্টীয় অষ্টম ও দশম শতকের মধ্যবর্ত্তীকালে রচিত) নেপালীরূপটি পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, 'বৃহৎকথার' এই তিনটি বর্ত্তমানরূপই ছন্দোবদ্ধ পদে রচিত। এই তিনটি রূপের মধ্যে, 'কথা-সরিৎ-সাগর' সর্বাপেক্ষা অধিকতর বিখ্যাত। কিন্তু Keith বলেন যে, 'বৃহৎ-কথা-শ্লোক-সংগ্রহ' সর্বাপেক্ষা অধিক মূলানুগ।

উত্তরকালের সাহিত্যে প্রভাব

'বৃহৎকথা' পরবর্ত্তীকালের বহু শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল। সোমদেবের 'যশস্তিলকচম্পূ' ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী' এবং দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে বৃহৎকথার প্রভাব বিদ্যমান। 'মেঘদূতে' কালিদাস 'উদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধ' গণের উল্লেখ করিয়াছেন। 'স্বপ্নবাসবদত্তা' ও 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' নামক ভাসের নাটক দুইটির উপজীব্য এই কাহিনী। এই সকল প্রমাণ হইতে উদয়নের কাহিনীর প্রসার ও খ্যাতি অনুমেয়। প্রাচীনকাল হইতেই এই সকল কাহিনী প্রচলিত ছিল ; গুণাঢ্যের কবিপ্রতিভার জন্যই ইহারা সম্ভবতঃ অধিকতর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামক নাট্যগ্রন্থদ্বয়ও এই কাহিনী আশ্রয় করিয়াই রচিত।

পদ্যে, গদ্যে, নাট্য-সাহিত্যে

সতর

পদ্যকাব্য

পদ্যের স্বরূপ ও পদ্য রচনার ইতিহাস

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্"—ছন্দে রচিত পদের নামই পদ্য। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ভাবের বাহনস্বরূপে পদ্যই প্রাচীনতম। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদের সূক্তগুলি পদ্যময়। সংহিতাযুগের অন্যান্য গ্রন্থেও গদ্য অপেক্ষা পদ্যেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কর্মকাণ্ডের প্রসারের যুগে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে গদ্য স্বপ্রভাব বিস্তার করিল বটে; কিন্তু উপনিষদে পুনরায় পদ্যের প্রভাব পরিস্ফুট। বেদাঙ্গের যুগে দেখা যায় অনেক বেদাঙ্গ পদ্যে রচিত। এপিক যুগে পদ্যই বীরত্বের কাহিনীর একমাত্র বাহন। পুরাণগুলিতেও পদ্যেরই প্রাধান্য। ক্লাসিক্যাল যুগে পদ্য ও গদ্য উভয়প্রকার কাব্যই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পদ্যকাব্যই অধিকতর সমাদৃত এবং প্রসিদ্ধ।

ছন্দোবদ্ধ পদ

ঋগ্বেদ

উপনিষদ

বেদাঙ্গ

এপিক, পুরাণ

ক্লাসিক্যাল যুগ

ক্লাসিক্যাল যুগের পদ্যকাব্যের শ্রেণী-বিভাগ ও উৎপত্তিকাল

ক্লাসিক্যাল যুগের পদ্যকাব্যের শ্রেণীবিভাগ আমরা চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখিয়াছি। এই যুগের কাব্য প্রথম কখন রচিত হইল, তাহা অনির্ণেয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, পাণিনি ও পতঞ্জলির সাক্ষ্য হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তাঁহাদের কালেও বহু কাব্যগ্রন্থ সুবিদিত ছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বঘোষের আবির্ভাব পর্যন্ত সমস্ত কাব্যগ্রন্থই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই যুগের পদ্যকাব্যের ক্রমবিবর্তন ও যুগ-বিভাগ

ক্লাসিক্যাল যুগের কাব্য বলিতে প্রথমেই কালিদাসের কথা মনে পড়ে। ইহার কারণ, এই যুগে কালিদাস এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার

যশঃপ্রভা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাব্যগুলিকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যগগনে প্রদীপ্ত কালিদাস-সূর্যের উদয়ে অপরাপর কবিতারকা দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়িল। তথাপি কাব্যের ইতিহাসে যে উষাকাল ও অরুণোদয় ছিল এবং কাব্যের ভাস্বর জ্যোতি যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অস্তমিত হইয়াছিল, এ স্বাভাবিক নিয়মটির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সর্বসম্মতিক্রমে কালিদাসই এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া আমরা তাঁহাকেই কবিগোষ্ঠীর মধ্যমাণস্বরূপ রাখিয়া কাব্যের নিম্নলিখিতরূপ যুগবিভাগ করিতে পারি :—

কালিদাসপূর্ব যুগ
কালিদাস
কালিদাসোত্তর যুগ

কালিদাস-পূর্ব যুগ

এই যুগের একমাত্র কবি অশ্বঘোষ। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ তিনটি—
১। বুদ্ধচরিত ২। সৌন্দরনন্দ ৩। গণ্ডীস্তোত্রগাথা।

১। বুদ্ধচরিত

'বুদ্ধচরিত' বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। বৈদেশিক পরিব্রাজক ইৎসিং (I-tsing) এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহা অষ্টাবিংশতি সর্গে রচিত হইয়াছিল। চীনা ও তিব্বতী ভাষায় যে অনুবাদ রহিয়াছে, তাহাতেও সর্গসংখ্যা অনুরূপ। কিন্তু অধুনাপ্রাপ্ত সংস্কৃতকাব্যে মাত্র সপ্তদশটি সর্গ আছে। ইহাদের মধ্যে শেষ চারিটি অশ্বঘোষের রচিত কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অষ্টাবিংশতি সর্গে রচিত মূল বুদ্ধচরিতের প্রারম্ভ গৌতমের জন্ম লইয়া এবং শেষ অশোকের রাজত্ব বর্ণনায়।

২। সৌন্দরানন্দ

'সৌন্দরানন্দ' অষ্টাদশ সর্গে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের অনিচ্ছাসত্ত্বে বুদ্ধদেব কর্তৃক স্বীয় ধর্মে তাঁহার দীক্ষা।

৩। গণ্ডীস্তোত্রগাথা

গণ্ডীস্তোত্রগাথা একটি গীতিকবিতা। উনত্রিশটি শ্লোকে ইহাতে গণ্ডীর[১] প্রশংসা করা হইয়াছে।

১। বৌদ্ধগণের বিহারে রক্ষিত কাঁসর বিশেষ (gong).

অশ্বঘোষের রচনা পরবর্তী যুগের কবিগণের রচনা অপেক্ষা প্রাঞ্জল। তাঁহার গ্রন্থগুলির ভাষা ও ভাবের স্বচ্ছন্দগতি হৃদয়গ্রাহী। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, বিশেষতঃ প্রেমের চিত্র অঙ্কনে এবং পার্থিব জীবনের প্রতি নির্বেদের বর্ণনায়, অশ্বঘোষ পারদর্শী। নন্দের প্রতি তৎপত্নী সুন্দরীর অনুরাগ এবং নন্দ কর্তৃক তাঁহার পরিত্যাগ পাঠকের চিত্ত বিগলিত করে। বুদ্ধচরিতে জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির যে প্রাণস্পর্শী চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে কবির বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জরা সম্বন্ধে সারথি গৌতমকে বলিতেছেন :—

অশ্বঘোষের কাব্যসমূহের সাহিত্যিক বিচার

রূপস্য হর্ত্রী ব্যসনং বলস্য
শোকস্য যোনির্নিধনং রতীনাম্।
নাশঃ স্মৃতীনাং রিপুরিন্দ্রিয়াণা
মেষা জরা নাম যয়ৈষভগ্নঃ ॥ (৩।৩০)

[এই ব্যক্তি যাহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহার নাম জরা; ইহা রূপ, বল, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়শক্তি নষ্ট করে এবং শোক উৎপাদন করে।]

এই সমস্ত করুণ দৃশ্য দর্শনে তরুণ রাজকুমারের মনে যে নির্বেদের উদয় হইয়াছিল, তাহা কবি অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

চীনদেশীয় পরম্পরাগত ধারণা এই যে, অশ্বঘোষ কনিষ্কের সমসাময়িক। সুতরাং, ইনি খৃঃ প্রথম শতাব্দীর লোক ছিলেন। অশ্বঘোষ নিজে খুব সম্ভবতঃ হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন।

অশ্বঘোষের কাল ও পরিচয়

পদ্যকাব্যের ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে অশ্বঘোষের গ্রন্থের পরেই বৌদ্ধগণের অবদান-সাহিত্যের উল্লেখ করিতে হয়। অবদান-গ্রন্থগুলিতে গাথা ও অন্যপ্রকারের কাব্যধর্মী শ্লোক বিদ্যমান।

অবদান-সাহিত্য

অধুনালুপ্ত মূল 'পঞ্চতন্ত্র' সম্ভবতঃ এই যুগের সৃষ্টি। ইহা প্রধানতঃ গদ্য রচনা হইলেও ইহাতে যে স্থানে স্থানে পদ্য সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহা 'পঞ্চতন্ত্রের' বর্ত্তমান রূপগুলি হইতে প্রতীয়মান হয়। অবদানগ্রন্থের পদ্যগুলির ন্যায় 'পঞ্চতন্ত্রের' পদ্যগুলিও উৎকৃষ্ট কাব্যের

পঞ্চতন্ত্র

নিদর্শন নহে; তথাপি পদ্যকাব্যের ইতিহাস হইতে এইগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

কালিদাস

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে, সর্বসম্মতিক্রমে কালিদাসকে ভারতীয় পদ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মনে করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কবি নিজের সম্বন্ধে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ভিন্ন আমরা বর্ত্তমানে কিছুই জানিনা। লোকপরম্পরায় প্রসিদ্ধ গল্প এই যে, তিনি কবিত্বলাভের পূর্বে অতিশয় জড়বুদ্ধি ছিলেন। ঘটনাক্রমে, এক সুশিক্ষিতা রাজকুমারীর সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু, অল্পকাল পরেই কালিদাসের অজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার পত্নী তাঁহাকে গৃহে স্থান দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। অভিমানী কালিদাস মনোদুঃখে বনে গিয়া কঠোর তপস্যাদ্বারা কালীদেবীর বরপ্রাপ্ত হইয়া কবিত্বলাভ করেন। একদিন রাত্রিবেলা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি নিজের উপস্থিতির কথা পত্নীকে জানাইলেন এবং বলিলেন—অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্ বিশেষঃ; অর্থাৎ, বিশেষ কিছু কথা আছে। মূর্খ স্বামীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা শুনিয়া রাজকুমারী সর্ত করিলেন যে, কালিদাস যদি উক্ত বাক্যের প্রতিটি শব্দ দিয়া আরম্ভ করিয়া এক একটি পৃথক্ কাব্য রচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলে তিনি স্বামীকে গৃহে প্রবেশাধিকার দিবেন। কালিদাস স্বীকৃত হইলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 'অস্তি' শব্দে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের আরম্ভ, যথা—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, ইত্যাদি। 'কশ্চিৎ' শব্দ 'মেঘদূতের' আদিতে প্রযুক্ত হইয়াছে—কশ্চিৎকান্তা-বিরহগুরুণা স্বাধিকারাৎ প্রমত্তঃ ইত্যাদি। "বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতি-পত্তয়ে"—'রঘুবংশ' কাব্যের ইহাই প্রথম শ্লোকের আদ্য চরণ; সুতরাং 'বাক্' পদ দিয়া ইহার আরম্ভ। 'বিশেষ' পদে আরব্ধ কোন কাব্য নাই। এই কিম্বদন্তীতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মনে করেন যে, এইরূপ কোন কাব্যও ছিল, কিন্তু উহা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অপর একটি কিংবদন্তী অনুসারে,

জীবনী

কালিদাস সিংহলরাজ কুমারদাসের বন্ধু ছিলেন এবং তিনি সিংহলেই এক বারবণিতার গৃহে নিহত হইয়াছিলেন।

কালিদাসের জন্মস্থান লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এই সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

কালিদাসের কাল

কালিদাসের কালও এখন পর্যন্ত নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই।

ভাসের উল্লেখ

কবি 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নামক নাটকের প্রস্তাবনায় নাট্যকারগণের নামোল্লেখ করিতে গিয়া ভাসের নাম করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি ভাসের পরবর্তী। কিন্তু ভাসের কালই এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে স্থির করিতে পারা যায় নাই; সুতরাং ইহা হইতে কালিদাসের সময় নির্ণয় করা যায় না।

আইহোল প্রশস্তি

আইহোল প্রশস্তিতে (Aihole Inscription) নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে :—

যেনাযোজিনবেশ্ম স্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ॥

এই প্রশস্তি ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে রচিত। ইহাতে কালিদাসের উল্লেখ থাকায় এইটুকু বুঝা গেল যে, তিনি ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বের লোক, কিন্তু কত পূর্বের তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই।

কালিদাসের কাল সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মতগুলি নিম্নলিখিতরূপ :—

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন

(১) বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ভারতবর্ষে সুবিদিত। এই সম্বন্ধে 'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামক জ্যোতিষগ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি আছে :—

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি
বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, কালিদাস 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি-ধারী গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন। এই রাজার রাজত্বকাল ৩৮০—৪১৫ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং, ইহাই কালিদাসের কাল। এই মতের সমর্থনে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কালিদাসের কাব্যে যে জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা সহজ, স্বচ্ছন্দগতি ও উচ্চ সংস্কৃতির পরিচায়ক। এতাদৃশ অবস্থাও গুপ্তরাজগণের সুশাসনেই সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু, প্রাচীন ভারতের একাধিক রাজার 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি থাকা হেতু এবং নবরত্ন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকায় এই মত নির্বিচারে গ্রাহ্য নয়।

'বিক্রমাদিত্য' উপাধি-ধারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল—৩৮০—৪১৫ খৃষ্টাব্দ

(২) বিক্রমাদিত্যের নামের সহিত কালিদাসের নাম লোকপরম্পরায় যুক্ত থাকায়, কাহারও কাহারও মতে কবি সেই বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক যিনি খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে বিক্রমসংবৎ প্রবর্ত্তন করেন।

খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দ —বিক্রমসংবৎ

(৩) এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাপ্ত পদকে (Bhita Medallion) যে চিত্রটি অঙ্কিত আছে, তাহার সঙ্গে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পদকটি শুঙ্গবংশের রাজত্বকালের, অর্থাৎ খৃঃপূঃ ১৮৫—৭৩ অব্দের মধ্যে কোন সময়ের। সুতরাং, কালিদাস নিশ্চয়ই ইহার পূর্বেকার কবি।

ভিটা পদক

(৪) 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের ভরতবাক্য[১] হইতে কেহ কেহ মনে করেন, কবি রাজা অগ্নিমিত্রের সমসাময়িক। এই রাজার রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী।

রাজা অগ্নিমিত্রের সমকালীন

---

১ ত্বংমে প্রসাদসুমুখী ভব দেবী নিত্য
মেতাবদেব মৃগয়ে প্রতিপক্ষহেতোঃ।
আশাস্তমভ্যধিগমাৎ প্রভৃতি প্রজানাং
সংপদ্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে॥

(৫) রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুকর্তৃক হূণবিজয় স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক হূণগণের পরাজয়েরই প্রতিচ্ছবিমাত্র। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল ৪৫৫—৪৮০ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং, কালিদাস ইহার পরবর্ত্তীকালের কবি।

৪৮০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী

কালিদাসকে গুপ্ত আমলের মনে করার আরো কতক যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, 'কুমারসম্ভব' গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের জন্মবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত।

কালিদাসের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ তিনটি—(১) রঘুবংশ (২) কুমারসম্ভব (৪) মেঘদূত।

কালিদাসের কাব্যগ্রন্থ

'রঘুবংশ' উনবিংশতি সর্গে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। ইক্ষাকু বংশের রাজা দিলীপ রূপবান্ ও গুণবান্; কিন্তু নিঃসন্তান বলিয়া রাজার বড় দুঃখ। বশিষ্ঠের উপদেশে তাঁহার আশ্রমের দেবতাস্বরূপা গাভী নন্দিনীর পরিচর্যা করিয়া তিনি পুত্রলাভের বর সেই গাভীর নিকট হইতে পাইলেন। দিলীপের পুত্র জন্মিলে তাঁহার নাম রাখা হইল রঘু। কিছুকাল পরে, দিলীপের ঈপ্সিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত হয়। ফলে ঐ অশ্বের রক্ষক রঘুর সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় এবং রঘু পরাস্ত হন। কালক্রমে রঘু রাজা হইয়া দিগ্‌বিজয় করেন ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। রঘুর পুত্র অজ যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, বিদর্ভরাজ ভোজের অনুরোধে রঘু অজকে ভোজের ভগ্নী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় যোগ দিবার জন্য আদেশ দেন। ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া অজ যথাকালে সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তাঁহার পুত্র দশরথ। দশরথের পুত্র রাম। রামের সীতা-পরিণয়, বনগমন, রাবণবধ, তৎপর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও সীতার বনবাস, সীতার পুত্রপ্রাপ্তি; সীতার পাতালপ্রবেশ, রামের পরলোকগমন, কুশের রাজ্যভারগ্রহণ, কুশের পর তৎপুত্র অতিথির রাজত্ব, অতিথির পর ক্রমে একবিংশতি রাজার রাজত্ব, একবিংশতিতম রাজা সুদর্শনের বনগমনের পর তৎপুত্র অগ্নিবর্ণের রাজত্ব, অগ্নিবর্ণের ব্যসনপরায়ণতা ও মৃত্যু, তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা পত্নীর রাজ্যশাসন—এই সমস্ত ঘটনা একাদশ হইতে শেষ পর্যন্ত সর্গগুলির বর্ণনীয় বিষয়।

(১) রঘুবংশ

'কুমারসম্ভব' সপ্তদশ সর্গে রচিত হইলেও, পণ্ডিতগণের মতে

(২) কুমারসম্ভব

ইহার নবম হইতে অবশিষ্ট সর্গগুলি কালিদাসের রচনা নয়।

নগাধিরাজ হিমালয়ের চমৎকার বর্ণনা দ্বারা এই কাব্যের প্রারম্ভ। দেবদেব শিব ধ্যানমগ্ন। নগেন্দ্রনন্দিনী উমা শিবের পরিচর্যারতা। এদিকে তারকাসুরের উৎপীড়নে দেবকুল আকুল। তাঁহারা স্থির করিলেন, একমাত্র উপায় শিবের সহিত উমার পরিণয় ঘটান। এই দম্পতীর যে পুত্র হইবেন তিনিই ভবিষ্যতে দেবগণের ত্রাতা। কিন্তু, মহাযোগী শিবের বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মান যায় কি করিয়া? দেবগণের অনুরোধে কামদেব এই দুঃসাধ্য কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ হইল, কিন্তু তাঁহার রোষানলে মদন ভস্মীভূত হইলেন। বিলাপরতা রতি দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা, কিন্তু দৈববাণী কর্তৃক পতির সহিত পুনর্মিলনে আশ্বস্তা মদন-পত্নী বিরতা হইলেন। কামদেবের এই পরিণতি দেখিয়া উমা রূপলাবণ্যে শিবকে মুগ্ধ করিবার প্রয়াস ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। যোগীন্দ্রেরও মন টলিল, কিন্তু উমার ভক্তিকে একবার পরীক্ষা না করিয়া তিনি উমাকে গ্রহণ করিলেন না। শিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণা উমার পাণিগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের পুত্রপ্রাপ্তি হইল; এই পুত্রই কার্ত্তিকেয় এবং ইনিই দেবারি তারকাসুরের নিধনকর্ত্তা।

(৩) মেঘদূত

'মেঘদূত' দুইভাগে রচিত—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ।

প্রভুর অভিশাপে এক বৎসরের জন্য যক্ষ প্রিয়াবিরহিত। রামগিরির আশ্রমে নির্বাসিত যক্ষ সুদূর অলকাপুরীবাসিনী প্রিয়ার বিরহে কাতর। বর্ষাগমে মেঘদর্শনে আকুলতর যক্ষ কামোন্মাদবশতঃ অচেতন মেঘকেই প্রিয়ার নিকট দূত স্বরূপে প্রেরণ করিতে উদ্যত। তাই তিনি মেঘকে সম্বোধন করিয়া অলকায় যাইবার পথঘাট বলিয়া দিতেছেন। এখানেই পূর্বমেঘের সমাপ্তি।

সুরম্য অলকাপুরীর ও যক্ষগৃহের বিচিত্র বর্ণনা, যক্ষপ্রিয়ার রূপলাবণ্যের কথা এবং যক্ষপ্রেরিত করুণ বার্ত্তা উত্তরমেঘের বিষয়বস্তু।

(৫) রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুকর্তৃক হূণবিজয় স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক হূণগণের পরাজয়েরই প্রতিচ্ছবিমাত্র। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল ৪৫৫—৪৮০ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং, কালিদাস ইহার পরবর্ত্তীকালের কবি। কালিদাসকে গুপ্ত আমলের মনে করার আরো কতক যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, 'কুমারসম্ভব' গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের জন্মবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত।

৪৮০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী

কালিদাসের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ তিনটি—(১) রঘুবংশ (২) কুমারসম্ভব (৪) মেঘদূত।

কালিদাসের কাব্যগ্রন্থ

'রঘুবংশ' ঊনবিংশতি সর্গে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দিলীপ রূপবান্ ও গুণবান্; কিন্তু নিঃসন্তান বলিয়া রাজার বড় দুঃখ। বশিষ্ঠের উপদেশে তাঁহার আশ্রমের দেবতাস্বরূপা গাভী নন্দিনীর পরিচর্যা করিয়া তিনি পুত্রলাভের বর সেই গাভীর নিকট হইতে পাইলেন। দিলীপের পুত্র জন্মিলে তাঁহার নাম রাখা হইল রঘু। কিছুকাল পরে, দিলীপের ঈপ্সিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত হয়। ফলে ঐ অশ্বের রক্ষক রঘুর সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় এবং রঘু পরাস্ত হন। কালক্রমে রঘু রাজা হইয়া দিগ্‌বিজয় করেন ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। রঘুর পুত্র অজ যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, বিদর্ভরাজ ভোজের অনুরোধে রঘু অজকে ভোজের ভগ্নী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় যোগ দিবার জন্য আদেশ দেন। ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া অজ যথাকালে সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তাঁহার পুত্র দশরথ। দশরথের পুত্র রাম। রামের সীতা-পরিণয়, বনগমন, রাবণবধ, তৎপর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও সীতার বনবাস, সীতার পুত্রপ্রাপ্তি; সীতার পাতালপ্রবেশ, রামের পরলোকগমন, কুশের রাজ্যভারগ্রহণ, কুশের পর তৎপুত্র অতিথির রাজত্ব, অতিথির পর ক্রমে একবিংশতি রাজার রাজত্ব, একবিংশতিতম রাজা সুদর্শনের বনগমনের পর তৎপুত্র অগ্নিবর্ণের রাজত্ব, অগ্নিবর্ণের ব্যসনপরায়ণতা ও মৃত্যু, তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা পত্নীর রাজ্যশাসন—এই সমস্ত ঘটনা একাদশ হইতে শেষ পর্যন্ত সর্গগুলির বর্ণনীয় বিষয়।

(১) রঘুবংশ

কুমারসম্ভব' সপ্তদশ সর্গে রচিত হইলেও, পণ্ডিতগণের মতে

(২) কুমারসম্ভব

ইহার নবম হইতে অবশিষ্ট সর্গগুলি কালিদাসের রচনা নয়।

নগাধিরাজ হিমালয়ের চমৎকার বর্ণনা দ্বারা এই কাব্যের প্রারম্ভ। দেবদেব শিব ধ্যানমগ্ন। নগেন্দ্রনন্দিনী উমা শিবের পরিচর্যারতা। এদিকে তারকাসুরের উৎপীড়নে দেবকুল আকুল। তাঁহারা স্থির করিলেন, একমাত্র উপায় শিবের সহিত উমার পরিণয় ঘটান। এই দম্পতীর যে পুত্র হইবেন তিনিই ভবিষ্যতে দেবগণের ত্রাতা। কিন্তু, মহাযোগী শিবের বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মান যায় কি করিয়া? দেবগণের অনুরোধে কামদেব এই দুঃসাধ্য কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ হইল, কিন্তু তাঁহার রোষানলে মদন ভস্মীভূত হইলেন। বিলাপরতা রতি দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা, কিন্তু দৈববাণী কর্তৃক পতির সহিত পুনর্মিলনে আশ্বস্তা মদন-পত্নী বিরতা হইলেন। কামদেবের এই পরিণতি দেখিয়া উমা রূপলাবণ্যে শিবকে মুগ্ধ করিবার প্রয়াস ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। যোগীন্দ্রেরও মন টলিল, কিন্তু উমার ভক্তিকে একবার পরীক্ষা না করিয়া তিনি উমাকে গ্রহণ করিলেন না। শিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণা উমার পাণিগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের পুত্রপ্রাপ্তি হইল; এই পুত্রই কার্ত্তিকেয় এবং ইনিই দেবারি তারকাসুরের নিধনকর্ত্তা।

(৩) মেঘদূত

'মেঘদূত' দুইভাগে রচিত—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ।

প্রভুর অভিশাপে এক বৎসরের জন্য যক্ষ প্রিয়াবিরহিত। রামগিরির আশ্রমে নির্বাসিত যক্ষ সুদূর অলকাপুরীবাসিনী প্রিয়ার বিরহে কাতর। বর্ষাগমে মেঘদর্শনে আকুলতর যক্ষ কামোন্মাদবশতঃ অচেতন মেঘকেই প্রিয়ার নিকট দূত স্বরূপে প্রেরণ করিতে উদ্যত। তাই তিনি মেঘকে সম্বোধন করিয়া অলকায় যাইবার পথঘাট বলিয়া দিতেছেন। এখানেই পূর্বমেঘের সমাপ্তি।

সুরম্য অলকাপুরীর ও যক্ষগৃহের বিচিত্র বর্ণনা, যক্ষপ্রিয়ার রূপলাবণ্যের কথা এবং যক্ষপ্রেরিত করুণ বার্ত্তা উত্তরমেঘের বিষয়বস্তু।

উক্ত কাব্যগ্রন্থ তিনটি ব্যতীত আরো প্রায় কুড়িটি [১] ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ কালিদাসের নামের সঙ্গে যুক্ত আছে। কালিদাস ইহাদের রচয়িত্য কিনা, সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণ সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। এই সন্দিগ্ধ রচনাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি সুবিদিত :—

সন্দিগ্ধরচনাবলী

(১) নলোদয় (২) রাক্ষস-কাব্য
(৩) ঋতুসংহার (৪) পুষ্পবাণবিলাস
(৫) শৃঙ্গারতিলক (৭) শৃঙ্গাররসাষ্টক

সাহিত্যিক বিচার

দেশীয় এবং বৈদেশিক সমালোচকগণের মতে, কালিদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। দেশীয় সমালোচকগণ তাঁহার কবি-প্রতিভার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার দুই একটি নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে :—

দেশীয় মত

পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতকালিদাসা।
অদ্যাপি তত্তুল্যকবেরভাবাদনামিকা সার্থবতী বভূব ॥

"প্রাচীন কালে কবিগণের গণনা প্রসঙ্গে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে কালিদাসের নাম রক্ষিত হইয়াছিল। আজ পর্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ কবি না হওয়ায় অনামিকা অঙ্গুলির নামটি সার্থক হইয়াছে।"

বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্

"বৈদর্ভী কবিতা নিজে কালিদাসকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।"

বৈদেশিক মত

জার্মানদেশের সুপণ্ডিত ও কাব্যরসিক হামবোল্ড (Humboldt) কালিদাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশংসোক্তি করিয়াছিলেন—

"Kālidāsa...............is a masterly describer of the influence which Nature exercises upon the minds of lovers. Tenderness in the expression of feelings and richness of creative fancy have assigned to him his lofty place among the poets of all nations"

১ দ্রষ্টব্য—*History of Sanskrit Literature*—S. K. De

আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক, কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি।

কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

তাঁহার যে কয়খানি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি, তাহার কোনটিতেই বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তিনি বিশেষ কোন মৌলিকতার পরিচয় দেন নাই। প্রচলিত পুরাকাহিনীই তাঁহার 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব'এর উপজীব্য। এক 'মেঘদূত' কাব্যের বিষয়টি অনেক পরিমাণে কবিকল্পিত, যদিও সম্ভবতঃ "কামবিলাপ জাতক" বা 'রামায়ণ'এ বর্ণিত অপহৃতা সীতার শোকে রামের আকুলতা কবির কল্পনার সহায়ক হইয়াছিল।

মহাকাব্য দুইটির বিষয়বস্তুর নির্বাচনের কারণ সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুশাসন এবং তদানীন্তন কালের সাহিত্যরসপিপাসুব্যক্তিগণের রুচি, কবির কল্পনাদৈন্য নহে। প্রসিদ্ধ কাহিনীই মহাকাব্যের উপজীব্য—এই অনুশাসনের নিয়ন্ত্রণ কালিদাসের পক্ষে সে যুগে লঙ্ঘন করা সম্ভবপর হয় নাই। তবে এবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, পুরাকাহিনীর জীর্ণকঙ্কালের উপর যে রূপটি আমরা পাইতেছি তাহা এই মহাকবির প্রতিভার নিকট ঋণী। 'রঘুবংশে' কবির প্রাকৃতিক বর্ণনাশক্তির অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ সর্গে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের বর্ণনা তাহার একটি নিদর্শন। শাদা ও নীল জলের মিশ্রণকে কালিদাস তুলিত করিয়াছেন নীলপদ্মখচিত শ্বেতপদ্মের সঙ্গে, কৃষ্ণসর্পভূষিত শিবের ভস্মাবৃত দেহের সঙ্গে, একত্রগ্রথিত ইন্দ্রনীলমণি ও মুক্তার মালার সঙ্গে। 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সর্গে গিরিরাজ হিমালয়ের যে রূপটি কবিলেখনী হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই মনোরম। কালিদাসের প্রেমের চিত্রগুলি বড় করুণ। 'রঘুবংশের' চতুর্দশ সর্গে সীতার বিরহে রামের অবস্থা মর্মস্পর্শী। গৃহ হইতে নির্বাসিতা সীতাকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও মন হইতে দূর করিতে পারেন নাই। বিরহবিধুর রামের প্রেমিকচিত্তকে কবি বর্ণনা করিয়াছেন,—'অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তম্ বৈদেহীবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে''—তপ্ত লৌহে যেন হাতুড়ির আঘাত পড়িল। 'মেঘদূতে' প্রিয়াবিরহে যক্ষের কি উদ্বেগ, মিলনের জন্য কি উৎকণ্ঠা! সহৃদয় কবির চিত্ত তির্যক্ জাতির উপরেও প্রেমের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছে। 'কুমারসম্ভবে' কবি বলিয়াছেন—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥ (৩।৩৬)

"প্রিয়ার অনুগমন করিয়া ভ্রমর তাহার সহিত একই কুসুম পাত্রে মধুপান করিল; কৃষ্ণসার শৃঙ্গদ্বারা স্পর্শনিমীলিতনেত্রা মৃগীর গাত্রকণ্ডূয়ন করিল।"

কালিদাসের ভাষা মধুর, কান্ত এবং কোমল। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্লোকগুলি যেন কবির প্রয়াসপ্রসূত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত্ত। পরবর্ত্তী যুগে কোন কোন কবির রচনায় যেমন পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের একটা সচেতন প্রয়াস দেখা যায়, কালিদাসের রচনায় তাহা নাই। অলঙ্কারপ্রয়োগে কবির নিপুণতা যথেষ্ট; বিশেষতঃ উপমালঙ্কারে তিনি অদ্বিতীয়। তাই যুগ যুগ ধরিয়া 'উপমা কালিদাসস্য' এই দুইটি শব্দেই কবিপ্রতিভার প্রশংসা ব্যক্ত হইয়াছে। কালিদাসের কাব্য ছন্দোবৈচিত্র্যে পাঠকের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। 'মেঘদূতে' যক্ষের বিরহক্লিষ্টতা বোধ হয় মন্দাক্রান্তা ভিন্ন অন্য কোন ছন্দে এমন প্রাণস্পর্শী হইত না।

কালিদাসোত্তর যুগ

এই যুগের পদ্যকাব্যগুলিকে মোটামুটী এইরূপে ভাগ করিয়া লওয়া যায়ঃ—

কাব্যের ত্রিধা বিভাগ

(ক) শতক
(খ) মহাকাব্য
(গ) বিবিধ

(ক) **শতক**

অমরুশতক

'অমরুশতক' একখানি বিখ্যাত শতক-কাব্য।

'শতক' শব্দের অর্থ একশত শ্লোকের সমষ্টি। এই ধরণের কাব্যে সাধারণতঃ একশতটি একজনের রচিত পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোক থাকে। তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্লোকসংখ্যা এক শতের কম-বেশীও থাকে। অমরুর শতকের অন্ততঃ চারিটি রূপ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়; ইহাদের শ্লোক সংখ্যা ৯৬ হইতে ১১৫, সবগুলি রূপেই সাধারণ (common) শ্লোক-সংখ্যা ৫১।

এই কাব্য শৃঙ্গাররসপ্রধান শ্লোকের সমষ্টি। প্রেমিক প্রেমিকার বিভিন্ন মানসিক অবস্থার বর্ণনা শ্লোকগুলিতে আছে।

ইহার রচয়িতা অমরুর কাল সম্বন্ধে অনুমানমাত্র সম্ভব। আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম অমরুর উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, অমরু আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ববর্ত্তী। কেহ কেহ তাঁহাকে ভর্ত্তৃহরির পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন; কিন্তু, এই সম্বন্ধে কোন অখণ্ডনীয় যুক্তি নাই।

অমরুর কাল

অমরুর ভাষা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দগতি। ছন্দোবৈচিত্র্য কাব্যখানিকে সরস করিয়া তুলিয়াছে।

ভর্ত্তৃহরি
১। শৃঙ্গারশতক
২। নীতিশতক
৩। বৈরাগ্যশতক

ভর্ত্তৃহরির 'শৃঙ্গারশতক' সুপ্রসিদ্ধ কাব্য। নীতি-শতক' ও বৈরাগ্যশতক' নামে অপর দুইখানি কাব্যও লোকপরম্পরায় ভর্ত্তৃহরি রচিত বলিয়া মনে করা হয়।

'শৃঙ্গারশতক' প্রেম ও তাহার পরিণতি লইয়া রচিত। ইহাতে প্রেমের স্তরপরম্পরা ও প্রেমজনিত সুখের কথা কবি বলিয়াছেন; কিন্তু সমগ্র কাব্যটিতে প্রেমের ব্যর্থতা ও অসারতার সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

'নীতি-ও বৈরাগ্যশতকে' কবি পার্থিব সুখ ও প্রেমের নিন্দা করিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরির কাব্যগুলিতে জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ের গভীর অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়: কিন্তু অমরুর কাব্যের তুলনায় ইহাদের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী নিকৃষ্টতর মনে হয়। 'নীতি'-ও 'বৈরাগ্যশতকে' বাস্তব জীবন সম্বন্ধে পাঠক অনেক উপদেশ লাভ করেন।

এই ভর্ত্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' রচয়িতা ?

এই ভর্ত্তৃহরি ও 'বাক্যপদীয়'-রচয়িতা ভর্ত্তৃহরি অভিন্ন কিনা সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। বৌদ্ধপরিব্রাজক ইৎসিংএর বিবরণ অনুযায়ী বৈয়াকরণ বর্ত্তৃহরি ৬৫১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে পরলোকগমন করেন।

বৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরির কাল

ভক্তিমূলক শতক

(১) বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক'

(২) ময়ূরের 'সূর্যশতক'

উল্লিখিত শতককাব্যগুলি ছাড়াও ভক্তিমূলক শতক এই যুগে রচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' ও ময়ূর কবির 'সূর্যশতক'। এই ধরণের কাব্যগুলিতে উৎকৃষ্ট কাব্যরস নাই; কিন্তু, কাব্যের ভঙ্গীতে দেবদেবীর স্তোত্ররচনায় ইহারা একটা বিশিষ্ট সাহিত্যিক রূপের পরিচয় বহন করিতেছে।

বাণভট্টের জীবনী ও কাল সম্বন্ধে গদ্যকাব্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।[১] প্রসিদ্ধি এই যে, ময়ূর বাণের ন্যায় রাজা হর্ষের সভাপণ্ডিত ও বাণের প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বাণের শ্বশুর বা শ্যালক ছিলেন, এবং 'সূর্যশতক' রচনা করিয়া তিনি কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন।

(খ) মহাকাব্য

ভারবি, ভট্টি, কুমারদাস ও মাঘ এই যুগের মহাকাব্যপ্রণেতা।

ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়'

ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' ভারতীয় সুধীসমাজে সমাদৃত। ইহা অষ্টাদশ সর্গে রচিত।

ইহার আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ :—

যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিযুক্ত চর দুর্যোধন সম্বন্ধে নানা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দ্বৈতবনে উহা জ্ঞাপন করিতে আগত। তেজস্বিনী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে প্রদীপ্ত ভাষায় উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং ভীম তাঁহাকে সমর্থন করিতেছেন। স্থিতধী যুধিষ্ঠির সম্মত হইতেছেন না। ব্যাসদেবের উপদেশে অর্জুন, দুর্যোধনের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কামনায়, ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা করিয়া ইন্দ্রকে তুষ্ট করেন। মুনির ছদ্মবেশে ইন্দ্র অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞায় প্রীতিলাভ করেন এবং শিবের আরাধনা করিতে তাঁহাকে উপদেশ দেন। অর্জুন শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যারত থাকিলে এক বন্যবরাহ তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। এই বরাহ শিব ও অর্জুনের বাণে যুগপৎ বিদ্ধ হইলে

১। অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অর্জুন নিজের শরটি আনিতে অগ্রসর হইলেন এবং এক কিরাত তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, ঐ শর তাহার প্রভুর। ফলে, শিবের অনুচরগণের ও পরে শিব ও স্কন্দের সহিত অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু শিব তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বাঞ্ছিত পাশুপত অস্ত্র দান করিলেন।

সাহিত্যিক বিচার

মহাভারতের বনপর্ব হইতে কবি মূল আখ্যানটি লইয়াছেন। কিন্তু আখ্যানটি ক্ষুণ্ণ না করিয়া তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে অনেক ঘটনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কল্পনা-শক্তি ও ঘটনাবিন্যাসে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বন, শরৎকাল ও হিমালয় প্রভৃতির বাস্তব রূপের বর্ণনায় ভারবি কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। যুদ্ধের বর্ণণাটিও হৃদয়গ্রাহী। অর্থগৌরবের জন্য ভারবির খ্যাতি যুগযুগান্তরব্যাপী। তবে, তাঁহার ভাবের গৌরব উপলব্ধি করিতে হইলে ভাষার কঠোর আবরণ ছিন্ন করিতে পাঠকের বহু শ্রম করিতে হয়। তাই সমালোচক বলিয়াছেন—নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ; অর্থাৎ ভারবির ভাষা নারিকেল ফলের ন্যায়। কাহারও সহিত অপরের তুলনা প্রায়ই প্রীতিকর হয় না। কিন্তু, তথাপি কালিদাসের সহিত ভারবির একটি তুলনা মনে স্বতঃই উদিত হয়। কালিদাস স্বভাবকবি, ভারবি যেন কষ্ট করিয়া কবিত্ব অর্জন করিয়াছেন। ভারবির কাব্যে অলঙ্কার শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের একটা প্রয়াস পরিস্ফুট। 'কিরাতার্জুনীয়ে'র পঞ্চদশ সর্গে গোমূত্রিকাবন্ধ, সর্বতোভদ্র ও অর্দ্ধভ্রমক প্রভৃতি চিত্রবন্ধ ইহার নিদর্শন। এই কাব্যের প্রতি সর্গের অন্ত্যশ্লোকে 'লক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রয়াস-সাধ্য রচনারই প্রমাণ।

ভারবির কাল

৬৩৪ খৃষ্টাব্দের আইহোল প্রশস্তিতে (Aihole Inscription) ভারবির উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, তিনি এই সময়ের পূর্বের লেখক।

ভট্টির ভট্টিকাব্য

ভট্টির 'রাবণবধ' বা 'ভট্টিকাব্য' এই যুগের অপর একখানি বিখ্যাত কাব্য। ইহা দ্বাবিংশতি সর্গে রচিত।

লঙ্কা হইতে রামের প্রত্যাবর্তনের পরে রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত রামায়ণের সমগ্র আখ্যান এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণ-কাব্য হিসাবেই ইহার রচনা। সেইজন্য এই কাব্যের চারিটি ভাগ—

১। প্রকীর্ণ কাণ্ড—বিবিধ বিষয়ক উদাহরণ
(সর্গ ১—৫)

২। অধিকারকাণ্ড—ব্যাকরণের অধিকার সূত্র সমূহের উদাহরণ
(সর্গ ৬—৯)

৩। প্রসন্নকাণ্ড—অলঙ্কার সমূহের উদাহরণ
(সর্গ ১০—১৩)

৪। তিঙন্ত কাণ্ড—তিঙন্ত পদসমূহের উদাহরণ
(সর্গ ১৪—২২)

এই কাব্যটি সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন—ইহা ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন পাঠকের পক্ষে প্রদীপস্বরূপ, কিন্তু ঐ শাস্ত্রবিমুখ ব্যক্তির নিকট অন্ধের হাতে দর্পণের ন্যায়।[১] ভট্টি নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার এই কাব্য ব্যাখ্যার সাহায্য ছাড়া দুর্বোধ্য।[২] ভাষার কাঠিন্য সত্ত্বেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, ভট্টি যে উদ্দেশ্যে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। শুষ্ক ব্যাকরণশাস্ত্র ও জটিল অলঙ্কার শাস্ত্র কাব্যের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার এই প্রয়াসে শিক্ষার্থীর পথ সুগম হইয়াছে। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের এইরূপ সংমিশ্রণ সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় সর্গের শরদ্বর্ণন তাঁহার কবিত্বগুণের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সাহিত্যিক বিচার

ভট্টি শব্দটি ভর্তৃশব্দের প্রাকৃত রূপ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, এই ভট্টি ও 'বাক্যপদীয়' প্রণেতা ভর্তৃহরি অভিন্ন। ভট্টি তাঁহার কাব্যে লিখিয়াছেন (২২।৩৫) যে তিনি শ্রীধরসেন শাসিত বলভীতে ইহা রচনা করিয়াছেন। বলভীতে এই নামে চারিজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ রাজা ৬৪৪ খৃষ্টাব্দের

ভট্টির জীবনী ও কাল

১। ভট্টিকাব্য—২২।৩৩
২। ঐ —২২।৩৪

নিকটবর্তী কোনকালে রাজত্ব করেন। সুতরাং ইহাই ভট্টির কালের নিম্নতর সীমা।

কুমারদাসের 'জানকীহরণ' এই যুগের অন্যতম মহাকাব্য। সিংহলী সাহিত্যে রক্ষিত একটি টীকা হইতে মনে হয়, ইহা পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত। বর্তমানে ইহার অংশমাত্র পাওয়া যায়। নাম হইতেই বুঝা যায়, রামায়ণের আখ্যান ইহার উপজীব্য। কিন্তু জানকীর হরণেই কাব্যের সমাপ্তি নহে। সিংহলী সাহিত্যের উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে মনে হয়, রামের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

কুমারদাসের 'জানকীহরণ'

এই কাব্যে কালিদাসের মহাকাব্য দুইটির ভাবগত এবং, কোন কোন ক্ষেত্রে, ভাষাগত অনুকরণ লক্ষণীয়। কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের না হইলেও, ইহা সুখপাঠ্য। অলঙ্কার ও ছন্দোবৈচিত্র্য এই কাব্যের মনোজ্ঞতার অন্যতম কারণ।

সাহিত্যিক বিচার

কুমারদাস কুমারভট্ট বা ভট্টকুমার নামেও পরিচিত। কিম্বদন্তী এই যে, তিনি কালিদাসের বন্ধু ছিলেন। সিংহলে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে তিনি ঐ দেশের কুমারদাস নামক রাজা ছিলেন; রাজা কুমারদাসের রাজত্বকাল আনুমানিক ৫১৭-৫২৬ খৃষ্টাব্দ। এই কবির পরিচয় যাহাই হউক না কেন, তাঁহার খ্যাতি যে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঐ শতাব্দী হইতে রচিত কোষকাব্যগুলিতে এই কবির শ্লোকের উদ্ধৃতি।

জীবনী

মাঘের 'শিশুপালবধ'

মাঘের 'শিশুপালবধ' বিংশতি সর্গে রচিত।

এই কাব্যের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এইরূপ :—

বসুদেবালয়ে নারদ আসিয়া দেব ও নরের মহাশত্রু চেদিরাজ শিশুপালকে বধ করার আদেশ কৃষ্ণকে দিলেন। উদ্ধবের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানে অতিশয় সম্মানিত করিলেন। ইহাতে শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ স্থান ত্যাগপূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। দুই পক্ষের সৈন্যদলে তুমুল

সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরিশেষে, কৃষ্ণ ও শিশুপাল উভয়ে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিশুপাল কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইলেন।

মহাভারতের মূল আখ্যান অবলম্বনে কাব্যটি রচিত হইলেও, কবি স্বীয় কল্পনাবলে অনেক নূতন ঘটনার বিন্যাস করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি মূল আখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিষয়কে কবিত্ব জাহির করিবার জন্য অতিরিক্ত দীর্ঘাকারে পরিণত করিয়াছেন; রাজসূয় যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ একটি নিদর্শন।

সে যুগের ভারতীয় কাব্যরসিক ব্যক্তিগণ মাঘের এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব, দণ্ডীর পদলালিত্য—এই ত্রিবিধ গুণের সমন্বয় হইয়াছে মাঘের কাব্যে। এই প্রশংসার সমর্থনে 'শিশুপালবধে' অনেক নিদর্শনই আছে বটে; কিন্তু, সমগ্র কাব্যটির প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্তিটিকে অতিশয়োক্তি বলিতেই হইবে। কারণ, এই কাব্যে রচনার স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি নাই; আছে কবির স্বীয় পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের প্রয়াস। দ্বিতীয় সর্গে, উদ্ধবের বক্তৃতায়, কবি রাজনীতিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া উহাকে অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত করিয়াছেন; ইহাতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবারই সম্ভাবনা। চতুর্থ সর্গে, রৈবতক পর্বতের বর্ণনাতে, কবি যেন নিজের বর্ণনাশক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন; পথে এত দীর্ঘ বর্ণনা না হইলে যেন ভাল হইত। ষষ্ঠে, কবি যেন নারীর রূপলাবণ্য ও প্রেম বর্ণনার একটা সুযোগ করিয়া লইবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞে গমনের পথেও কৃষ্ণের সঙ্গে একদল স্ত্রীলোকের অবতারণা করিয়াছেন।

সাহিত্যিক বিচার

আধুনিক রুচিতে উল্লিখিত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মাঘের কবিত্বশক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু, অনেক স্থলে দুরূহ শব্দের ও দীর্ঘ সমাসবহুল পদের প্রয়োগে কাব্যের রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নানাবিধ ছন্দের ব্যবহার করায় কাব্যের বৈচিত্র্যসাধন হইয়াছে। শ্লেষ, অনুপ্রাস ও যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের অতিরিক্ত প্রয়োগে এবং সর্বতোভদ্র, গোমূত্রিকা ইত্যাদি চিত্রকাব্যের ব্যবহারে কাব্যটিতে কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু

প্রকৃত কবিত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভারতীয় সমালোচক বলিয়াছেন যে, মাঘ মাসে যেমন সূর্যের তেজ মন্দীভূত হয়, তেমন ভাবেই মাঘ কবির অভ্যুদয়ে ভারবির যশ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ কাব্যে সাহিত্যিক ব্যায়ামের আদর্শ তিনি ভারবির কাব্যেই পাইয়াছিলেন; কিন্তু, এ বিষয়ে তিনি বোধ হয় পূর্ববর্ত্তী কবিকেও পরাভূত করিয়াছেন।

মাঘের জীবনী ও কাল

মাঘের জীবন-বা রচনাকাল নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই। তবে অষ্টম নবম শতাব্দীতে আলঙ্কারিক বামন ও আনন্দবর্দ্ধনের গ্রন্থে মাঘের শ্লোকের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায় মাঘ উহাদের পূর্ববর্ত্তী। 'শিশুপালবধে'র অন্তে মাঘের বংশবর্ণনাতে দেখা যায় তাঁহার পিতামহ বর্মল নামে এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, এই বর্মল বর্মলাত নামক রাজা হইতে অভিন্ন। বর্মলাত রাজার একটি প্রশস্তির তারিখ ৬২৫ খৃষ্টাব্দ।

ক্ষয়িষ্ণু পত্যকাব্য

সব দেশেই কবিপ্রতিভার উদয়, মধ্যাহ্ন ও অস্ত আছে। ভারতেও এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কালিদাসের কাব্যে ভারতীয় কাব্যের মধ্যাহ্নকাল দেখা গেল। তাঁহার পর হইতেই ভারতীয় কবিপ্রতিভার দীপ্তি যেন ক্ষীণ হইতে থাকিল। কালিদাসের যুগে এই প্রতিভার যে পরিচয় আমরা পাইলাম, তাহা বহুল পরিমাণে যখন নিস্তেজ হইয়া পড়িল তখনও এই দেশে কাব্যরচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে এই ক্ষয়িষ্ণু কাব্যের যুগারম্ভ হইল। এই যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যগুলিতে 'নৈসর্গিকী প্রতিভার' পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায়না; কিন্তু, 'শ্রুতং চ বহুনির্মলম্' এবং 'অমন্দ অভিযোগ' এই দুইটির প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে।[১] এযুগের অধিকাংশ কাব্য যেন কবির হৃদয় হইতে

১। দণ্ডী বলিয়াছেন,

নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতং চ বহুনির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ ॥ (কাব্যাদর্শ)

অর্থাৎ কবিত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি গুণ—স্বাভাবিক প্রতিভা, শাস্ত্রজ্ঞান ও বহুল অভ্যাস।

স্ফূর্ত নয়, শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত। সেই জন্যই, ইহাদের প্রধান আবেদন হৃদয়ের নিকট নহে, বুদ্ধির নিকট। কবি যেন ভাবকে ফুটাইয়া তোলা অপেক্ষা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার প্রতি অধিকতর সচেষ্ট; কাব্যের আত্মা হইতে যেন অঙ্গটির প্রাধান্যই বেশী। মনে হয়, এ যুগের আদর্শ ভারবি, ভট্টি ও মাঘ, কালিদাস নহে।

এই যুগের কাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করা যায়ঃ—

(ক) মহাকাব্য
(খ) ঐতিহাসিক কাব্য
(গ) শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য
(ঘ) ভক্তিমূলক কাব্য
(ঙ) নীতিমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কাব্য
(চ) কোষকাব্য ও মহিলা কবির কাব্য

(ক) মহাকাব্য

রত্নাকরের 'হরবিজয়'

কাশ্মীরী রত্নাকরের রচিত 'হরবিজয়' এই যুগের একটি মহাকাব্য। ইহা পঞ্চাশটি সর্গে রচিত বিশাল গ্রন্থ। শিব কর্তৃক অন্ধকাসুরের নিধন এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ইহাতে কবি যেন তাঁহার কবিত্ব জাহির করিতেই ব্যস্ত; রাজনীতির জ্ঞান প্রকাশের জন্য তিনি নবম হইতে ষোড়শ—এই আটটি সর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দশ এগারটি সর্গে তিনি শুধু আদিরসাশ্রিত ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যটিতে চিত্রবন্ধের প্রয়োগ ও ইহার সুদীর্ঘ আকার লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বটে, কিন্তু রুচিবান্ কবির নহে।

রত্নাকর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কবি।

শিবস্বামীর 'কপ্ফিণাভ্যুদয়

শিবস্বামীর 'কপ্ফিণাভ্যুদয়' এই জাতীয় অপর একটি গ্রন্থ।

বিংশতি সর্গে রচিত এই কাব্যের উপজীব্য অবদানশতকে বর্ণিত দাক্ষিণাত্যের রাজা কপ্ফিনের বৌদ্ধ কাহিনী। ভাষার কঠিন্যে এবং অলঙ্কার ও ছন্দের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রয়োগে এই কাব্যটি রত্নাকরের কাব্যেরই ন্যায়।

শিবস্বামীর কাল

শিবস্বামী রত্নাকরের সমসাময়িক।

মঙ্খকের 'শ্রীকণ্ঠ-চরিত'

মঙ্খকের 'শ্রীকণ্ঠ-চরিত' পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত এই যুগের অন্যতম মহাকাব্য।

শিবকর্তৃক ত্রিপুরাসুরের ধ্বংসের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত। আখ্যানভাগ ক্ষুদ্র, কিন্তু কবি স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য ইহাকে পল্লবিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ষষ্ঠ হইতে ষোড়শ—এতগুলি সর্গে কবি শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ও শৃঙ্গাররসপূর্ণ চিত্রের বর্ণনাই করিয়াছেন, মূল বিষয়বস্তুর সূত্র হারাইয়া গিয়াছে।

মঙ্খকের কাল

কবির জীবনকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ।

শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত'

শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' বা 'নৈষধীয়চরিত' এই যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাব্য। ইহা দ্বাবিংশতি সর্গে রচিত। মহাভারতে বর্ণিত নল ও দময়ন্তীর অপূর্ব কাহিনী অনলম্বনে কাব্যটি রচিত। কিন্তু, 'নৈষধচরিতে' মূল আখ্যানের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহাতে নলের সহিত দময়ন্তীর বিবাহ ও নলের রাজধানীতে কলির আগমন পর্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

সাহিত্যিক বিচার

কাব্যটিতে কবির লক্ষ্য আখ্যানভাগের প্রতি নহে; তিনি জনপ্রিয় বস্তুটিকে উপজীব্য করিয়া সমগ্র কাব্যটির মধ্য দিয়া ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে স্বীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই শাস্ত্রগুলিতে তাঁহার অধিকার যথেষ্ট প্রশংসার্হ, কিন্তু স্থানে স্থানে কবি মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া কেলিয়াছেন। শ্রীহর্ষের উপজীব্য আখ্যানটি মহাভারতে দুই শতেরও কম শ্লোকে বর্ণিত; কিন্তু, সেস্থানে কবি নিজের গ্রন্থে প্রায় তিন সহস্র শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই কবির মাত্রাবোধের অভাব প্রমাণিত হয়। ইহার অপর একটি নিদর্শন এই যে, দময়ন্তীর যে স্বয়ংবর ব্যাপারটি মাত্র কয়েক পংক্তিতে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনায় কবি পাঁচটি দীর্ঘ সর্গ (১০—১৪) রচনা করিয়াছেন। কাব্য লিখিতে বসিয়া কবি দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় দি ার জন্য উৎসুক। একটা সম্পূর্ণ সর্গে (১৭) তিনি দার্শনিক মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু মূল বিষয়বস্তুর সহিত

ইহার কোন যোগ নাই। আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে এই সমস্ত কারণেই কাব্যটি উচ্চাঙ্গের নহে; জনৈক পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলিয়াছেন যে, কাব্যটি কুরুচি ও নিকৃষ্ট রচনাশৈলীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতীয় কাব্য-রসিক 'নৈষধে পদলালিত্যম্'এর যে প্রশংসা করিয়াছেন, কাব্যের স্থানে স্থানে সেরূপ প্রশংসার কারণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইতস্ততঃ ললিত পদসমূহের প্রয়োগ থাকিলেই একটি সমগ্র কাব্যগ্রন্থ কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হয় না।

শ্রীহর্ষের কাল

শ্রীহর্ষ সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে কনৌজের রাজা বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের রাজত্ব কালের কবি।

এই যুগের অপরাপর মহাকাব্যগুলি নগণ্য। সুতরাং ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিচিত গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল:—

গ্রন্থ (বর্ণানুক্রমিক)	গ্রন্থকার
উদাত্তরাঘব	শাকল্য মল্ল অথবা মল্লাচার্য্য বা কবিমল্ল
কবিরহস্য	হলায়ুধ
কুমারপালচরিত	হেমচন্দ্র
গোবিন্দলীলামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
জনকীপরিণয়	চক্রকবি
ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত	হেমচন্দ্র
ধর্মশর্মাভ্যুদয়	বামনভট্টবাণ
নরনারায়ণানন্দ	বস্তুপাল
পদ্মচূড়ামণি	বুদ্ধঘোষ
পাণ্ডবচরিত	দেবপ্রভ সূরি
বালভারত	অমরচন্দ্র সূরি
ভিক্ষাটন	গোকুল

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যাদবাভ্যুদয়	বেঙ্কটনাথ (বা বেঙ্কটদেশীক)
রাবণার্জুনীয়	ভৌমক (অথবা ভৌম বা ভট্টভীম)
রাঘবপাণ্ডবীয়	ধনঞ্জয়
ঐ	কবিরাজ
রুক্মিণীকল্যাণ	রাজচূড়ামণি দীক্ষিত
সহৃদয়ানন্দ	কৃষ্ণানন্দ
সুরথোৎসব	সোমেশ্বর
হরিবিলাস	লোলিম্বরাজ

(খ) ঐতিহাসিক কাব্য

এই কাব্যের স্বরূপ

কাব্যের জগৎ কল্পনালোক এবং ইতিহাস বাস্তব তথ্যপূর্ণ। সুতরাং ঐতিহাসিক কাব্য—এই দুই শব্দ পরস্পরবিরোধী ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু, বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থগুলি কাব্য হইলেও, ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে; অবশ্য কাব্যগুলি পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাদের রচনায় ইতিহাস অপেক্ষা কাব্যের প্রতিই কবির লক্ষ্য অধিকতর।

পদ্মগুপ্ত বা পরিমলের 'নবসাহসাঙ্কচরিত'

পদ্মগুপ্ত বা পরিমলের 'নবসাহসাঙ্কচরিত' এই জাতীয় গ্রন্থ। ইহা অষ্টাদশ সর্গে রচিত। সিন্ধুরাজের সহিত নাগরাজ শঙ্খপালের কন্যা শশিপ্রভার বিচিত্র ঘটনাক্রমে বিবাহ এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

রচনাকাল

ঐতিহাসিক মূল্য তেমন না থাকিলেও, গ্রন্থটির কাব্যরস একেবারে নগণ্য নয়। কাব্যটি সম্ভবতঃ ১০০৫ খৃষ্টাব্দে কবির পৃষ্ঠপোষক ধারারাজ নবসাহসাঙ্কের রাজত্বকালে রচিত।

বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত'

বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' এই জাতীয় অপর একটি কাব্য। ইহা অষ্টাদশ সর্গে রচিত।

রচনাকাল

কাব্যটি কবির পৃষ্ঠপোষক কল্যাণের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের উদ্দেশ্যে রচিত।

গ্রন্থটিতে অনেক কাল্পনিক ঘটনার সন্নিবেশ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই জাতীয় অপর গ্রন্থগুলির তুলনায় ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্য বিস্তর আছে। কাব্য হিসাবে খুব সুখপাঠ্য না হইলেও, ইহাতে কবিত্বের পরিচয় যথেষ্ট রহিয়াছে।

কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী'

কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী' এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক পরিচিত।

কাশ্মীরের রাজবংশের বিবরণ লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। ইহার প্রথম দিকে গোনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ান্নটি কাল্পনিক রাজার কাহিনী বর্ণিত আছে। অনেক ঐতিহাসিক রাজবংশ এবং রাজার বর্ণনাও গ্রন্থের অপরাপর অংশে রহিয়াছে।

কল্‌হণ নিজেই বলিয়াছেন যে, 'নীলমতপুরাণ' প্রভৃতি এগারটি পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত কাল্পনিক ঘটনার এমন সংমিশ্রণ দেখা যায় যে, অনেক সময় ঐতিহাসিক তথ্যটুকু পৃথক্ করিয়া নেওয়া পাঠকের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। তথাপি কাশ্মীরের প্রাচীন রাজবংশের একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিণী', শুধু কাশ্মীরে নহে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাকে একমাত্র ঐতিহাসিক কাব্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কল্‌হণের কাব্যটি খাঁটি ইতিহাস বা history নহে, একটি ঘটনাপঞ্জী বা chronicle মাত্র; ইতিহাসে কার্য-কারণের পারস্পরিক সম্বন্ধের যে বৈজ্ঞানিক বিচার থাকে, তাহা এই গ্রন্থে নাই।

ইহার ঐতিহাসিক মূল্য

রচনাকাল

'রাজতরঙ্গিণী' খৃষ্টীয় ১১৪৮-৫০ অব্দে রচিত।

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' অন্যতম ঐতিহাসিক কাব্য।

ইহাতে শ্লেষের সাহায্যে প্রতি শ্লোকেই দাশরথি রাম ও বঙ্গের রাজা রামপালের বর্ণনা আছে। উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহের ফলে, দ্বিতীয় মহীপালের হত্যা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা—ইহাই কাব্যটির প্রধান বিষয়বস্তু।

ঐতিহাসিক মূল্য

সমসাময়িক ঘটনাবলীর সাক্ষ্য হিসাবে গ্রন্থটির মূল্য আছে। কিন্তু, শ্লেষ অলঙ্কারের বাহুল্যে স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

রচনাকাল

সন্ধ্যাকর উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহার গ্রন্থটি মদনপালের রাজত্বকালে একাদশ শতকে সমাপ্ত হয়।

এই জাতীয় অপর কাব্যগুলি খুব প্রসিদ্ধ নয়। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থনাম (বর্ণানুক্রমিক)	সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু	গ্রন্থকার
কুমারপালচরিত (বা দ্ব্যাশ্রয়কাব্য)	দাক্ষিণাত্যের অন্‌হিলবাদের রাজগণের কাহিনী	হেমচন্দ্র
পৃথ্বীরাজবিজয়	শাহাবুদ্দিনের সহিত যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের জয়লাভ	অজ্ঞাত
রঘুনাথাভ্যুদয়	তাঞ্জোরের রঘুনাথ নায়কের জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত	রামভদ্রাম্বা
রাজেন্দ্রকর্ণপূর	কাশ্মীররাজ হর্ষের স্তুতিকীর্ত্তন	শম্ভু

(গ) শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য

সংস্কৃত কাব্যে শৃঙ্গাররস প্রাচীনতম কাল হইতেই একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ', কালিদাসের 'মেঘদূত', অমরুর

'অমরুশতক', ভর্তৃহরির 'শৃঙ্গারশতক' প্রভৃতি ইহার প্রধান নিদর্শন।

এই কাব্যের স্বরূপ

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ধরণের কাব্যের সঙ্গে প্রায়ই মিশ্রিত থাকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাত্মক রচনা, যেমন 'মেঘদূতে', বা উপদেশাত্মক কথা, যেমন অশ্বঘোষে এবং ভর্তৃহরিতে; অথবা এই কাব্যগুলি হয় পরস্পর নিরপেক্ষ পদ্যের সমষ্টি, যেমন 'অমরুশতকে'।

বর্ত্তমানে আলোচ্য কাব্যগুলিতে চিত্তাকর্ষক বস্তু নাই, এমন নহে। কিন্তু, প্রায়ই কবি নিজের রচনাকৌশলের পরিচয় দিবার জন্য যে সচেতন প্রয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে কাব্যের স্বচ্ছন্দগতি বা ভাবের হৃদয়গ্রাহিতা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

'চৌরপঞ্চাশিকা'

ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কাব্য মনে হয় 'চৌর-পঞ্চাশিকা' (অপর নাম—চৌর বা চৌরী-স্বরত-পঞ্চাশিকা)।

ইহাতে পঞ্চাশটি শ্লোকে গোপন প্রেমের কাহিনী বর্ণিত আছে। এই কাব্যের মুখ্য বিষয়বস্তু কামোদ্দীপক পরিবেশে রমণীর রূপলাবণ্যের বর্ণনা এবং গোপন সম্ভোগের চিত্র। কাব্যটির জনপ্রিয়তার একটি প্রধান নিদর্শন এই যে, ইহা তিনটি রূপে বর্ত্তমানে বিদ্যমান। কাব্যহিসাবে ইহা অত্যন্ত সরস ও সুখপাঠ্য।

রচয়িতা

ইহার রচয়িতা নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই। বিহ্লণ, চোর, সুন্দর এবং বররুচি—এই বিভিন্ন নামগুলি ইহার সঙ্গে রচয়িতাস্বরূপে যুক্ত আছে।

গোবর্দ্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী'

গোবর্দ্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী' এই ধরণের সুবিখ্যাত কাব্য।

ইহাতে সপ্তশতাধিক পৃথক্ পৃথক্ শ্লোক ব্রজ্যাক্রমে আর্যাছন্দে রচিত হইয়াছে; শ্লোকগুলি শৃঙ্গাররসপ্রধান। কবি সম্ভবতঃ হালের 'সপ্তশতী'কে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু, হালের কাব্যের ন্যায় ইহা তেমন হৃদয়গ্রাহী নহে।

গোবর্দ্ধনের কাল

গোবর্দ্ধন বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ও কবি জয়দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

জগন্নাথের 'ভামিনীবিলাস'

এই জাতীয় অন্যতম কাব্য জগন্নাথের 'ভামিনীবিলাস'। চারি ভাগে রচিত এই কাব্যে শৃঙ্গাররসের সহিত নীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। কাব্যটিতে স্থানে স্থানে প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দূতকাব্য

এই যুগে মৌলিক চিন্তার দৈন্য ছিল বলিয়াই 'মেঘদূতে'র অনুকরণে অনেক কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু, কি ভাবে, কি ভাষায়, এই সমস্ত কাব্য 'মেঘদূতে'র সমকক্ষ হইতে তো পারেই নাই, বরং অনেক পরিমাণে ইহারা নিকৃষ্টতর রচনা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'মেঘদূতে'র sequel বা পরিশিষ্ট রূপ রচনাও দেখা যায়; যক্ষপত্নীর প্রতিসন্দেশও কোন কোন কাব্যের বিষয়বস্তু। এই সমস্ত কাব্যে মন্দাক্রান্তা ছাড়া মালিনী, শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি ছন্দেরও ব্যবহার আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক কাব্যের কামার্ত্ত নায়ক চেতন অচেতনে ভেদজ্ঞানশূন্য হন নাই। সেইজন্য বায়ু, চন্দ্র, তুলসী প্রভৃতি অচেতন পদার্থ ছাড়াও কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতি সচেতন জীবও দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। এই ধরণের কতক কাব্যে প্রেম-সন্দেশের পরিবর্ত্তে দেখা যায় শিষ্যকর্ত্তৃক দূরদেশে গুরুর নিকট প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিপত্র অথবা বৈষ্ণবগণের ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশের প্রয়াস। আমরা এই জাতীয় কয়েকটি মাত্র অপেক্ষাকৃত প্রধান দূতকাব্যের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

গ্রন্থ (বর্ণানুক্রমিক)	গ্রন্থকার
চন্দ্রদূত	জম্বু
পবনদূত	ধোয়ী
পদাঙ্কদূত	কৃষ্ণসার্বভৌম;
ভ্রমরদূত	রুদ্র
মনোদূত	ব্রজনাথ
হংসদূত	রূপগোস্বামী

(ঘ) ভক্তিমূলক কাব্য

এই জাতীয় কাব্যের দুইটি ধারা লক্ষণীয়। এক জাতীয় রচনাতে পাওয়া যায় ভক্তিরসের সহিত শৃঙ্গাররসের সংমিশ্রণ এবং অপর জাতীয় রচনা বর্ণনাত্মক বা দার্শনিক স্তোত্র।

ইহার স্বরূপ

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'

প্রথমোক্তপ্রকার কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। ইহা দ্বাদশ সর্গে রচিত। প্রতি সর্গেই কৃষ্ণ, রাধা বা তাঁহার সখীর গান রহিয়াছে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বসন্তলীলা এই কাব্যের উপজীব্য; এই লীলা শৃঙ্গাররস-প্রধান। রাধার বিরহ, অপর গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের কেলি, রাধার আর্ত্তি, মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও ঈর্ষ্যা, রাধাসখীকর্ত্তৃক অনুরোধ উপরোধ, কৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তন, অনুতাপ ও রাধার অনুনয়, পরিশেষে মিলনের আনন্দ—এই সমস্ত বিষয় লইয়াই কাব্যটি রচিত।

জয়দেব-ভারতী কবির নিজের ভাষাতেই মধুর, কান্ত এবং কোমল। ইহাতে কাব্যের স্বরূপ বর্ণনাই হইয়াছে, আত্মপ্রশংসার আধিক্য নহে। হরিস্মরণে সরস মন নিয়াই কবি কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসকলায় তাঁহার কৌতূহল ছিল। এই উভয় কারণেই, কবির মনের সরসতা ও বিলাসকলায় কৌতূহল পাঠকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। সেইজন্যই কবির যশ বঙ্গদেশের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া সারা ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, ইহা ল্যাসেন (Lassen), জোন্‌স্ (Jones), লেভি (Levi), পিসেল (Pischel), শ্রিডার (Schroeder) প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকগণেরও সপ্রশংস দৃষ্টির অগোচর হয় নাই।

সাহিত্যিক বিচার

জয়দেব বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল আঃ ১১৮৫—১২০৫ খৃষ্টাব্দ। জয়দেবের বাড়ী ছিল কেন্দুবিল্ব নামক স্থানে; ইহাই সম্ভবতঃ বীরভূম জেলায় অজয় নদীর তীরবর্ত্তী কেন্দুলী গ্রাম।

জয়দেবের কাল ও জন্মস্থান

লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'

লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' অন্যতম ভক্তিমূলক কাব্য।

ইহাতে ভক্তিমূলক গীতিধর্ম্মী শ্লোকসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শৃঙ্গাররসপূর্ণ পরিবেশে স্থাপিত ইষ্টদেবতা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস ও ভক্তের প্রপত্তি এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ইহাতে যে ভাবাবেগ তাহাতে sentimentalism নাই, আছে দিব্যোন্মাদ। ইহার আবেদন বুদ্ধির কাছে নহে, হৃদয়ের কাছে। বস্তুতঃ ইহাতে ভক্তিতত্ত্বের যে অপূর্ব প্রকাশ রহিয়াছে তাহাতেই এই কাব্যটি মধ্যযুগীয় ভক্তিমূলক রচনার অন্যতম প্রধান নিদর্শনস্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে।

সাহিত্যিক বিচার

এই যুগের স্তবস্তোত্রগুলি সংখ্যাতীত। এইগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে প্রত্যেক জাতীয় স্তোত্রগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধস্তোত্র

নাম	রচয়িতা
ভক্তিশতক	রামচন্দ্র কবিভারতী
লোকেশ্বরশতক	বজ্রদত্ত

জৈনস্তোত্র

চতুর্বিংশতিজিনস্তুতি বা চতুর্বিংশিকা	নানা ব্যক্তিরই এই জাতীয় রচনা পাওয়া যায়
ভক্তামর	মানতুঙ্গ

হিন্দুস্তোত্র

এক শঙ্করাচার্যের নামেই প্রায় দুইশত স্তোত্র প্রচলিত আছে। সবগুলিই প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করের রচিত কিনা বলা কঠিন। কতক স্তোত্র ঐ সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী কালের অপর কোন শঙ্করের রচিত হইতে পারে। নিম্নলিখিত স্তোত্রগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ ঃ—

নাম (বর্ণানুক্রমিক)	রচয়িতা
অর্দ্ধনারীশ্বর স্তোত্র	কহ্লণ
আত্মষট্‌ক (বা নির্বাণষট্‌ক)	শঙ্কর
আনন্দমন্দাকিনী	মধুসূদন সরস্বতী
আনন্দলহরী	শঙ্কর
গঙ্গাষ্টক	শঙ্কর
দশশ্লোকী	শঙ্কর
দেবীশতক	আনন্দবর্দ্ধন
পঞ্চশতী	মূককবি
মুকুন্দমালা	কুলশেখর
মোহমুদ্গর	শঙ্কর
(বা চর্পটপঞ্জরিকা বা দ্বাদশপঞ্জরিকা)	শঙ্কর
বেদনারশিবস্তুতি	শঙ্কর
শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র	শঙ্কর
শিবমহিম্নঃস্তোত্র	"
স্তবমালা	রূপগোস্বামী
স্তোত্রাবলী	উৎপলদেব
হস্তামলক	শঙ্কর

(ঙ) নীতিমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কাব্য

বাস্তব জীবন সম্বন্ধে উপদেশাত্মক কথা ও পার্থিব ভোগাদির প্রতি বৈরাগ্য এই জাতীয় কাব্যের বিষয়বস্তু। সাধারণতঃ ইহারা পরস্পর নিরপেক্ষ সুভাষিতবহুল শতকজাতীয় শ্লোকের সমষ্টি। ভর্তৃহরির প্রভাব এই সকল কাব্যের উপর যথেষ্ট আছে মনে হয়, কিন্তু কোন কোন কাব্যে

মৌলিক চিন্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। মানবচরিত্রের দুর্বলতার প্রতি ব্যঙ্গও কতক কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। নিম্নে অপেক্ষাকৃত প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম দেওয়া গেল।

গ্রন্থ (বর্ণানুক্রমিক)	রচয়িতা
অন্যোক্তিমুক্তালতা	শম্ভু
কলাবিলাস	ক্ষেমেন্দ্র
দেশোপদেশ	"
নর্মমালা	"
শান্তিশতক	শিল্হণ
সুভাষিতরত্নসন্দোহ	অমিতগতি

(চ) কোষকাব্য ও মহিলা কবির কাব্য

কোষকাব্যের লক্ষণ পূর্বে বলা হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতক হইতে এই শ্রেণীর কাব্যরচনার সূত্রপাত। ইহাদের মধ্যে সহস্রাধিক কবির রচিত শ্লোক সংগৃহীত আছে; তাহাদের মধ্যে অনেক কবির অন্য পরিচয় বা গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য এই যে, বর্ণনীয় বিষয়ের বিভিন্নতা ও অলঙ্কার এবং ছন্দের বিপুল বৈচিত্র্য পাঠকের চিত্তে রস হইতে রসান্তরের উৎপাদন করে এবং চিত্তবিনোদনার্থী পাঠক ইহাদের শ্লোকগুলির মধ্যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। কোষকাব্যগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও নগণ্য নয়। পাণিনিও যে একজন কবি ছিলেন তাহার সাক্ষী কোষকাব্য। বাক্‌কূট নামে জনৈক কবির পরিচয় কোষকাব্য ছাড়া অন্য কোথাও মিলে না।

এই কাব্যের রচনাকাল

সাহিত্যিক মূল্য

ঐতিহাসিক মূল্য

প্রধান প্রধান কোষকাব্যগুলির নাম, রচয়িতা ও রচনাকাল নিম্নে দেওয়া গেল।

গ্রন্থ (কালানুক্রমিক)	রচয়িতা	রচনাকাল
কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়	?	১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্ত্তী
সদুক্তিকর্ণামৃত	শ্রীধরদাস (বাঙ্গালী)	লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে খৃঃ ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে
সুভাষিতমুক্তাবলী বা সূক্তিমুক্তাবলী	জহ্লণ	খৃঃ ১২৫৭ অব্দ
শার্ঙ্গধরপদ্ধতি	শার্ঙ্গধর	আঃ ১৩৬৩ অব্দ
পদ্যাবলী	রূপগোস্বামী	খৃঃ ১৫শ শতাব্দী
সুভাষিতাবলী	শ্রীবর	"
সুভাষিতাবলী	বল্লভদেব	আঃ ১৫শ শতাব্দী
পদ্যবেণী	বেণী দত্ত	আঃ খৃঃ ১৭শ শতাব্দী
সুভাষিতহারাবলী	হরিকবি	"

মহিলা কবি

কোষকাব্যগুলিতে পুরুষ কবির রচনা ছাড়া প্রায় চল্লিশটি মহিলাকবির[১] রচিত শ্লোকও অনেক আছে। ইঁহাদের মধ্যে অধিকতর পরিচিত বিজ্জা, বিকটনিতম্বা, শীলাভট্টারিকা, ভাবদেবী, গৌরী, পদ্মাবতী ও বিদ্যাবতী। ইঁহাদের রচিত শ্লোকগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐগুলি সবই প্রেমাত্মক। কাব্য হিসাবে আধুনিক পণ্ডিতগণ এই শ্লোকগুলিকে খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে করেন না।

১। মহিলাকবিগণের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য জে. বি. চৌধুরীর *Sanskrit Poetesses*, Part A ও Part B দ্রষ্টব্য।

কোষকাব্যে বিক্ষিপ্ত শ্লোক ছাড়া মহিলাকবিগণের রচিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও পাওয়া যায়। কাব্যগ্রন্থরচয়িত্রীগণের মধ্যে ইঁহারাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

রামভদ্রাম্বা—ইঁহার রচিত কাব্যের নাম 'রঘুনাথাভ্যুদয়' ; ইহা কবির প্রেমিক তাঞ্জোরের রঘুনাথ নায়কের মহিমাকীর্ত্তনে রচিত। কাব্যটির রচনাকাল আঃ ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ।

তিরুমলাম্বা—'বরদাম্বিকা-পরিণয়' কাব্য ইঁহার রচিত। বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতরায়ের সহিত বরদাম্বিকার পরিণয়ের বিচিত্র কাহিনী এই কাব্যের উপজীব্য। ইহার রচনাকাল আঃ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ।

গঙ্গাদেবী—ইঁহার কাব্য 'মধুরা-বিজয়' বা 'বীরকম্পরায়চরিত'। স্বীয় পতি কম্পরায়ের মাদুরা-বিজয় কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত। কাব্যটির রচনাকাল আঃ ১৩৪৩-৭৯ খৃষ্টাব্দ।

আঠার

গদ্যকাব্য
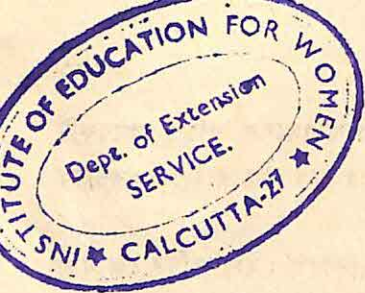
'গদ্য' শব্দে কি বুঝায় ?

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, সংস্কৃতে কাব্য বলিতে কাব্যলক্ষণাক্রান্ত গদ্যরচনাকেও বুঝায়। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "বৃত্তবন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্"[১], অর্থাৎ কিনা যে রচনা বৃত্তবন্ধ বা ছন্দোবদ্ধপদবিহীন তাহাই গদ্য।

গদ্য-রচনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

অধিকাংশ সভ্যদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীনতম নিদর্শন পদ্যে রচিত। ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদ পদ্যে রচিত। প্রাচীন ভারতে যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের আদর অধিকতর ছিল, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আইন কানুনের গ্রন্থ, এমন কি শুষ্ক ব্যাকরণ শাস্ত্র পর্যন্তও, কোন কোন ক্ষেত্রে, পদ্যে রচিত।

যজুর্বেদ
অথর্ববেদ
ব্রাহ্মণ

বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য-রচনারও উৎপত্তি হয়। যজুর্বেদে যাগযজ্ঞ-সংক্রান্ত নির্দেশগুলি গদ্যে রচিত। অথর্ববেদেও কিছু কিছু গদ্যরচনা দেখা যায়। কর্মকাণ্ডের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যও পুষ্টিলাভ করিতে থাকিল। যাগযজ্ঞাদির খুঁটিনাটি নিয়ম-প্রণালীগুলি গদ্যে লিপিবদ্ধ হইল বিশালাকার 'ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থসমূহে। এই ব্রাহ্মণগুলি অতিশয় নীরস ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাক্যে রচিত। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এইগুলি সম্বন্ধে

---

১ সাঃ দঃ ৭।৩০৯ (পাঠান্তর—'বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতম্' ।)
অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্—কাব্যাদর্শ—১।২৩

মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থের মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার বেশী ধৈর্যসহকারে পড়া যায় না। আরণ্যক ও উপনিষদ্—এই

আরণ্যক, উপনিষদ্

দুই প্রকার গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক গ্রন্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গদ্যে রচিত। 'সূত্র' যুগে পৌছিয়া আমরা গদ্যের একটি বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাই। শ্রৌত-, গৃহ্য-, ধর্ম- ও

কল্পসূত্র

শুল্বসূত্র—কল্পসূত্রের এই চারি প্রকার রচনাতেই গদ্যের ব্যবহার হইয়াছে। ইহা ছাড়া, অন্যান্য বেদাঙ্গও

অপরাপর বেদাঙ্গ

সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। এই সূত্রগুলিতে গ্রন্থকার-গণের উদ্দেশ্য ছিল যতদূর সম্ভব অল্প পরিসরে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করা। ফলতঃ টীকাটিপ্পণীর সাহায্য ছাড়া সূত্রগুলি হইয়া পড়িল দুর্বোধ্য।

মহাভারত, পুরাণ, আয়ুর্বেদ

'মহাভারতে'র কিয়দংশ গদ্যে রচিত ; 'বিষ্ণু' ও 'ভাগবত' প্রভৃতি কতক পুরাণেরও অংশবিশেষ গদ্যে রচিত। এই প্রসঙ্গে চরক ও সুশ্রুত কর্তৃক রচিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'

এতাবৎকাল পর্যন্ত যে গদ্যরচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিল, সেই গদ্য সুখপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর নহে। গদ্যরচনাবলীর ইতিহাসে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। 'বাসবদত্তা', 'সুমনোত্তরা' ও 'ভৈমরথী' নামে তিনটি গদ্য কাব্যের উল্লেখ মহাভাষ্যে আছে। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের এই বিস্তৃত ও প্রামাণ্য টীকার রচনাশৈলী হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয় যে, ঐ যুগে গদ্য-রচনার যথেষ্ট উন্নতিসাধন হইয়াছিল। মূল গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা ও ভাষ্যাদিতে যে গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়, তাহাও উচ্চ স্তরের গদ্য-রচনার পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা

শাঙ্করভাষ্য
শাবরভাষ্য
মেধাতিথিভাষ্য

ব্রহ্মসূত্রের 'শাঙ্করভাষ্য', মীমাংসাসূত্রের 'শাবরভাষ্য', মনুসংহিতার 'মেধাতিথিভাষ্য' প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারা যায়। গদ্য-রচনার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে সংস্কৃত নাটক-সমূহের গদ্যাংশের উল্লেখও করিতে হয়।

কতগুলি প্রাচীন প্রশস্তিতে কাব্যলক্ষণাক্রান্ত গদ্য-রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য গীর্ণার প্রশস্তি (আঃ ১৫০ খৃষ্টাব্দ) এবং হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি (আঃ ৩৫০ খৃষ্টাব্দ)। 'হর্ষচরিতে'র প্রারম্ভিক শ্লোকসমূহে বাণভট্ট ভট্টার হরিচন্দ্র এবং আঢ্যরাজ নামক দুইজন গদ্যকাব্য-রচয়িতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, গদ্যকাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল অতি প্রাচীন কালে এবং ইহা অনেক পরিমাণে উৎকর্ষ লাভও করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আদি গদ্য কাব্যগুলি কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রশস্তি

গদ্যকাব্যের প্রকারভেদ ও যুগবিভাগ

অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম ভাগ বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গদ্যকাব্য মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কথা ও আখ্যায়িকা। এই দুই শ্রেণীর পরস্পর ভেদ অনেক আলঙ্কারিকই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই দুই জাতীয় গদ্য-রচনার স্থূল ভেদ এই যে, 'কথা'র বিষয়বস্তু নিছক কাল্পনিক, আর 'আখ্যায়িকা'র উপজীব্য একটি এমন ঘটনা যাহার ঐতিহাসিক সত্য কিছু পরিমাণে বিদ্যমান। তবে এই ভাগ দুইটির পরস্পর ভেদ যে প্রাচীন কালেই তেমনভাবে মানা হইত না তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দণ্ডী (আঃ ৮ম শতাব্দী)। তিনি বলিয়াছেন—কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ, সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা ; অর্থাৎ এক জাতীয় সাহিত্যেরই এই দুইটি সংজ্ঞামাত্র।

কথা

আখ্যায়িকা

ইংরেজী নামকরণ করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ সমগ্র সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যকে fable, romance ও tale—এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। আমরা নিম্নলিখিতরূপে ভাগগুলি করিয়া লইতে পারি :—

Fable, Romance, Tale

(১) নীতিমূলক সাহিত্য

(২) ঐতিহাসিক রচনা

(৩) রমন্যাস (romance)

(৪) গল্প।

কালিদাসের গদ্যরচনা কিছু নাই বটে, তথাপি তাঁহাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া গদ্য কাব্যের প্রাক্‌-কালিদাস যুগ ও কালিদাসোত্তর যুগ—এই দুইটি বিভাগ করিলে গদ্যকাব্যের ক্রমবিকাশের ধারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

প্রাক্‌-কালিদাস যুগের গদ্য

এই যুগের গদ্যরচনাগুলি নীতিমূলক এবং দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) অবদানগ্রন্থ, (খ) পশুপাখীর গল্প।

(ক) অবদান গ্রন্থাবলী

বিষয়বস্তু ও রচনাপ্রণালী

জাতকের গল্পের ন্যায় অবদান গ্রন্থসমূহেও বোধিসত্ত্বের বিগত জীবনগুলির মহীয়সী কীর্তির বিবরণ পাওয়া যায়। মানবজীবনে কর্মফল, ও বুদ্ধ এবং তন্মতাবলম্বী মহাপুরুষদের প্রতি ভক্তি দ্বারা কঠোর কর্মফল হইতে অব্যাহতির উপায়—ইহা বোঝানই অবদানগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাদের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গদ্যের সঙ্গে গাথা ও অন্যান্য প্রকারের শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অবদানশতক

রচনাকাল

এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে বোধ হয় 'অবদানশতক'ই প্রাচীনতম। ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা দুই একটি অনুমান করিতে পারি মাত্র। ইহাতে প্রচলিত মুদ্রা হিসাবে 'দীনার'-এর উল্লেখ হইতে মনে হয়, ইহা খৃষ্টীয় ১০০ অব্দের পূর্বে রচিত হয় নাই। খৃঃ তৃতীয় শতকে ইহা চীন দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়—সুতরাং, এই গ্রন্থ এই যুগের পরের রচনাও হইতে পারে না।

দিব্যাবদান, মহাবস্তু ও ললিতবিস্তর—রচনাকাল

এই শ্রেণীর অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'দিব্যাবদান'। এই গ্রন্থে কুমারলাতের 'কল্পনামণ্ডিতিকা'র বহুল ব্যবহারের নিদর্শন হইতে মনে হয়, ইহার রচনাকাল খৃঃ ১ম শতকের পূর্বে হইতে পারে না। এই গ্রন্থের সম্ভবতঃ সমসাময়িক অপর একটি গ্রন্থ 'মহাবস্তু' নামে খ্যাত। 'ললিতবিস্তর' শ্লোকবহুল গদ্যে রচিত এই জাতীয় আর একটি গ্রন্থ।

(খ) পশুপাখীর গল্প

এই জাতীয় গল্প ভারতবর্ষে কখন উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ঋগ্বেদের ভেক-সূক্তে (৭।১০৩), ব্রাহ্মণের শুনঃশেপের আখ্যানে বা উপনিষদের সারমেয়ের আখ্যানে (ছান্দোগ্য ১।১২) পশুপাখী প্রভৃতি ইতর প্রাণী লইয়া গল্প পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের গল্পগুলিতে যেমন একটি নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য নিহিত আছে ঠিক তেমন উদ্দেশ্য বৈদিক যুগের উল্লিখিত গল্পগুলিতে পাওয়া যায় না; ঐগুলি প্রায়শঃই allegory (রূপক) বা satire (ব্যঙ্গরচনা)।

ঋগ্বেদ
ব্রাহ্মণ
উপনিষদ্

পূর্ববর্ত্তী যুগের ঐরূপ রচনাগুলি পরবর্ত্তী যুগের পশুপাখীর গল্পের অগ্রদূত হয়ত ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী কালের রচনাবলীর পরিবেশ ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে আলোচ্য গল্পগুলি রাজপুত্রদের বাল্যাবস্থায় নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল—ইহা 'পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্' হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। পশুপাখীতে মানুষের আচার ব্যবহার আরোপিত করিয়া বালকের চিত্তাকর্ষক গল্পের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই জাতীয় সাহিত্যের লক্ষ্য। নীতি প্রধানতঃ দ্বিবিধ—রাজনীতি ও বাস্তব-জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা-প্রসূত নীতি।

পরবর্ত্তী গল্পের পরিবেশ ও উদ্দেশ্য

এই জাতীয় গল্পের একমাত্র নিদর্শন 'পঞ্চতন্ত্র'। নামটির সার্থকতা এই যে, ইহাতে পাঁচটি বিশিষ্ট ভাগ রহিয়াছে—(১) মিত্রভেদ, (২) মিত্রপ্রাপ্তি, (৩) সন্ধি-বিগ্রহ, (৪) লব্ধনাশ ও (৫) অপরীক্ষিতকারিত্ব। 'পঞ্চতন্ত্রে'র রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি ভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ সমস্ত ভাগ একটি কাঠামোর অন্তর্গত। ইহাও লক্ষণীয় যে, প্রতিটি ভাগের মধ্যে যে একটি গল্প রহিয়াছে তাহা নহে; বহু ছোট ছোট গল্প প্রধান গল্পটির মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি গদ্যে রচিত হইলেও মাঝেমাঝে নীতিগর্ভ শ্লোক আছে এবং এক একটি গল্পের উপসংহারে সেই সেই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি শ্লোকাকারে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পঞ্চতন্ত্র

দুঃখের বিষয় এই যে, এমন একটি উপাদেয় গ্রন্থ, অপর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ন্যায়, বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই 'পঞ্চতন্ত্র' এখন নানারূপে পাওয়া যায়। 'পঞ্চতন্ত্রে'র বিভিন্ন প্রধান রূপগুলিকে পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন :—

মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত ও বর্তমান রূপ
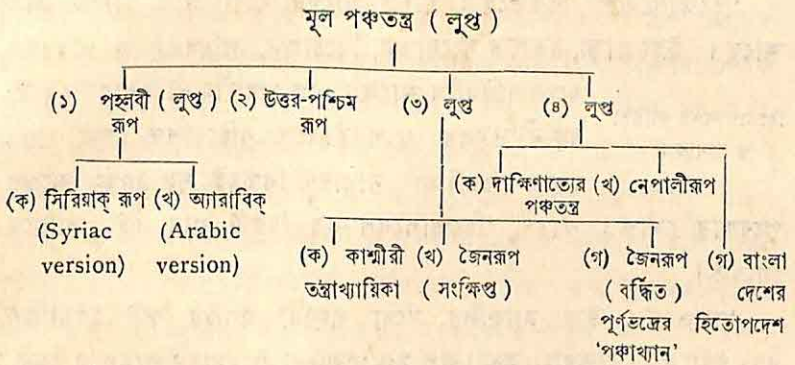
'পঞ্চতন্ত্রে'র বর্তমান বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'কে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংস্কৃত রূপ বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাঁহাদের মতে, ইহাতেই মূল 'পঞ্চতন্ত্রে'র স্বরূপ সমধিক রক্ষিত হইয়াছে। এই গোষ্ঠীর অপর দুই শাখাতে, অর্থাৎ 'সংক্ষিপ্ত' ও 'বর্দ্ধিত' রূপে, মূল বিষয়বস্তুর বিকৃতি বহুল পরিমাণে ঘটিয়াছে। অধুনা-লুপ্ত পহ্লবীরূপের মাধ্যমেই এই গ্রন্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে য়ুরোপের fable সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম রূপটি কাশ্মীরী লেখক ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেবের উপজীব্য; ইহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যথাক্রমে 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তে ও 'কথাসরিৎসাগর'-এ গল্পগুলিকে পরিবর্তিতরূপে সন্নিবেশিত করেন।

তন্ত্রাখ্যায়িকা

দাক্ষিণাত্যের রূপটি সংক্ষিপ্ত এবং ইহাতে একটি নূতন গল্প (মেষপালিকা ও তাহার প্রেমিকবৃন্দ) সংযোজিত হইয়াছে। এই রূপের কতক উপরূপও (sub-version) রহিয়াছে।

নেপালীরূপে কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, শ্লোকগুলিই মাত্র লিপিবদ্ধ আছে, আবার কোন ক্ষেত্রে গদ্য পদ্য দুইই আছে। 'হিতোপদেশ' ও নেপালীরূপের উপজীব্য এক—ইহা মনে করার একটি প্রধান কারণ এই যে, এই দুই রূপেই প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ক্রম-বিপর্যয় দেখা যায়।

হিতোপদেশ

'হিতোপদেশে' 'পঞ্চতন্ত্রে'র পাঁচটি ভাগের মধ্যে মাত্র চারিটি ভাগ আছে। ইহা ছাড়া, ইহাতে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 'কামন্দকীয় নীতিসার' হইতে বহু নীতিমূলক অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ইহার রচয়িতা নারায়ণ নিশ্চয়ই খৃঃ ১৩৭৩ অব্দের পূর্বেকার লোক; কারণ, 'হিতোপদেশ'-এর একটি পুথি এই তারিখে লিখিত।

হিতোপদেশের রচয়িতা ও রচনাকাল

'পঞ্চতন্ত্রে'র উক্ত রূপগুলির মধ্যে পহ্লবী রূপটির সৃষ্টি হইয়াছিল ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং, অধুনা-লুপ্ত মূল 'পঞ্চতন্ত্র' ঐ সময়ের পূর্বেকার রচনা, কত পূর্বের তাহা অবশ্য অনির্ণেয়। মূল গ্রন্থের রচয়িতা কে তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 'কথামুখে' যে বিষ্ণুশর্মার উল্লেখ আছে, তাহা অনেক আধুনিক পণ্ডিতের মতে কাল্পনিক নাম। মূলটি ভারতের কোন্ অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল এই বিষয়ে কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই—কেহ বলেন কাশ্মীরে, কেহ বলেন গৌড়ে; আবার অন্যপ্রকার মতও দেখা যায়।

মূল পঞ্চতন্ত্রের রচনাকাল ও উৎপত্তিস্থল

কালিদাসোত্তর যুগের গদ্য

এই যুগের গদ্যরচনাগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) ঐতিহাসিক রচনা

(২) রমন্যাস (Romance)

(৩) গল্প।

(১) ঐতিহাসিক রচনা

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' একমাত্র ঐতিহাসিক গদ্যরচনা। গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক কতকগুলি শ্লোকে ভাস, কালিদাস প্রভৃতি পূর্ববর্ত্তী আদর্শ কবিগণের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। গ্রন্থটি আটটি উচ্ছ্বাসে[১] বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। প্রথম উচ্ছ্বাসে বাণ নিজের বংশাবলী বর্ণনা করিয়া নিজের যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে হর্ষবর্দ্ধনের আদেশে তাঁহার সভায় বাণের আগমন, রাজার অশ্বের বর্ণনা প্রভৃতি আছে। তৃতীয় উচ্ছ্বাসে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাণ কিরূপে স্বজনদের নিকট রাজা হর্ষ ও স্থাণ্বীশ্বরের বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন, তাহাই লিখিত আছে। চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে প্রধান বর্ণিত বিষয়গুলি পুষ্পভূতি নামক রাজা হইতে মহান্ রাজবংশের উদ্ভব, প্রভাকরবর্দ্ধনের কার্যকলাপ, রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষ ও রাজ্যশ্রীর জন্মবৃত্তান্ত, গ্রহবর্মার সহিত রাজ্যশ্রীর পরিণয়, হূণদের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্দ্ধনের অভিযান, প্রভাকরের মৃত্যু, মালবরাজ কর্ত্তৃক গ্রহবর্মার হত্যা ও রাজ্যশ্রীর কারারোধ, গৌড়রাজকর্ত্তৃক রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা প্রভৃতি। সপ্তম উচ্ছ্বাসে বর্ণিত হইয়াছে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে হর্ষের যুদ্ধযাত্রা, প্রাগ্-জ্যোতিষের রাজা কর্ত্তৃক হর্ষের নিকট প্রেরিত উপঢৌকন, রাজ্যবর্দ্ধন কর্ত্তৃক পরাজিত মালবরাজের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ ভণ্ডীর সহিত হর্ষের সাক্ষাৎকার, হর্ষকর্ত্তৃক রাজ্যশ্রীর বিন্ধ্যপর্বতে গমনের সংবাদপ্রাপ্তি, গৌড়রাজের বিরুদ্ধে ভণ্ডীকে প্রেরণ এবং হর্ষ কর্ত্তৃক স্বয়ং রাজ্যশ্রীর উদ্ধারার্থে গমন প্রভৃতি। অষ্টম উচ্ছ্বাসের বিষয়বস্তু বিন্ধ্যপর্বতে হর্ষকর্ত্তৃক রাজ্যশ্রীর অন্বেষণ ও মরণোন্মুখী ভগ্নীর উদ্ধার। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে একটি আগতপ্রায় রাত্রির বর্ণনা চলিতে থাকিলে গ্রন্থটি অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কবিকল্পনা ও কবিসুলভ অতিরঞ্জন প্রভৃতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। মনে হয়, ইতিহাস অপেক্ষা, সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে বিদগ্ধজনের চিত্তাকর্ষক একটি কাব্যরচনাই কবির উদ্দেশ্য।

১ অধ্যায়ের নাম উচ্ছ্বাস।

নেপালীরূপে কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, শ্লোকগুলিই মাত্র লিপিবদ্ধ আছে, আবার কোন ক্ষেত্রে গদ্য পদ্য দুইই আছে। 'হিতোপদেশ' ও নেপালীরূপের উপজীব্য এক—ইহা মনে করার একটি প্রধান কারণ এই যে, এই দুই রূপেই প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ক্রম-বিপর্যয় দেখা যায়।

হিতোপদেশ

'হিতোপদেশে' 'পঞ্চতন্ত্রে'র পাঁচটি ভাগের মধ্যে মাত্র চারিটি ভাগ আছে। ইহা ছাড়া, ইহাতে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 'কামন্দকীয় নীতিসার' হইতে বহু নীতিমূলক অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ইহার রচয়িতা নারায়ণ নিশ্চয়ই খৃঃ ১৩৭৩ অব্দের পূর্বেকার লোক; কারণ, 'হিতোপদেশ'-এর একটি পুথি এই তারিখে লিখিত।

হিতোপদেশের রচয়িতা ও রচনাকাল

'পঞ্চতন্ত্রে'র উক্ত রূপগুলির মধ্যে পহ্লবী রূপটির সৃষ্টি হইয়াছিল ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং, অধুনা-লুপ্ত মূল 'পঞ্চতন্ত্র' ঐ সময়ের পূর্বেকার রচনা, কত পূর্বের তাহা অবশ্য অনির্ণেয়। মূল গ্রন্থের রচয়িতা কে তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 'কথামুখে' যে বিষ্ণুশর্মার উল্লেখ আছে, তাহা অনেক আধুনিক পণ্ডিতের মতে কাল্পনিক নাম। মূলটি ভারতের কোন্ অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল এই বিষয়ে কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই—কেহ বলেন কাশ্মীরে, কেহ বলেন গৌড়ে; আবার অন্যপ্রকার মতও দেখা যায়।

মূল পঞ্চতন্ত্রের রচনাকাল ও উৎপত্তিস্থল

কালিদাসোত্তর যুগের গদ্য

এই যুগের গদ্যরচনাগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) ঐতিহাসিক রচনা

(২) রমন্যাস (Romance)

(৩) গল্প।

(১) ঐতিহাসিক রচনা

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' একমাত্র ঐতিহাসিক গদ্যরচনা। গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক কতকগুলি শ্লোকে ভাস, কালিদাস প্রভৃতি পূর্ববর্তী আদর্শ কবিগণের গুণকীর্তন করিয়াছেন। গ্রন্থটি আটটি উচ্ছ্বাসে[১] বর্তমানে পাওয়া যায়। প্রথম উচ্ছ্বাসে বাণ নিজের বংশাবলী বর্ণনা করিয়া নিজের যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে হর্ষবর্দ্ধনের আদেশে তাঁহার সভায় বাণের আগমন, রাজার অশ্বের বর্ণনা প্রভৃতি আছে। তৃতীয় উচ্ছ্বাসে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাণ কিরূপে স্বজনদের নিকট রাজা হর্ষ ও স্থাণ্বীশ্বরের বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন, তাহাই লিখিত আছে। চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে প্রধান বর্ণিত বিষয়গুলি পুষ্পভূতি নামক রাজা হইতে মহান্ রাজবংশের উদ্ভব, প্রভাকরবর্দ্ধনের কার্যকলাপ, রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষ ও রাজ্যশ্রীর জন্মবৃত্তান্ত, গ্রহবর্মার সহিত রাজ্যশ্রীর পরিণয়, হূণদের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্দ্ধনের অভিযান, প্রভাকরের মৃত্যু, মালবরাজ কর্তৃক গ্রহবর্মার হত্যা ও রাজ্যশ্রীর কারারোধ, গৌড়রাজকর্তৃক রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা প্রভৃতি। সপ্তম উচ্ছ্বাসে বর্ণিত হইয়াছে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে হর্ষের যুদ্ধযাত্রা, প্রাগ্-জ্যোতিষের রাজা কর্তৃক হর্ষের নিকট প্রেরিত উপঢৌকন, রাজ্যবর্দ্ধন কর্তৃক পরাজিত মালবরাজের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ ভণ্ডীর সহিত হর্ষের সাক্ষাৎকার, হর্ষকর্তৃক রাজ্যশ্রীর বিন্ধ্যপর্বতে গমনের সংবাদপ্রাপ্তি, গৌড়রাজের বিরুদ্ধে ভণ্ডীকে প্রেরণ এবং হর্ষ কর্তৃক স্বয়ং রাজ্যশ্রীর উদ্ধারার্থে গমন প্রভৃতি। অষ্টম উচ্ছ্বাসের বিষয়বস্তু বিন্ধ্যপর্বতে হর্ষকর্তৃক রাজ্যশ্রীর অন্বেষণ ও মরণোন্মুখী ভগ্নীর উদ্ধার। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে একটি আগতপ্রায় রাত্রির বর্ণনা চলিতে থাকিলে গ্রন্থটি অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কবিকল্পনা ও কবিসুলভ অতিরঞ্জন প্রভৃতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। মনে হয়, ইতিহাস অপেক্ষা, সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে বিদগ্ধজনের চিত্তাকর্ষক একটি কাব্যরচনাই কবির উদ্দেশ্য।

১ অধ্যায়ের নাম উচ্ছ্বাস।

'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বং' প্রভৃতি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়া দেশীয় সমালোচকগণ বাণকে অতি উচ্চস্তরের লেখক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য কাব্যরসিকগণের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বাণভট্ট খুব উঁচুদরের কবি নহেন; তাঁহাদের মতে তিনি কঠিন কঠিন শব্দের ও দীর্ঘসমাসবহুল পদের প্রয়োগ করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য জাহির করিয়াছেন মাত্র এবং ফলে তাঁহার গ্রন্থপাঠে লোকের মনোরঞ্জন দূরের কথা, বরঞ্চ তাহাদের ক্লান্তি ও বিরক্তিই বোধ হয়। বাণভট্টের রচনাশৈলীর ভালমন্দ বিচারে নিরপেক্ষ মত দিতে হইলে বলা যায় যে, বাণভট্টের সুকবি-খ্যাতি তৎকালের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও রুচির উপর নির্ভরশীল। যে দীর্ঘ সমাসাদি বর্ত্তমান রুচিতে বিরক্তিকর, সেই সমস্তই তৎকালে প্রশংসার বিষয় ছিল। দণ্ডী বলিয়াছেন, 'ওজঃসমাসভূয়স্ত্বমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্' (কাব্যাদর্শ—১৷৮০)। বর্ত্তমান যুগে বাণভট্টের প্রতি যে কটাক্ষ, তাহার জন্য বহু শতাব্দীর ব্যবধানজনিত রুচি-পরিবর্ত্তনই দায়ী। এই কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, শব্দের ঝঙ্কারে, বর্ণনার বাস্তবতায় ও কল্পনার গরিমায় বাণের গ্রন্থ সংস্কৃতসাহিত্যগগনে ভাস্বর সূর্য।

সাহিত্যিক বিচার

বাণভট্টের জীবনী সম্বন্ধে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার 'হর্ষচরিতে'র প্রথম দুই অধ্যায়ে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রায় অর্দ্ধাংশ পর্যন্ত আমরা অনেক তথ্য পাই। চিত্রভানু ও রাজ্যদেবীর পুত্র বাণ বাল্যাবস্থায় মাতা-পিতৃহীন হইয়া অসৎসঙ্গে পড়েন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, তিনি হর্ষবর্দ্ধনের আদেশক্রমে রাজসভায় যান। ইহাতে তাঁহার জীবনে মহা পরিবর্ত্তন ঘটে। কালক্রমে তিনি সুকবি-খ্যাতি অর্জন করেন। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৭ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং, বাণভট্ট ঐ সময়েরই লেখক ছিলেন, ইহা নিশ্চিত।

বাণভট্টের জীবনী ও কাল

(২) রমন্যাস

এই জাতীয় সাহিত্যের আলোচনায় দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' অগ্রগণ্য।

শুনিতে একটু অদ্ভুত মনে হয় যে, 'দশকুমারচরিতে' দশটির স্থলে রাজবাহন প্রভৃতি মাত্র আটজন রাজপুত্রের কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের নামের সার্থকতার জন্য 'পূর্বপীঠিকা' নামক আদ্য অংশে অপর দুইটি রাজপুত্রের কীর্ত্তিকাহিনীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 'বিশ্রুত' নামক একটি রাজকুমারের গল্প 'উত্তরপীঠিকা' নামে উপসংহারাংশে সংযোজিত হইয়াছে। নানা কারণে, পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকাকে পণ্ডিতগণ পরবর্ত্তী কোন লেখকের রচনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত'

পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা

'অবন্তিসুন্দরীকথা' নামক একটি গ্রন্থকে দণ্ডীর রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন; তাঁহাদের মতে, ইহাই 'দশকুমারচরিতে'র লুপ্ত আদ্য অংশ। 'অবন্তিসুন্দরীকথাসার' নামে ইহার ছন্দোবদ্ধ রূপও আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'অবন্তিসুন্দরীকথা' দণ্ডীর রচিত হইতে পারে না।

অবন্তিসুন্দরীকথা

'দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্' ভারতীয় পণ্ডিত সমাজে দণ্ডী সম্বন্ধে সুপ্রচলিত প্রশংসাবাণী। দণ্ডীর ভাষার পরিপাট্য ও সুললিত শব্দবিন্যাস যথার্থই প্রশংসার্হ। স্থানে স্থানে দীর্ঘসমাসবহুল বাক্যের প্রয়োগে অর্থবোধ দুরূহ হয় বটে, কিন্তু গ্রন্থের কাব্যরস উপভোগ্য। দণ্ডীর রচনা বৈদর্ভী রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সাধারণ আখ্যানকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া উহাকে সরস ভাষায় মণ্ডিত করা দণ্ডীর কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাৎকালিক সমাজের চিত্রটিও এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্র-চিত্রণে, হাস্যরসের সৃষ্টিতে ও রচনার কৌশলে দণ্ডী গদ্যকাব্যলেখকগণের শীর্ষস্থানীয়।

সাহিত্যিক বিচার

দণ্ডীর জীবনকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন মতগুলি এইরূপ :—

দণ্ডীর জীবনকাল

(১) এই দণ্ডী ও 'কাব্যাদর্শ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থের রচয়িতা দণ্ডী অভিন্ন। 'কাব্যাদর্শ' প্রণেতা দণ্ডীকে রাজা প্রবরসেনের পরবর্ত্তী লেখক বলিয়া মনে করা হয়। 'রাজতরঙ্গিণী'র সাক্ষ্য-অনুসারে প্রবরসেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পরবর্ত্তী

(২) দণ্ডীর সঙ্গে আলঙ্কারিক ভামহের কালানুক্রমিক সম্বন্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে ভীষণ বিতর্কের বিষয়। কেহ বলেন, দণ্ডী ভামহের মতের সমালোচনা করিয়াছেন, আবার কেহ বিপরীত মতও পোষণ করিয়া থাকেন। ভামহের সময় আঃ অষ্টম শতাব্দী বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন।

(৩) কেহ কেহ মনে করেন যে, দণ্ডী নিশ্চয়ই 'ভট্টিকাব্যে'র সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভট্টির কাল আঃ ৭ম শতাব্দী ; সুতরাং, দণ্ডীর কাল ইহার পরে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী

উল্লিখিতরূপ মতবিরোধ থাকিলেও, দণ্ডীকে সাধারণতঃ খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর লেখক বলিয়া মনে করা হয়।

দণ্ডী দাক্ষিণাত্যবাসী

'কাব্যাদর্শ' ও 'দশকুমারচরিতে'র আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে দণ্ডী দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'

সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' এই জাতীয় অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। রাজকুমার কন্দর্পকেতু এবং রাজকুমারী বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু। কন্দর্পকেতু রাত্রিতে স্বপ্নে বাসবদত্তাকে দেখেন এবং তাঁহার অন্বেষণে যাত্রা করেন। এদিকে বাসবদত্তাও তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া রাজকুমারের অন্বেষণে একজনকে প্রেরণ করেন। পথে কন্দর্পকেতু এক বিহগ-দম্পতী হইতে বাসবদত্তার কথা জানিতে পারেন। ভ্রমণ করিতে করিতে রাজকুমার পাটলিপুত্রে আসেন। সেখানে বাসবদত্তার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল বটে, কিন্তু বাসবদত্তার পিতা তাঁহাকে পাত্রান্তরে সমর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর, তাঁহারা উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিন্ধ্যপর্বতে প্রস্থান করেন। একদিন প্রভাতে জাগরিত হইয়া রাজকুমারীকে কন্দর্পকেতু দেখিতে পাইলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর, তিনি বাসবদত্তাকে এক মুনির আশ্রমে পাইলেন ; কিন্তু রাজকুমারী তখন শিলায় পরিণতা। রাজকুমারের স্পর্শে তিনি পুনর্জীবিতা হন।

সুবন্ধুর রচনা সেকালে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল ; ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত সমালোচকোক্তিতে পাওয়া যায় :—

সাহিত্যিক বিচার

সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা ॥

নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে, বিশেষতঃ অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বিরোধাভাস প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগে, সুবন্ধুর রচনা মনোজ্ঞ, সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য সমালোচক Keith লেখক সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সুবন্ধুর প্রচ্ছন্ন প্রশংসা লক্ষণীয়।

সুবন্ধুর কাল

'কাদম্বরী'তে বাসবদত্তার উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, সুবন্ধু বাণের পূর্ববর্তী। 'বাসবদত্তা'তে[১] লেখক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন —ইহা হইতে কেহ কেহ সুবন্ধুকে গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লেখক মনে করেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে, 'বাসবদত্তা'তে গ্রন্থকার নৈয়ায়িক উদ্যোতকরের ও ধর্মকীর্ত্তির 'বৌদ্ধসঙ্গত্যলঙ্কার' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতই যদি উক্ত ব্যক্তি ও বৌদ্ধগ্রন্থের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে সুবন্ধুকে খৃঃ সপ্তম শতকের প্রারম্ভকালের লেখক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বাণভট্টের 'কাদম্বরী' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রমন্যাস। তিনি ইহার পূর্ব ভাগটি রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র পুলিন্দ বা ভূষণভট্ট অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করেন।

বাণভট্টের 'কাদম্বরী'

ইহজীবনে এবং বিগত জীবনসমূহে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রেমের কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এই মূল আখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয়োপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মহাশ্বেতার প্রণয়-ক্লিষ্ট পুণ্ডরীক কর্তৃক অভিশপ্ত চন্দ্রমা মর্ত্ত্যে চন্দ্রাপীড় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধর্বরাজকুমারী কাদম্বরীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হন। আবার, চন্দ্রমার শাপে পুণ্ডরীক চন্দ্রাপীড়ের সখা বৈশম্পায়ন রূপে

---

১ প্রারম্ভিক দশম শ্লোকে

জাত হন। বর্ত্তমান জন্মে চন্দ্রাপীড় রাজা শূদ্রক ও বৈশম্পায়ন শুক আকারে জন্মগ্রহণ করেন।

এই কাহিনী অবলম্বনে বাণভট্ট অদ্ভুত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কল্পনার বিচিত্র রঙে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোজ্ঞ বর্ণনায়, প্রেমিক প্রেমিকার চিত্তের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও চরিত্র-চিত্রণে বাণভট্ট গদ্যকাব্য-রচয়িতৃগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। বাণের শব্দ-সম্পদ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শিতা তাঁহার যশোভাণ্ডারের অতুলনীয় রত্ন। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের যদি এই একটি মাত্র গ্রন্থই থাকিত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষ গদ্যরচনার গর্ব করিতে পারিত। প্রাচীন ভারতীয় সমালোচকগণের মতে, গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি; অর্থাৎ, গদ্যরচনাতে কবির রচনাশক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষায় বাণভট্ট কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাণের এই গ্রন্থ যে এককালে ভারতবর্ষে পণ্ডিতগণের একান্ত প্রিয় হইয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত উক্তি :—

সাহিত্যিক বিচার

কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে। বর্ত্তমান যুগে, আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে, বাণের ভাষা দুরূহশব্দবহুল, বাক্যগুলি এত বিরাট যে এক নিঃশ্বাসে পড়া যায় না এবং গল্পসমূহের অনুপ্রবেশ হেতু স্থানে স্থানে মূল উপাখ্যানের সূত্র হারাইয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য সমালোচক Weber বলিয়াছেন যে, বাণের গদ্য একটি মহারণ্য; ইহাতে পথিককে ঝোপ ঝাড় কাটিয়া কাটিয়া অগ্রসর হইতে হয় এবং এইভাবে কিছুদূর যাইয়া সে দুরূহ শব্দরূপ হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হইয়া ভয়াতুর হইয়া পড়ে।

Weber-এর এই উক্তি বর্ত্তমান রুচিতে সমর্থনীয় হইতে পারে। কিন্তু, আমাদের ভুলিয়া যাওয়া সমীচীন নহে যে, রাজার সাহায্যপুষ্ট কবি শান্তিময় পরিবেশে বসিয়া যে যুগের পাঠকের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সে-যুগ বহু শতাব্দী পূর্বে অতীত হইয়াছে।[১]

বাণভট্টের জীবনী ও কাল

'হর্ষচরিত' প্রসঙ্গে বাণভট্টের জীবনী ও জীবনকালের কথা বলা হইয়াছে।

১ 'কাদম্বরী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীনসাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

(৩) গল্প

সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা বা বিক্রম-চরিত

'সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা' এই জাতীয় একখানি সুবিদিত গ্রন্থ। ইহার অপর নাম 'বিক্রম-চরিত'।

এই গ্রন্থখানি বত্রিশটি গল্পের সমষ্টি। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনটি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া ভোজরাজের হস্তগত হইল। ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলে, যে বত্রিশটি পুত্তলিকার উপরে সিংহাসনটি স্থাপিত ছিল তাহারা প্রত্যেকে এক একটি গল্পে বিক্রমাদিত্যের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকে। গল্পগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে, বিক্রমাদিত্যের ন্যায় গুণসম্পন্ন না হইয়া এই সিংহাসনে কেহ বসিবার উপযুক্ত হইতে পারে না।

মূল গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত; বর্ত্তমান রূপ

মূলগ্রন্থটি অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। ইহা নিম্নলিখিত রূপে এখন পাওয়া যাইতেছে ঃ—
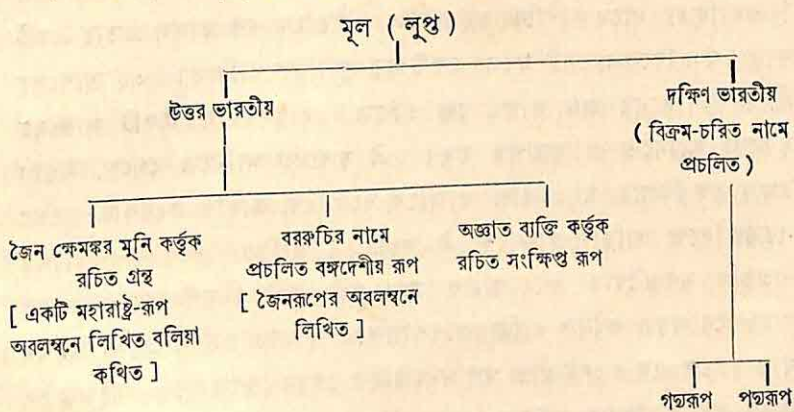
সাহিত্যিক বিচার

গ্রন্থটি অতিশয় জনপ্রিয়। তবে, গল্পগুলি প্রায়শঃই বৈচিত্র্যহীন এবং নৈতিক উপদেশের আধিক্য হেতু পাঠকের বিরক্তিজনক

মূলগ্রন্থের রচয়িতা ও রচনাকাল

এই গ্রন্থের রচয়িতা অজ্ঞাত এবং রচনাকালও নিশ্চিতভাবে অনির্ণেয়। জৈন এবং দক্ষিণ ভারতীয় রূপে হেমাদ্রির 'চতুর্বর্গচিন্তামণি' নামক গ্রন্থের উল্লেখ

হইতে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ইহা সম্ভবতঃ খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই।

'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'

'বেতালপঞ্চবিংশতি' গদ্য-গল্পের অন্যতম গ্রন্থ। ইহাতে পঁচিশটি গল্প মূল গল্পটিতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে; এই পঁচিশটি গল্প বর্ত্তমানে চারিটি আকারে পাওয়া যায়।

(১) শিবদাস-কথিত—ইহাতে গদ্যের সহিত শ্লোকের সংমিশ্রণ আছে।
(২) জম্ভলদত্ত-রচিত—ইহাতে নীতি শ্লোক নাই।
(৩) বল্লভদাসকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ।
(৪) অজ্ঞাত লেখকের রচিত রূপ।

ত্রিবিক্রমসেন বা বিক্রমসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি পরবর্ত্তীকালে বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহাকে এক তাপস প্রত্যহ একটি করিয়া ফল দিতেন, সেই ফলে একটি রত্ন লুকায়িত থাকিত। এই তাপসের প্রীতি-উৎপাদনের জন্য রাজা বৃক্ষ হইতে দোদুল্যমান একটি মানুষের মৃতদেহ আনিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ঐ মৃতদেহ আনিতে গেলে, উহার রক্ষক এক পিশাচ বা বেতাল রাজাকে বলে যে, তাহার কয়েকটি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলে রাজাকে ঐ দেহটি সে ছাড়িয়া দিবে। বেতালের প্রশ্নগুলি সব ধাঁধা। ধাঁধাগুলির মধ্যে দুই একটির নিদর্শন দেওয়া গেল। অন্নভক্ষণে প্রবৃত্ত জনৈক ব্যক্তি ঘ্রাণশক্তিদ্বারা বুঝিতে পারিল যে, ঐ অন্ন যে ধান্য হইতে প্রস্তুত সেই ধান্য শ্মশান-সন্নিহিত কোন ক্ষেত্রে জাত; এইজন্য সে ভক্ষণ হইতে বিরত হইল। এক ব্যক্তি দিব্য সুকোমল শয্যোপকরণের বহুস্তরের নীচে একটি কেশখণ্ড থাকা হেতু তাহাতে শয়ন করিতে পারিল না। এই ভোজন-বিলাসী ও শয্যা-বিলাসীর মধ্যে কে অধিকতর বিলাসী? কে সর্বাধিক প্রেমিক—যে প্রিয়ার মৃতদেহের সঙ্গে একই শ্মশানানলে নিজেকে দগ্ধ করে, না যে প্রিয়ার শ্মশান-প্রান্তে কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় শোকাকুল জীবন যাপন করে, অথবা যে ঘটনাক্রমে প্রাপ্ত মন্ত্রদ্বারা মৃতা প্রিয়াকে পুনর্জীবিত করে?

'বৃহৎকথা'র কাশ্মীরী দুইটি রূপেই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র গল্পগুলির প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু 'বৃহৎকথা'র নেপালীরূপে ইহাদের সন্ধান মিলে না। সুতরাং, ঐ গ্রন্থই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র উপজীব্য, এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। লেখকের মৌলিকতা থাকুক বা না থাকুক, ইহা অবিসংবাদিত যে, গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক, বৈচিত্র্যময় ও অনেক ক্ষেত্রে হাস্যরসপ্রধান। এইগুলিতে খাঁটি লোকসাহিত্যের ছাপ রহিয়াছে।

সাহিত্যিক মূল্য

'শুকসপ্ততি'

গন্থ-গল্পের অপর একখানি গ্রন্থের নাম 'শুকসপ্ততি'। এই গ্রন্থটির তিনটি রূপ বর্তমানে পাওয়া যাইতেছে :—

তিনটি বর্ত্তমান রূপ

(১) Simplicitor বা সংক্ষিপ্ত রূপ—জনৈক জৈনধর্মাবলম্বী ব্যক্তি কর্তৃক রচিত।

(২) Ornatior বা বর্দ্ধিত রূপ—চিন্তামণি ভট্ট কৃত।

(৩) দেবদত্তকৃত।

এক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাঁহার পত্নী অন্য ব্যক্তির প্রতি আসক্তা হইয়া গৃহত্যাগের উপক্রম করিলে, অনুপস্থিত ব্যক্তির পালিত শুকপাখীটি একাদিক্রমে সত্তরটি গল্প বলিয়া ঐ পত্নীর কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া রাখে; ইতিমধ্যে তাঁহার পতি প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে বিশ্বস্ত শুকপাখীর কৌশলে তাহার প্রভু মহা অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি পান। সংক্ষেপে ইহাই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। গল্পগুলি নিপুণভাবে লিখিত। সংক্ষিপ্ত রূপের লেখক অপেক্ষা বর্দ্ধিত রূপের রচয়িতার রচনাকৌশলের প্রতি লক্ষ্য অধিকতর। ইহাও সংস্কৃত গদ্যে রচিত লোকসাহিত্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এই গ্রন্থের বর্দ্ধিত রূপের রচয়িতা চিন্তামণি সম্ভবতঃ খৃঃ দ্বাদশ শতকের পূর্বেকার লোক নহেন। সংক্ষিপ্ত রূপটিতে প্রাকৃত শ্লোক থাকায়, কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা সম্ভবতঃ প্রাকৃতে রচিত কোন মূলগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

রচনাকাল

সাধারণ গদ্যসাহিত্য

এ পর্যন্ত যে গদ্যসাহিত্যের আলোচনা করা গেল, তাহাই সংস্কৃত গদ্য কাব্যের গৌরব। উক্ত গ্রন্থাবলী ব্যতীতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং সাধারণ বহু গদ্যকাব্য পাওয়া গিয়াছে। তবে, এগুলি তেমন প্রসিদ্ধ নয় এবং ইহাদের রচনাশৈলী বা বিষয়বস্তু তত উৎকৃষ্ট নয়। বস্তুতঃ, বাণভট্টের পরবর্ত্তী গদ্য-সাহিত্যে যেন কবি-প্রতিভা ক্রমক্ষীয়মাণ। এইজন্যই বাণভট্টোত্তর যুগের গদ্যকাব্যকে ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ 'decadent prose' (ক্ষয়িষ্ণু গদ্য) আখ্যা দিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা সাধারণ রচনাগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর ও প্রসিদ্ধতর রচনাগুলির একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

গ্রন্থনাম [বর্ণানুক্রমে লিখিত]	রচয়িতার নাম ও কাল	সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু
কথার্ণব	শিবদাস [কাল অজ্ঞাত]	প্রধানতঃ মূর্খ ও তস্করের পঁয়ত্রিশটি গল্প
কথাকোষ	বর্দ্ধমান স্থরি	নলোপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত
কথারত্নাকর	হেমবিজয়গণি (আঃ খৃঃ ১৭শ শতাব্দী	মূর্খ ও দুষ্ট ব্যক্তি এবং ধূর্ত্ত নারীগণ সম্বন্ধে ২৫৮টি বিবিধ গল্প
চম্পকশ্রেষ্ঠিকথানক	জিনকীর্ত্তি (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী)	রূপকথা
পুরুষপরীক্ষা	মৈথিল বিদ্যাপতি (খৃঃ ১৪শ শতাব্দী)	পুরুষজনোচিত গুণ সম্বন্ধে ৪৪টি গল্প
প্রবন্ধকোষ	রাজশেখর স্থরি (খৃঃ ১৪শ শতাব্দী)	কতিপয় রাজা, জৈন মহাপুরুষ এবং কবির জীবনী অবলম্বনে লিখিত

গ্রন্থনাম	রচয়িতার নাম	সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু
প্রবন্ধচিন্তামণি	মেরুতুঙ্গ (খৃঃ ১৪শ শতাব্দী)	বিক্রমাদিত্য ও ভোজ প্রভৃতি রাজাদের কাহিনী
ভরটক-দ্বাত্রিংশিকা	অজ্ঞাত	ভরটকাখ্য উপহাসাস্পদ সন্ন্যাসিগণের গল্প
ভোজপ্রবন্ধ	বল্লালসেন (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী— বাংলার রাজা বল্লালসেন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি)	ধারারাজ ভোজের গল্প
সম্যক্ত্বকৌমুদী	অজ্ঞাত	কি করিয়া সম্যক্ ধর্ম লাভ হইল, সেই সম্বন্ধে স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীগণের নিকট গল্প এবং স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক স্বামীর নিকট কথিত গল্প

উনিশ

চম্পূকাব্য

'চম্পূ' শব্দটির উৎপত্তি কখন কেমন করিয়া হইল, বলা যায় না। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' (১।৩১) এই জাতীয় কাব্যকে 'গদ্যপদ্যময়' বলিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে, অনেক আলঙ্কারিকই চম্পূ কাব্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, কিন্তু, কতটুকু গদ্য এবং কি পরিমাণে পদ্য থাকিবে, এই সম্বন্ধে কেহই কিছু বলেন নাই। কথা ও আখ্যায়িকারূপ গদ্যসাহিত্যে গদ্যের সঙ্গে সঙ্গে পদ্য মিশ্রিত আছে; কিন্তু ইহাদের তুলনায় চম্পূতে পদ্যাংশ অধিকতর। পঞ্চতন্ত্রে পদ্যের প্রয়োগ প্রায়ই হইয়াছে কোন নৈতিক উপদেশচ্ছলে অথবা একটি বর্ণনার উপসংহারস্বরূপে। চম্পূতে গদ্যপদ্যের মিশ্রণে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম দেখা যায় না। সম্ভবতঃ বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা পদ্যকাব্যের প্রতি পাঠকসমাজের সমধিক প্রীতিহেতু চম্পূ-রচয়িতা ইতস্ততঃ পদ্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। চম্পূকাব্যের সহিত দণ্ডীর পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, বর্ত্তমানে আমরা খৃঃ দশম শতকের পূর্বের কোন চম্পূর নিদর্শন পাই না। সময়ের অত্যন্ত ব্যবধান এবং পদ্যাংশের প্রয়োগের পদ্ধতির প্রভেদ প্রভৃতি কারণে চম্পূকে পদ্যাংশসম্বলিত পালি জাতক এবং পঞ্চতন্ত্রের আদর্শে সৃষ্ট মনে না করাই সঙ্গত মনে হয়। কথা ও আখ্যায়িকারূপ গদ্যকাব্যের সঙ্গে চম্পূর সাদৃশ্য যথেষ্ট। সুতরাং পদ্য ও উক্ত প্রকার গদ্য-প্রভাবের সংমিশ্রণেই এই জাতীয় কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা মনে করা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক নহে।

চম্পূকাব্যের লক্ষণ ও প্রাচীনত্ব

গদ্যকাব্য এবং চম্পূর সাদৃশ্য ও প্রভেদ

পালিজাতক ও চম্পূ

চম্পূর বিষয়বস্তু

চম্পূর বিষয়বস্তু প্রায়ই legend বা উপকথা। কোন কোন চম্পূ অবশ্য নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত।

চম্পূকাব্যের বিভিন্ন গ্রন্থ—'নলচম্পূ'

এপর্যন্ত যে সমস্ত চম্পূকাব্য পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ত্রিবিক্রমভট্টের 'নল-চম্পূ' বা 'দময়ন্তী-কথা' প্রাচীনতম। গ্রন্থের নামটিই ইহার বিষয়বস্তুর পরিচায়ক। নলদময়ন্তীর প্রসিদ্ধ উপাখ্যানের কিয়দংশমাত্র অবলম্বন করিয়া কবি সাতটি 'উচ্ছ্বাসে' কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। ইহার রচনাতে কবি নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের অনেক চেষ্টা করিতে গিয়া কবিত্ব অপেক্ষা সাহিত্যিক ব্যায়ামের (literary exercise) পরিচয়ই বেশী দিয়াছেন।

ত্রিবিক্রম সম্ভবতঃ খৃঃ দশম শতকের প্রথম পাদের লোক।

'যশস্তিলকচম্পূ'

জৈন সোমপ্রভ সূরির রচিত 'যশস্তিলকচম্পূ' এই জাতীয় গ্রন্থ।

ইহাতে অবন্তিরাজ যশোধরের পত্নীর চক্রান্ত, মৃত্যু ও বহুবার পুনর্জন্ম এবং পরিশেষে জৈনধর্মগ্রহণ প্রভৃতি কাহিনী বর্ণিত আছে।

গল্পে নূতনত্ব নাই ; অনেক জৈন গ্রন্থেই ইহা আছে। আটটি 'আশ্বাসে' লিখিত এই গ্রন্থে কবির অলঙ্কার ও ছন্দঃশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চম্পূটিকে কবির স্বীয় জৈন ধর্ম প্রচারের একটি উপায়স্বরূপ মনে হয় ; ইহাতে কাব্যটির সাহিত্যিক মূল্য অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

এই চম্পূ ৯৫৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

উক্ত দুইটি চম্পূ ব্যতীত আরো কয়েকটি চম্পূ আছে ; তাহাদের মধ্যে প্রধান চম্পূগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

গ্রন্থনাম (বর্ণানুক্রমিক)	রচয়িতা	কাল
উদয়সুন্দরীকথা	সোড্‌ঢল	১০৪০ খৃষ্টাব্দ
গোপালচম্পূ	জীবগোস্বামী	খৃঃ ষোড়শ শতাব্দী
তিলকমঞ্জরী	ধনপাল	৯৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি
ভারতচম্পূ	অনন্ত	?
রামায়ণচম্পূ	ভোজরাজ ও লক্ষ্মণ ভট্ট (?)	?

কুড়ি

দৃশ্যকাব্য

এই অধ্যায়ের নাম 'নাটক' না দিয়া 'দৃশ্যকাব্য' কেন দেওয়া হইল, তাহা প্রথমে বলা প্রয়োজন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, দৃশ্য কাব্যের প্রধান দুইটি ভাগ—রূপক ও উপরূপক। রূপক দশবিধ; ইহাদের মধ্যে একপ্রকার রূপকের নাম 'নাটক'। বাংলার ন্যায় নাট্যগ্রন্থমাত্রকেই সংস্কৃতে নাটক বলা হয় না। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা শুধু দৃশ্যকাব্যের একদেশ নাটকের আলোচনাই করিব না, কিন্তু 'দৃশ্যকাব্য' নামে অভিহিত সমগ্র সাহিত্যের আলোচনাই করিব।

দৃশ্যকাব্যের প্রকারভেদ

এই জাতীয় কাব্যের ভাগ-বিভাগগুলি নিম্নলিখিতরূপ[১] :—
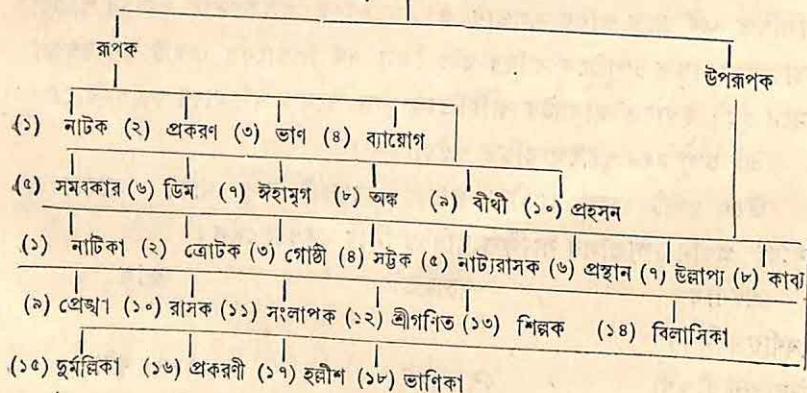
ইহাদের মধ্যে, নাটক, নাটিকা, প্রকরণ ও ভাণই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, ইহাদের লক্ষণ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

নাটক

বিশ্বনাথের মতে, নাটকের বস্তু হইবে বিখ্যাত কোন বৃত্তান্ত; ইহার নায়ক হইবেন গুণবান্ প্রখ্যাতবংশ

১ দ্রষ্টব্য সাহিত্য-দর্পণ, ৬।৪-৫

ধীরোদাত্ত[১] রাজা অথবা দিব্য পুরুষ। নাটকের প্রধান রস শৃঙ্গার বা বীর; অন্যান্য রস অঙ্গস্বরূপে থাকিবে। অঙ্কসংখ্যা হইবে পাঁচ হইতে দশ। দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, মৃত্যু, ব্রীড়াকর বা অশ্লীল কোন ব্যাপার নাটকে থাকিবে না।[২]

নাটিকা

নাটিকার বিষয়বস্তু কাল্পনিক এবং নায়ক ধীরললিত[৩] রাজা। ইহাতে মহিষীর মান প্রভৃতি বাধা অতিক্রম করিয়া অন্য 'নবানুরাগা' নারীর সহিত রাজার পরিণয়ের বর্ণনা থাকিবে। নাটিকার অঙ্কসংখ্যা হইবে চার।[৪]

প্রকরণ

কবিকল্পিত লৌকিক বৃত্তান্ত লইয়া প্রকরণ রচিত হইবে। ইহাতে প্রধান রস শৃঙ্গার। প্রকরণের নায়ক ধীরপ্রশান্ত[৫] ব্রাহ্মণ, অমাত্য বা বণিক্ এবং নায়িকা কুলবধূ বা বেশ্যা অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ই। নায়িকার প্রকার অনুসারে প্রকরণ তিন প্রকার হইবে; তন্মধ্যে তৃতীয় প্রকারের রচনায় ধূর্ত্ত, দ্যূতকার ও বিট প্রভৃতি চরিত্রের প্রাচুর্য থাকিবে। প্রকরণের অঙ্কসংখ্যা সাধারণতঃ দশ।[৬]

ভাণ

ভাণ একাঙ্ক নাট্যগ্রন্থ। ইহাতে বিট একমাত্র চরিত্র, বিষয়বস্তু ধূর্ত্ত নায়কের কার্যকলাপ এবং রস শৃঙ্গার ও বীর।[৭]

দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

ভারতবর্ষে দৃশ্যকাব্যের ধারণা কোন সুদূর অতীতে জন্মিল, তাহা অনির্ণেয়। এই সম্বন্ধে ভারতীয় ও বৈদেশিক পণ্ডিতগণ কতকগুলি অনুমান

১ দ্রষ্টব্য: সাহিত্য দর্পণ, ৩।৩৭
২ ঐ ৬।৬
৩ ঐ ৩।৩৯
৪ ঐ ৬।২৮১
৫ ঐ ৩।৪০
৬ ঐ ৬।২৫৩
৭ ঐ ৬।২৫৫

করিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মতাবলীর মধ্যে প্রধান প্রধান মতগুলি নিম্নলিখিতরূপ।

ঋগ্বেদের সংবাদসূক্ত

(১) কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ঋগ্বেদের পুরূরবা ও উর্বশী, যম ও যমী প্রভৃতি সংবাদ-সূক্তগুলি হইতেই সর্বপ্রথম দৃশ্যকাব্যের ধারণা সেই যুগে জন্মিয়াছিল।

Puppet-play বা পুতুল-নাচ (পিসেল)

(২) প্রাচীন ভারতে বহুকাল হইতেই জনসাধারণের আমোদের জন্য পুতুল-নাচের প্রচলন ছিল। পিসেল (Pischel) মনে করেন যে, এই পুতুল-নাচ হইতেই দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব; ইহার একটি প্রমাণ, নাটকে ব্যবহৃত দুইটি শব্দ—সূত্রধার (যিনি সূত্র ধরিয়া থাকেন) ও স্থাপক (যিনি পুতুলগুলিকে স্থাপন করেন)।

বসন্তোৎসব

(৩) কেহ কেহ মনে করেন, শীতের পরে যে বসন্তোৎসব প্রচলিত ছিল সেই উৎসবই দৃশ্যকাব্যের আদর্শ।

পরলোকগত পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান (রিজ্ওয়ে)

(৪) রিজ্ওয়ে (Ridgeway)-র মতে, পরলোকগত পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে প্রাচীন কালে যে অনুষ্ঠান বিহিত ছিল, তাহারই পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপ দৃশ্যকাব্য।

ব্রহ্মার সৃষ্টি (নাট্যশাস্ত্র)

(৫) ভরতের নাট্যশাস্ত্রে লিখিত আখ্যানে দেখা যায় যে, স্বয়ং ব্রহ্মা দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি চতুর্বেদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; শিবের তাণ্ডব এবং পার্বতীর লাস্যও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই আখ্যান হইতে আরো জানা যায় যে, ব্রহ্মা নিজে 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ' নামে দুইটি দৃশ্যকাব্য রচনা করেন।

গ্রীক্‌প্রভাব (Windisch প্রভৃতি)

(৬) পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Windisch ও তাঁহার মতানুসারিগণের মতে, গ্রীস্‌দেশ হইতে ভারতীয়েরা দৃশ্যকাব্যের ধারণা প্রথম পাইয়াছিল; এই মতের সমর্থনে গ্রীক্ ও ভারতীয় উভয় প্রকারের দৃশ্যকাব্যের মধ্যে বহু সাদৃশ্য দেখান যায়। আলেক্‌জাণ্ডারের (Alexander)-এর অভিযানের পর হইতে গ্রীস্

দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভারতে গ্রীক্ শাসনকর্ত্তাদের সভাতে গ্রীক্ দৃশ্যকাব্য অভিনীত হইত। তখন হইতে ভারতবাসিগণ সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য রচনা করিবার প্রেরণা পাইল। এই মতের সমর্থনে আরো বলা যায় যে, সংস্কৃত নাটকে 'যবনিকা' শব্দটির প্রয়োগ হইল 'যবন' (=গ্রীস্‌বাসী) হইতে। দক্ষিণ-ভারতে সীতাবেঙ্গা গুহায় গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে নির্মিত যে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা গ্রীক্ প্রভাবের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া এই মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা মনে করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত মতগুলির মধ্যে কোন্‌টি অভ্রান্ত তাহা বলা কঠিন। ইহাদের বিরুদ্ধযুক্তিও বহু রহিয়াছে। গ্রীক্‌প্রভাবের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে বহু যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে; দেখান হইয়াছে যে, 'যবন' শব্দে শুধু যে গ্রীস্-দেশীয় লোককেই বুঝায় তাহা নহে।

দৃশ্যকাব্যের যুগবিভাগ

কালিদাস সংস্কৃত কবিগোষ্ঠীর মধ্যমণি। সুতরাং, তাঁহাকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করিয়া দৃশ্যকাব্যের নিম্নলিখিতরূপ যুগবিভাগ করা যাইতে পারে:—

কালিদাসপূর্ব যুগ
কালিদাস-যুগ
কালিদাসোত্তর যুগ

সংস্কৃত সাহিত্যে কবির জীবনকাল ও কাব্যের রচনার সময় এত অনিশ্চিত যে, দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন যুগগুলির কালসীমা নির্দ্ধারণ দুঃসাধ্য বা অসাধ্য।

কালিদাসপূর্ব যুগ

দৃশ্যকাব্যের উদ্ভবকাল

'অষ্টাধ্যায়ী'র সাক্ষ্য

এই যুগের প্রারম্ভকাল অজ্ঞাত। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে নটসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় (৪.৩.১১০)। ঐ শতকের কৌটিলীয়

'অর্থশাস্ত্র'

'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে 'কুশীলব' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। অষ্টাধ্যায়ীর পতঞ্জলিকৃত 'মহাভাষ্যে' 'কংসবধ' ও

'মহাভাষ্য'

'বলিবন্ধ' নামে দুইটি দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ আছে। 'রামায়ণে' 'নাটক' শব্দটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং 'মহাভারতে'র অন্তর্গত 'হরিবংশে' কৃষ্ণের বংশধরগণ কর্তৃক অভিনীত নাটকের কথা লিখিত আছে।

'রামায়ণ'
'মহাভারত'

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নামক নাটকের প্রস্তাবনায়, কালিদাস ভাসের নামের সঙ্গে সৌমিল্ল ও কবিপুত্র (পাঠান্তর—রামিল ও সোমিল) নামে অপর দুইজন নাট্যকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

কালিদাসের সাক্ষ্য

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে অশ্বঘোষের 'শারিপুত্রপ্রকরণ'ই প্রাচীনতম। নাম হইতেই বুঝা যায়, ইহা দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত একটি প্রকরণ; ইহার অপর নাম 'শারদ্বতীপুত্র-প্রকরণ'। মধ্য এশিয়ায় তালপত্রে লিখিত ইহার অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে বুদ্ধকর্তৃক স্বীয় মতে দীক্ষিত করার কাহিনী ইহার বিষয়বস্তু।

অশ্বঘোষের
'শারিপুত্রপ্রকরণ'

আবিষ্কৃত অংশটুকু হইতে অশ্বঘোষের নাট্য-রচনাকৌশল সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা হয়, তাহাতে এটুকু বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে নাট্যসাহিত্য মাত্র রচিত হইতে আরম্ভ হয় নাই, এই সাহিত্য কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছে। অশ্বঘোষের এই আংশিক গ্রন্থ হইতে মনে হয়, তাঁহার রচনার গতি স্বচ্ছন্দ এবং কাব্য সরস।

সাহিত্যিক বিচার

অশ্বঘোষের জীবনকাল

পদ্যকাব্যের প্রসঙ্গে অশ্বঘোষের জীবন-কাল আলোচিত হইয়াছে।

ভাস

এই যুগে মাত্র অপর একজন নাট্যকারের গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম ভাস।

ভাসের তেরটি নাট্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যাইতে পারে :—

তেরটি নাট্যগ্রন্থ

(ক) মহাভারত অবলম্বনে রচিত

১। মধ্যমব্যায়োগ

২। পঞ্চরাত্র

৩। দূতবাক্য
৪। দূতঘটোৎকচ
৫। কর্ণভার
৬। উরুভঙ্গ
৭। বালচরিত (হরিবংশ অবলম্বনে)

(খ) রামায়ণ অবলম্বনে রচিত
১। প্রতিমা
২। অভিষেক

(গ) উদয়নের কাহিনী অবলম্বনে
১। স্বপ্নবাসবদত্তা
২। প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ

(ঘ) অজ্ঞাতমূল
১। অবিমারক
২। চারুদত্ত

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তা'ই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভাসের পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনাই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায়, চরিত্রের বিশ্লেষণে এবং ঘটনার বিন্যাসে তিনি সিদ্ধহস্ত।

সাহিত্যিক বিচার

'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে বাসবদত্তাসক্ত উদয়নের সহিত পদ্মাবতীর পরিণয় সাধনের জন্য যে বিচিত্র ঘটনাপরম্পরা বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা ভাসের নাট্যরচনাকৌশলের পরিচায়ক। পদ্মাবতীকে সপত্নী জানিয়াও বাসবদত্তার যে ধৈর্য, বাসবদত্তার স্বরূপ জানিয়াও নবোঢ়া রাজপুত্রী পদ্মাবতীর যে সংযম, প্রভুর মঙ্গলের নিমিত্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের যে স্থির-প্রতিজ্ঞতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম, রূপবতী গুণবতী পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে পাইয়াও বাসবদত্তার প্রতি রাজার যে অচল প্রেম—এই সমস্তই ভাসের চরিত্রচিত্রণ-কৌশলের প্রমাণ।

ভাসকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্যা সমাধান করিতে যাইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যে বাদবিতণ্ডার উদ্ভব হইয়াছে,

তাহার মীমাংসা আজ পর্যন্তও হয় নাই, কোন কালে হইবে কিনা সন্দেহ।

ভাস-সমস্যা (Bhāsa-problem)

বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে ভাস-সমস্যার বিশদ আলোচনা অসম্ভব। সুতরাং, এই সমস্যা সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে।

ভাসের নামের সহিত যুক্ত গ্রন্থগুলি এক ব্যক্তির রচনা—এই সম্বন্ধে যুক্তি

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত ভাসকে আমরা নামে মাত্রই জানিতাম; কিন্তু তাঁহার কোন গ্রন্থের সহিত আমাদের কোন পরিচয় ঘটে নাই। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রী নামক একজন পণ্ডিত দক্ষিণ ভারতের ট্রিভ্যাণ্ড্রাম (Trivandrum) নামক স্থানে এক গোছা প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে ছিল তেরটি নাট্যগ্রন্থ; এইগুলিই তাঁহার মতে মহাকবি ভাসের বিস্মৃত নাট্যগ্রন্থ। এইগুলিকে ভাসের নাটক বলিয়া মনে করিবার কতকগুলি যুক্তিও তিনি দিলেন। তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই যে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণহেতু সবগুলি গ্রন্থই একজনের রচিত বলিয়া মনে হয়—

(১) শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকের ন্যায়, এই গ্রন্থগুলি নান্দীশ্লোকে আরম্ভ হয় নাই; ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রহিয়াছে এই নির্দেশ—"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ"

(২) পরবর্তী যুগের নাটকগুলিতে যাহাকে 'প্রস্তাবনা' নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে এই গ্রন্থসমূহে বলা হইয়াছে 'স্থাপনা'

(৩) অধিকাংশ নাটকগুলির ভরতবাক্য অল্পবিস্তর ভেদসত্ত্বেও অনেকটা একপ্রকার

(৪) অনেকগুলি নাটকের মধ্যে একজাতীয় অপাণিনীয় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়

(৫) ভাষা, ভাব, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গী পর্যন্তও অনেকগুলি নাটকে একইপ্রকার।

উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, এই নাটকগুলি এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া মনে হয়। পুনরায় কতক যুক্তির অবতারণা করিয়া শাস্ত্রী

মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐ ব্যক্তি ভাস ভিন্ন অপর কেহ নহেন। এই সম্বন্ধে দুইটি প্রধান যুক্তি নিম্নলিখিতরূপ :—

ঐ ব্যক্তি ভাস—যুক্তি

১। 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকটি ভাস-রচিত—সুদীর্ঘকাল হইতে এই প্রসিদ্ধি প্রচলিত। ইহার একজন প্রধান সাক্ষী রাজশেখর। তিনি বলিয়াছেন—

ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্নপাবকঃ॥

শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত নাটক-চক্রের মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্তা নামে একটি নাটক আছে। সুতরাং, ইহা মনে করা অযৌক্তিক নয় যে, সমলক্ষণ-বিশিষ্ট অপরাপর নাটকগুলিও সেই ভাসেরই রচিত।

২। **হর্ষচরিতে**[১] বাণভট্ট ভাসের নাটকের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন :—

সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥

বাণের মতে, ভাসের নাটকের যে বিশিষ্ট লক্ষণ তাহা উক্ত সবগুলি নাটকেই আছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের এত পরিশ্রম করিতে হইল শুধু এই কারণে যে, উক্ত আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির কোনটিতেই নাট্যকারের নাম নাই। সুতরাং, তাঁহার যুক্তিগুলি সকলে মানিলেন না। তাঁহারা বহু বিরুদ্ধযুক্তিরও অবতারণা করিলেন। বিরুদ্ধযুক্তিগুলির মধ্যে প্রধান একটি যুক্তি এই যে, এ পর্যন্ত কোষকাব্যগুলিতে ভাসের যতগুলি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই উক্ত তথাকথিত ভাসনাটকসমূহে নাই। অন্যান্য নাট্যগ্রন্থের সহিত তুলনায়, এই নাটকগুলির রচনাতে যে কতগুলি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ বৈশিষ্ট্য কতক নাটকের দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহে বিদ্যমান। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, এখন পর্যন্তও ভাস-সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয় নাই।

বিরুদ্ধ যুক্তি

১ প্রারম্ভিক শ্লোক ১৫

শাস্ত্রীমহাশয়ের সমর্থক—পারঞ্জপে, কীথ্, টমাস্
বিরুদ্ধমতাবলম্বী—কানে, র‍্যাড্ডি, বার্ণেট ও পিসারোডি
মধ্যপথাবলম্বী—সুক্‌ঠঙ্কর ও ভিণ্টারনিৎস্

উক্ত নাটকগুলিকে যাঁহারা ভাসের বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান শাস্ত্রী মহাশয়, পারঞ্জপে, কীথ্ (Keith) ও টমাস্ (Thomas)। বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কানে, র‍্যাড্ডি, বার্ণেট (Barnett) ও পিসারোডি। সুক্‌ঠঙ্কর (Sukthankar) ও ভিণ্টারনিৎস্ মধ্যপথাবলম্বী; তাঁহারা মনে করেন যে, এই পর্যন্ত যে প্রমাণসকল পাওয়া গিয়াছে তাহাদ্বারা ভাসের পক্ষে বা বিপক্ষে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

ভাসের জীবনকাল

ভাসের কাল সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত নানা কালই ভাসের কাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার যুক্তিবলে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

কালিদাস-যুগ

যদিও এই যুগে আমরা একমাত্র কালিদাসেরই আলোচনা করিব, তথাপি 'যুগ' শব্দটি এখানে অপ্রযোজ্য নহে। ইহার কারণ এই যে, সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে কালিদাস যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহার দাবীতেই তাঁহার কালকে 'যুগ' বলা যাইতে পারে।

কালিদাসের তিনটি নাটক আছে—(১) অভিজ্ঞানশাকুন্তল (২) বিক্রমোর্বশীয় (৩) মালবিকাগ্নিমিত্র।

অভিজ্ঞানশাকুন্তল

এই নাটকগুলির মধ্যে প্রথমটি বিশ্ববিখ্যাত। ইহা সপ্তাঙ্ক নাটক। ইহার বিষয়বস্তু সকলেরই জানা। বর্ত্তমানে ইহা চারিটি রূপে পাওয়া যাইতেছে—(১) দেবনাগরী (২) বঙ্গদেশীয় (৩) কাশ্মীরী ও (৪) দক্ষিণভারতীয়।

বিক্রমোর্বশীয় পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই নাটকের নায়ক পুরূরবা অসুর কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা অপ্সরা উর্বশীকে উদ্ধার করিতে গিয়া তাঁহার সহিত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইলেন। কিছুক্ষণ পরস্পর প্রেমালাপের পর, স্বর্গে ভরতরচিত

নাটকে অংশগ্রহণ করিবার জন্য উর্বশীকে যাইতে হইল। পুরূরবার মহিষী এই প্রণয়কাহিনী শুনিয়া অভিমানিনী। এদিকে ইন্দ্রের অনুগ্রহে রাজার সঙ্গে মর্ত্ত্যে বাস করিবার অনুমতি উর্বশী পাইলেন; কিন্তু রাজার পুত্রমুখদর্শন হইলেই উর্বশীকে স্বর্গে ফিরিয়া আসিতে হইবে, এই নির্দেশ। রাজার অনুনয়ে মহিষী স্থির হইলেন, এবং উর্বশীর সহিত রাজার বাসে সম্মতি জানাইলেন। অপ্সরার সহিত রাজা সুখে মিলিত হইলে, একদিন রাজার প্রতি রোষবশতঃ উর্বশী স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ এক কুঞ্জে প্রবেশ করিবার ফলে সেখানে একটি লতায় পরিণতা হইলেন। উর্বশীর অদর্শনে বিরহকাতর রাজা কোকিল, ভ্রমর, হরিণ প্রভৃতির নিকট তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন; তিনি ভাবিলেন, হয়ত উর্বশী নদীতে রূপান্তরিতা হইয়া গিয়াছেন। শোকোন্মত্ত রাজা দৈববাণী হইতে একটি 'সংগমনীয় মণির'[১] কথা জানিতে পারিলেন। উহা লইয়া তিনি একটি লতাকে আলিঙ্গন করিবামাত্র লতাটি উর্বশীর রূপ ধারণ করিল। রাজা ও অপ্সরা পুনরায় সুখে কালযাপন করিতে থাকিলে, একদিন একটি শকুনি বাণাহত হইয়া পড়িয়া যায়; সেই বাণে লিখিত ছিল 'উর্বশী ও পুরূরবার পুত্র আয়ুর বাণ'। এই পুত্র ছিল রাজার নিকট অজ্ঞাত। ইত্যবসরে, পক্ষীকে হত্যা করিয়া তপোবনের নিয়মভঙ্গ করিবার অভিযোগে আয়ুকে নিজ মাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিতে একটি নারী আসেন। উর্বশী ঐ বালকের মাতৃত্ব স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু ভাবী বিরহের বেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন; রাজার পুত্রমুখ দর্শন হইল, সুতরাং উর্বশীকে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এমন সময় নারদ উপস্থিত হইয়া শুভ সংবাদ জানাইলেন যে, স্বর্গে দেবাসুরের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে—ইহাতে পুরূরবার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে এবং পুরস্কার স্বরূপ তিনি জীবনব্যাপী উর্বশীর সঙ্গসুখ লাভ করিতে পারিবেন।

বিক্রমোর্বশীয়

ইহার দুইটি রূপ

নাটকটি উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় এই দুইটি রূপে বর্ত্তমানে পাওয়া যায়।

১। 'সংগমনীয়' অর্থাৎ যে মিলন ঘটায়

ইহার বিষয়বস্তু অতি প্রাচীন আখ্যান ; ঋগ্বেদেই পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, আখ্যানের আদিম রূপটিকে কালিদাস ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। মূলের বিয়োগান্তক ঘটনাটিকে তিনি মিলনে পর্যবসিত করিয়াছেন। উর্বশীর প্রতি ইন্দ্রের অনুগ্রহ এবং 'সংগমনীয় মণির' অবতারণা প্রভৃতি নাট্যকারের সৃষ্টি। নূতন সৃষ্টিতে কালিদাসের কল্পনাকৌতুকী মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই সমস্ত কৃত্রিম ব্যাপারগুলিদ্বারা ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি ব্যাহত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মূল আখ্যানে এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য কালিদাস অপেক্ষা তাঁহার যুগের রুচি ও নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনই সম্ভবতঃ অধিকতর দায়ী। যাহাই হউক, কালিদাসের আখ্যানভাগকে যদি মূলের সঙ্গে তুলনা না করিয়া উহার নিজস্ব রূপেই বিচার করা যায়, তাহা হইলে নাট্যকারের চরিত্র-চিত্রণের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কালিদাসের উর্বশী অনুরক্ত ব্যক্তির আসক্তি নিয়া শুধু কৌতুক করেন না, স্ত্রীসুলভ হৃদয়ও তাঁহার আছে। স্বর্গের অপ্সরা হইলেও, মর্ত্ত্যের প্রেম তাঁহার নিকট উপেক্ষণীয় নহে। পুরূরবা যে কামুক নহেন, প্রকৃত প্রেমিকও বটেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় চতুর্থ অঙ্কে যেখানে উর্বশীর বিরহে রাজা শোকে অধীর এবং উন্মত্ত। এখানে যদিও অঙ্কটিকে অতিনাটকীয় এবং রাজাকে একটু বেশী sentimental বা ভাবপ্রবণ মনে হয়, তথাপি তিনি যে সাধারণ রাজাদের ন্যায় পুষ্পে পুষ্পে মধু আহরণ করিয়া বেড়ান না, ইহা নিশ্চিত। অজ্ঞাত পুত্রের পরিচয় ও পুত্রলাভে পরিণয়ের চরম সার্থকতা—এই দুইটি কালিদাসীয় বৈশিষ্ট্য ; অন্যত্র অনুরূপ অবস্থার বর্ণনা থাকিলেও, বর্ত্তমান নাটকে ইহারা উপভোগ্যই হইয়াছে।

সাহিত্যিক বিচার

'মালবিকাগ্নিমিত্র'

'মালবিকাগ্নিমিত্র' পঞ্চাঙ্ক নাটক।

বিদর্ভরাজকুমারী মালবিকা নানা ঘটনাপরম্পরাক্রমে প্রচ্ছন্নরূপে রাজা অগ্নিমিত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পূর্বেই রাজা তাঁহার প্রতিকৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং মালবিকার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। উদ্যানে মালবিকাকে চাক্ষুষ দেখিয়া এবং নিজের প্রতি তাঁহার অনুরাগ

আছে জানিতে পারিয়া, রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কনিষ্ঠা মহিষী ইরাবতী দূর হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত রুষ্টা হইলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে অপমানিত করিলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী ধারিণী অনর্থ নিবারণের উদ্দেশ্যে মালবিকাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিদূষকের কৌশলে মালবিকার সহিত রাজার পুনরায় মিলন ঘটে, কিন্তু এবারও ইরাবতীর জন্য এই মিলন ব্যর্থ হইয়া যায়। পরিশেষে, প্রতিদ্বন্দ্বী বিদর্ভরাজের পরাজয়ের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিদর্ভ হইতে আগত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে মালবিকার পরিচয় পাওয়া গেল। এদিকে, ধারিণীর পুত্র বসুমিত্র কর্তৃক যবনগণের পরাজয়ের সংবাদে ধারিণী পুলকিতা। পূর্বেই ধারিণীর নিকট মালবিকার পুরস্কার প্রাপ্য ছিল। সংপ্রতি স্বীয় পুত্রের বিজয়-সংবাদে হৃষ্টচিত্তা ধারিণী মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের পরিণয় অনুমোদন করিলেন, ইরাবতীর ক্রোধও প্রশমিত হইল। এইভাবে আনন্দময় ব্যাপারে নাটকীয় বৃত্তান্তের পরিণতি ঘটিল।

এই নাটকটিকে কোন কোন সমালোচক কালিদাসের অপরিণত বয়সের রচনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই মতের একটি যুক্তি এই যে, ইহাতে ভাস প্রভৃতি প্রাচীন নাট্যকারগণের নাটক থাকা সত্ত্বেও কবি নিজের রচিত নূতন গ্রন্থ পাঠের জন্য পাঠকসমাজকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।[১] তাহা ছাড়াও, কালিদাসের অপর দুইটি নাটকের তুলনায় ইহার বস্তুগত বৈশিষ্ট্য আছে। হীনকুলসম্ভূতা কন্যার প্রতি রাজার প্রেম, নানা অবস্থা বিপর্যয়ে রাজার উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে ব্যাঘাত, পরিশেষে ঐ কন্যার রাজপুত্রী বলিয়া পরিচয় এবং রাজার সহিত মিলন—এবম্বিধ বস্তু সংস্কৃত অনেক নাটকেই পাওয়া যায়; সুতরাং এইরূপ বস্তু নির্বাচনের জন্য কালিদাসের প্রাথমিক প্রয়াসই দায়ী—এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া

সাহিত্যিক বিচার

১। পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥ (মালবিকাগ্নিমিত্র—প্রস্তাবনা)

থাকেন। কিন্তু, এই বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। এই নাটকটিতেও কালিদাসের কালিদাসত্ব ভাষায় এবং ভাবে নানা স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অগ্নিমিত্র বা মালবিকা হয়ত নায়ক বা নায়িকা হিসাবে উচ্চস্তরের নহেন, তথাপি, কালিদাস নাট্যবস্তুর উপযোগী করিয়াই তাঁহাদের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যে যুগে কালিদাস এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ের যে সমাজচিত্রের প্রতিফলন আমরা সমসাময়িক সাহিত্যে দেখিতে পাই তাহাতে জীবনের গতি ছিল সহজ স্বচ্ছন্দ, নাগরিকগণের কোন গভীর চিন্তার প্রয়োজন হয়ত ছিল না; তখন সম্ভবতঃ এইরূপ নাটকের সমাদর সমাজে ছিল বলিয়াই কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্র' রচনা করিয়াছিলেন, নিজের ভাবের বা রচনাশক্তির দৈন্যবশতঃ নহে।

কালিদাসের তিনটি নাটকেই তাঁহার কল্পনাশক্তি, নাট্যরচনাকৌশল, অলঙ্কার ও ছন্দশাস্ত্রে অধিকার, মার্জিত ভাষা ও রুচি প্রভৃতি পরিস্ফুট হইয়াছে। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও প্রকৃতির অভূতপূর্ব বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। তাঁহার নাটকগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐগুলি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। ঘটনার বাহুল্য বা কবির স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রয়াস কোন নাটকেই দেখা যায় না। করুণরসের চিত্র কালিদাসের রচনায় যেন পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যটি কি করুণ! "শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইবে, এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় আকুল, রুদ্ধবাষ্পে কণ্ঠরোধ হইতেছে, চিন্তাক্লিষ্ট চোখে যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না"—কণ্বমুনির এই একটি মাত্র উক্তিতে যেন বিশ্বের পিতৃস্নেহ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত আশ্রমপ্রকৃতি যেন শকুন্তলার আসন্ন বিরহে মুহ্যমান! হরিণশিশুটিও শকুন্তলার পথ ছাড়িতেছে না। 'অভিজ্ঞানশাকুন্তল' এত সুন্দর এবং তাহার এই দৃশ্যটি এত মনোজ্ঞ বলিয়াই ভারতীয় সমালোচক বলিয়াছেন—

> কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা।
> তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা॥

এই নাটকের খ্যাতি বহুকাল পূর্বেই ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া গিয়াছিল। জার্মান মনীষী গ্যেটে (Goethe) এই নাটক পাঠে মুগ্ধ হইয়া ইহার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার প্রধান কথা এই যে, ইহাতে স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যের মিলন সাধিত হইয়াছে। আশ্রমলালিতা রূপযৌবনসম্পন্না শকুন্তলার প্রতি রাজা দুষ্যন্তের যে উদ্দাম প্রেম এবং রাজার প্রতি শকুন্তলার যে অনিবার্য আসক্তি সামাজিক বিধিনিষেধকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল, তাহার জন্য উভয়েই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর উভয়ের যে মিলন হইল তাহা অত্যন্ত সুখময়; তাহাতে যৌবনের উন্মাদনা নাই, আছে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম। উদ্দাম মর্ত্ত্য প্রেমের মহৎ স্বর্গীয় প্রেমে পরিণতি—ইহাই তো নাটকটির মুখ্য প্রতিপাদ্য; তাই গ্যেটের উক্তি সার্থক।

কালিদাসের জীবনী ও কাল

কালিদাসের জীবনী ও জীবনকাল সম্বন্ধে পদ্য-কাব্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

কালিদাসোত্তর যুগ

পদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে কালিদাসোত্তর যুগে কবিপ্রতিভার যেরূপ ক্ষীয়মাণতা লক্ষিত হয়, নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে ঠিক সেরূপ ঘটে নাই। এই যুগের নাট্যপ্রতিভা ম্লান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল বহু পরবর্ত্তী কালে। কালিদাসের পরেও উৎকৃষ্ট নাট্যসাহিত্য রচিত হইয়াছিল; কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এই যুগের অল্পসংখ্যক নাট্যগ্রন্থই বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কালানুক্রমে এই যুগের নাট্যসাহিত্যের আলোচনা করা যাইতেছে।

শূদ্রক

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক

ইঁহার রচিত 'মৃচ্ছকটিক' দশাঙ্ক প্রকরণ। ইহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ :—

চারুদত্ত উজ্জয়িনীর বিত্তশালী একজন নাগরিক। দানদাতব্য প্রভৃতি নানা সৎকাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি দারিদ্র্যদশায় উপনীত হইয়াছেন। রাজা পালকের চরিত্রহীন শ্যালক শকার (সংস্থানক) বসন্তসেনা নাম্নী এক

গণিকাকে স্ববশে আনিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। অনন্যোপায় হইয়া বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করেন। চারুদত্তের গুণাবলীর কথা শুনিয়া বসন্তসেনা পূর্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং দরিদ্র হইলেও তাঁহার প্রতি বসন্তসেনার গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছিল। বসন্তসেনা নিজের অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

শর্বিলক নামে এক ব্রাহ্মণ বসন্তসেনার পরিচারিকা মদনিকার সহিত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইলেন। তিনি দরিদ্র বলিয়া মদনিকার পাণিগ্রহণকল্পে চারুদত্তের গৃহ হইতে ঐ স্বর্ণালঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া আনিলেন। চারুদত্তের পত্নী ধূতা ঐ অলঙ্কারের পরিবর্তে বসন্তসেনার জন্য নিজের গলার হারটি চারুদত্তকে দিলে চারুদত্ত উহা বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মদনিকার কথানুসারে শর্বিলক অপহৃত অলঙ্কারগুলি বসন্তসেনাকে দিলেন। এদিকে চারুদত্ত কর্তৃক ঐ হারটি বসন্তসেনার নিকট প্রেরিত হইলে সন্ধ্যাবেলা বসন্তসেনা তুমুল ঝড়ের মধ্যে চারুদত্তের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং 'অপহৃত' অলঙ্কারগুলি চারুদত্তকে দিলেন এবং চারুদত্ত কর্তৃক হার প্রেরণের রহস্যটি উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। এইরূপে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রেম নিবিড়তর হইল। বসন্তসেনা সেই রাত্রিতে চারুদত্তের গৃহেই রহিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গাড়ীতে বসন্তসেনাকে উদ্যানে লইয়া যাইবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ দিয়া চারুদত্ত বাহিরে গেলেন। গাড়ী প্রস্তুত হইলে, চারুদত্তের পুত্র রোহসেন সোনার গাড়ীর স্থলে মাটির গাড়ী (মৃৎ+শকটিকম্ = মৃচ্ছকটিকম্) পাইয়াছে বলিয়া কাঁদিতে থাকে। বসন্তসেনা সোনার গাড়ীর জন্য তাহাকে নিজের অলঙ্কারগুলি দিলেন। এই সময়ে তিনি বাহিরে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া আসিলে একটি গাড়ী দেখিয়া ভ্রমে উহাতে আরোহণ করিলেন। এই গাড়ী শকারের এবং ইহাও উদ্যানাভিমুখে চলিতেছিল।

এদিকে আর্যক নামে এক ব্যক্তি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়ার ভয়ে রাজা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঠিক ঐ সময়ে আর্যক কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বসন্তসেনার জন্য রক্ষিত চারুদত্তের গাড়ীতে আরোহণ

করেন। সেই গাড়ীর চালক আরোহীকে বসন্তসেনা মনে করিয়া উক্ত উদ্যানে লইয়া যায়। উদ্যানে চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু গাড়ীতে আর্যককে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার পলায়নের সুযোগ করিয়া দিলেন। রাজার শত্রুকে সহায়তা করিয়া চারুদত্ত ভয়ে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

উদ্যানে শকার নিজের গাড়ীর প্রতীক্ষায় থাকিয়া দেখিলেন সেই গাড়ী হইতে বসন্তসেনা অবতরণ করিতেছেন। তখন তিনি বসন্তসেনাকে স্ববশে আনিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করিলেন। বসন্তসেনা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি তাঁহাকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করার চেষ্টা করিলেন। বসন্তসেনা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। শকার বসন্তসেনাকে নিহত মনে করিয়া এবং তাঁহার মৃত্যুর জন্য চারুদত্তকে দায়ী করিবার অভিসন্ধি লইয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরে এক ভিক্ষু সেস্থানে আসিয়া বসন্তসেনাকে দেখিলেন এবং তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন।

বিচারালয়ে নানা ঘটনা-বিপর্যয়ের জন্য শকারের অভিযোগই সত্য বলিয়া বিবেচিত হইল এবং চারুদত্তের মৃত্যুদণ্ড হইল। বধ্যভূমিতে চারুদত্ত উপস্থিত। ঠিক এই সময়ে, উক্ত ভিক্ষু বসন্তসেনাকে লইয়া সেখানে আসিলেন। চারুদত্তের প্রতি অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। ওদিকে আর্যক পালককে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিপদকালের সহায় চারুদত্তকে একটি রাজ্য দান করিলেন। বসন্তসেনা চারুদত্তের বধূপদ লাভ করিলেন।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'মৃচ্ছকটিক' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিষয়বস্তুর নূতনত্ব ইহার একটি প্রধান কারণ। রাজার জীবন ও রাজসভার গণ্ডীর বাহিরে আসা সংস্কৃত নাট্যকারের পক্ষে এই প্রথম।

সাহিত্যিক বিচার

চারুদত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রতি বিত্তশালিনী বারাঙ্গণা বসন্তসেনার অকৃত্রিম অনুরাগ—এই প্রণয়-কাহিনীর সহিত রাজনৈতিক চক্রান্তের এমন সংমিশ্রণ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে অদ্বিতীয়। যে সামাজিক চিত্রটি এই গ্রন্থে পরিস্ফুট, তাহা তৎকালীন বৃহত্তর সমাজের

বাস্তব রূপ। চরিত্র-বিশ্লেষণে শূদ্রকের ক্ষমতা অসীম। এতগুলি চরিত্রের মধ্যে প্রত্যেকটিরই একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে। আকারে বৃহৎ হইলেও গ্রন্থের কোথাও পাঠকের বিরক্তি জন্মে না; বহু ঘটনার সমাবেশ হইলেও ঘটনা-বিন্যাস স্বচ্ছ এবং পরিণতি স্বাভাবিক। শূদ্রকের ভাষা সাবলীল, ছন্দের প্রয়োগ নিপুণ, কিন্তু কোথাও কবি স্বীয় রচনাকৌশলের পরিচয় দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন আধুনিক সমালোচক ইহাকে বলিয়াছেন—most Shakespearian of all Sanskrit plays.

ভাসের 'চারুদত্তে'র সহিত সম্বন্ধ

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহা ভাসের 'চারুদত্ত' নামক নাটকের বর্দ্ধিত সংস্করণ; আবার কাহারও কাহারও মতে, 'চারুদত্তই' ইহার সংক্ষিপ্ত রূপ।

শূদ্রক সম্বন্ধে 'মৃচ্ছকটিকে'র প্রারম্ভে যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি নানাশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন এবং একশত দশবৎসর বয়সে তিনি নিজেকে অগ্নিদগ্ধ করেন। এই রাজা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সেই বিষয়ে এখনও কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং শূদ্রকের কাল অজ্ঞাত। শূদ্রক নামক কোন ব্যক্তি আদৌ এই গ্রন্থের রচয়িতা কিনা, এই বিষয়েও অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন; কেহ কেহ মনে করেন, ইহা ভাসেরই রচনা, আবার কাহারও কাহারও মতে, ইহা প্রকৃতপক্ষে শূদ্রক নামে কোন রাজার সভাপণ্ডিতের রচনা; রচয়িতা নিজের নামের পরিবর্তে স্বীয় পৃষ্ঠপোষকের নামের সহিত গ্রন্থটি যুক্ত করিয়াছেন।

শূদ্রকের কাল

খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত নানা কালই ইহার রচনাকাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতগণ মনে করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আলঙ্কারিক বামন শূদ্রকের উল্লেখ করিয়াছেন, কালিদাসের গ্রন্থে প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণের নামের সঙ্গে শূদ্রকের উল্লেখ নাই—এই সমস্ত কারণে শূদ্রককে কালিদাসোত্তর যুগের নাট্যকার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার সমর্থনে কোন অবিসংবাদিত প্রমাণ নাই।

চতুর্ভাণী

(১) উভয়াভিসারিকা
(২) পদ্মপ্রাভৃতক
(৩) ধূর্ত্তবিটসংবাদ
(৪) পাদ-তাড়িতক

ইহাদের রচয়িতৃগণের নাম তেমন প্রসিদ্ধ নহে, 'চতুর্ভাণী' নামেই ইহারা অধিকতর পরিচিত। ইহাদের নাম—(১) উভয়াভিসারিকা (২) পদ্মপ্রাভৃতক (৩) ধূর্ত্ত-বিটসংবাদ (৪) পাদ-তাড়িতক ; ইহাদের রচয়িতা যথা-ক্রমে বররুচি, শূদ্রক, ঈশ্বরদত্ত এবং শ্যামলিক।

স্বরূপ ও সাহিত্যিক মূল্য

ইহাদের বিষয়বস্তু অনেক পরিমাণে মৃচ্ছকটিকের অনুরূপ ; বাস্তবজীবনের ধূর্ত্ত, বিট প্রভৃতির চরিত্র লইয়াই ইহাদের রচনা। প্রত্যেকটিই একাঙ্ক ভাণ-জাতীয় দৃশ্যকাব্য ; প্রতি গ্রন্থেই একজনের উক্তি। ইহাদের সাহিত্যিক আকর্ষণ ও মূল্য নগণ্য, তবে সমাজের বাস্তব রূপের প্রতিচ্ছবি হিসাবে এই ভাণগুলি উপেক্ষণীয় নহে।

রচনাকাল

এই ভাণগুলি সম্ভবতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং ধনঞ্জয়ের 'দশরূপকের' রচনাকালের মাঝামাঝি কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষ ভাগের পূর্বে ইহাদের রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন ; কিন্তু, কত পূর্বে, সেই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। টমাসের মতে, গুপ্তরাজত্বকালের শেষভাগে অথবা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে ইহাদের রচনা হওয়া সম্ভব। 'পদ্মপ্রাভৃতক'-রচয়িতা শূদ্রক 'মৃচ্ছকটিক'-রচয়িতা শূদ্রক হইতে অভিন্ন কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

শ্রীহর্ষ

ইহার রচিত তিনখানি নাট্যগ্রন্থের নাম—

(১) প্রিয়দর্শিকা (২) রত্নাবলী (৩) নাগানন্দ।

'প্রিয়দর্শিকা'

'প্রিয়দর্শিকা' চতুরঙ্ক নাটিকা। ইহার বিষয়বস্তু মোটামুটি এই :—রাজা দৃঢ়বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকার পাণিগ্রহণ করিতে কলিঙ্গরাজ সমুৎসুক। কিন্তু, নানা ঘটনাপরম্পরাক্রমে প্রিয়দর্শিকা বৎসরাজের নিকট উপস্থাপিতা হইলেন। আরণ্যিকা নাম

দিয়া তাঁহাকে মহিষী বাসবদত্তার পরিচারিকা নিযুক্ত করা হইল। কালক্রমে বৎসরাজ আরণ্যিকার প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। একদিন উদ্যানে ভ্রমণকালে তিনি সখীর সহিত আলাপরতা আরণ্যিকার মনোভাব জানিতে পারিলেন যে, তিনিও রাজার প্রেমাতুরা। এমন সময় একটি ভ্রমর আরণ্যিকাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, এবং তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া চলিতে চলিতে রাজার বাহুতে আসিয়া পড়েন। বৎসরাজ ও বাসবদত্তার পরিণয় সম্বন্ধে একটি নাটকের অভিনয়ে বৎসরাজ রাজার এবং আরণ্যিকা মহিষীর অংশ গ্রহণ করেন। সেই নাটক অভিনয় মাত্র হইলেও বাসবদত্তা রাজা ও আরণ্যিকার পরস্পরের প্রতি আসক্তির অভিনয় দর্শনে কোপান্বিতা হন। বিদূষকের নিকট হইতে আরণ্যিকার প্রতি রাজার যথার্থ অনুরাগের বিষয় জানিয়া তাঁহার ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তিনি আরণ্যিকাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। পরিশেষে নানা ঘটনাচক্রে বাসবদত্তা জানিতে পারেন যে, আরণ্যিকা তাঁহারই আত্মীয়কন্যা। তৎপর বৎসরাজের সহিত তিনি আরণ্যিকার বিবাহ ঘটাইয়া দেন।

বৎসরাজের এই কাহিনী ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতে প্রচলিত। এই কাহিনী 'রত্নাবলী' নাটিকারও উপজীব্য। শেষোক্ত নাটকে বৎসরাজের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে রাজার সহিত সিংহলরাজকন্যা রত্নাবলীর নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর সাহায্যে পরিণয় সাধনের বর্ণনা আছে। সুতরাং, উভয় নাটিকারই মুখ্য বিষয়বস্তু একই ধরণের, প্রভেদ শুধু প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিন্যাসে। বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় নাট্যকারের মৌলিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও, তিনি যেভাবে ঘটনার পারম্পর্য বিন্যাস করিয়া আখ্যান-ভাগের পরিণতি দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাট্যরচনাকৌশলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে বৎসরাজের যে চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনায় হর্ষের বৎসরাজচরিত্র হীনতর। ভাসের উদয়নের দাম্পত্যপ্রেম অনেক মহত্তর; পদ্মাবতীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু দগ্ধীভূতা প্রিয়াকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন

সাহিত্যিক বিচার

নাই। ভাসের বাসবদত্তা পতির হিতে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা; আর হর্ষের বাসবদত্তা অন্য নারীর প্রতি পতির আসক্তি হেতু অতিশয় মুহ্যমানা।

'নাগানন্দ' পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহার বিষয়বস্তু এইরূপ :—

'নাগানন্দ'

জীমূতবাহন বিদ্যাধরগণের যুবরাজ। সিদ্ধগণের রাজকুমারী মলয়বতী ও জীমূতবাহন পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত। নানা অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া তাঁহাদের পরিণয় ঘটিল। একদিন গরুড় কর্ত্তৃক নিহত সর্পগণের বৃত্তান্ত জানিয়া জীমূতবাহন নাগকুলের প্রতি গরুড়ের অত্যাচারে সহানুভূতিবশতঃ নিজেকে গরুড়ের নিকট অর্পণ করেন। গরুড় কর্ত্তৃক নিহত গৌরীদেবীর কৃপায় জীমূতবাহন পুনর্জীবিত হইয়া পুনরায় মলয়বতীর সহিত কালযাপন করিতে থাকেন।

এই নাটকে বৌদ্ধ উপাখ্যান হর্ষের উপজীব্য। দুইটি নাটিকার ন্যায় এখানেও তিনি নানা অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু,

সাহিত্যিক বিচার

পরহিতে আত্মবলিদানের মহিমা তিনি জীমূতবাহনের চরিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বিদূষক ও বিটের কার্যকলাপে নাট্যকার যথেষ্ট হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। সবগুলি নাট্যগ্রন্থই সুললিত ভাষায় স্বচ্ছন্দ রচনা। তাঁহার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাশক্তি প্রশংসনীয়। 'রত্নাবলী'তে (৪।৬) যুদ্ধের বর্ণনায় যেন যুদ্ধের ভীষণ রূপটিই প্রকট হইয়াছে। শব্দের এবং অর্থের অলঙ্কার-প্রয়োগের বাহুল্য হর্ষের গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় না। কিন্তু, মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট ছন্দের প্রয়োগ অনাটকীয় মনে হয়। এক 'রত্নাবলী'তেই ২৩ বার শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের প্রয়োগ ইহার প্রমাণ।

এই নাট্যগ্রন্থগুলির রচয়িতা শ্রীহর্ষের পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও,

হর্ষের পরিচয় ও কাল

ইনি স্থাণ্বীশ্বরের রাজা হর্ষবর্দ্ধন—এই মতের সমর্থনে অনেক যুক্তি রহিয়াছে। যদি হর্ষবর্দ্ধনই ইহাদের রচয়িতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাদের রচনাকাল খৃঃ সপ্তম শতকের পূর্বার্দ্ধ।

বিশাখদত্ত

বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'

ইহার রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নামক নাটক সপ্তাঙ্কে রচিত।

নানা কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত-মন্ত্রী চাণক্যকর্ত্তৃক নন্দরাজগণের মন্ত্রী রাক্ষসের স্বপক্ষে আনয়ন—এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এই নাটকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কেবল মাত্র রাজনৈতিক ব্যাপার অবলম্বনে আর দ্বিতীয় নাটক সংস্কৃতে নাই; বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় এবং রচনাশৈলীতে ইহা সাধারণ সংস্কৃত নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাতে একটি মাত্র নগণ্য নারীচরিত্র আছে। এই নাটকের অনেক ঘটনা বা চরিত্র অনৈতিহাসিক হইতে পারে, কিন্তু তাহাই ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নহে। বিশাখদত্ত নাটকের ছলে কবিত্বের পরিচয় দেন নাই, জটিল ঘটনাজাল সৃষ্টি করিয়া সুষ্ঠুভাবে মূলবস্তুর পরিণতি সাধন করিয়াছেন। চাণক্য ও রাক্ষসের চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকারের যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। দুইজনই কুশাগ্রবুদ্ধি মন্ত্রী; কিন্তু চাণক্য স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, আত্ম-প্রত্যয়ী ও সতর্ক; রাক্ষস অপেক্ষাকৃত কোমলচিত্ত, আবেগ ও ভ্রম-প্রবণ।

ইহার বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক গুণাগুণ

চন্দ্রগুপ্ত ও মলয়কেতুর চরিত্রে যে বিপরীত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে উভয়ের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধি পরিপক্ব, আর মলয়কেতুর বুদ্ধি যুবজনসুলভ দোষদুষ্ট। বিশাখদত্তের রচনা সহজ ও স্বচ্ছন্দগতি। দীর্ঘ সমাসবহুল পদের প্রয়োগে বা কল্পনার অসংযত আশ্রয়ে অথবা অলঙ্কারসমূহের বাহুল্যে নাটকটি দোষযুক্ত হয় নাই।

বিশাখদত্তের জীবনী ও কাল

নাটকের প্রারম্ভে বিশাখদত্ত যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অধিক আমাদের আর কিছু জানিবার উপায় নাই। তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। খুব সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্ববর্ত্তীকালের লেখক।

ভট্টনারায়ণ

ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার'

'বেণীসংহার' ইহার রচিত ষড়ঙ্ক নাটক।

'মহাভারতে'র প্রসিদ্ধ কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য। ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসন-বধ ও তাহার রক্তে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন এবং কালক্রমে দুর্যোধনের নিধন—সংক্ষেপে ইহাই এই নাটকের বস্তু।

সাহিত্যিক বিচার

এই নাটকে নানা ঘটনার সন্নিবেশে মূল বস্তু কণ্টকিত হওয়ায় পাঠকের কৌতূহল নানাস্থানে ব্যাহত হইয়া যায়। কিন্তু, চরিত্রের যে চিত্রগুলি ভট্টনারায়ণ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্যোধনের নৃশংসতা, ভীমের দর্পপূর্ণ বীরত্ব, অর্জুনের সংযত শৌর্য, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ও ধর্ম-পরায়ণতা—প্রভৃতি নাট্যকারের তুলিকায় মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ভট্টনারায়ণের রচনা ঋজু ও হৃদয়গ্রাহী। বীররস, করুণরস ও ভীতি নাট্যকারের লেখনীতে মনোজ্ঞরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভট্টনারায়ণের নির্বাচিত ছন্দগুলি চিত্তাকর্ষক।

ভট্টনারায়ণের কাল

ভট্টনারায়ণকে খৃষ্টীয় ৮০০ অব্দের লেখক বলিয়া মনে করা হয়। ইনি বঙ্গরাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম—বাংলা দেশের এই জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন না।

ভবভূতি

ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'

ইহার রচিত 'উত্তররামচরিত' নামক সপ্তাঙ্ক নাটক সুপ্রসিদ্ধ।

সাহিত্যিক বিচার

নাটকের নাম হইতেই উহার বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। রামায়ণের আখ্যান ইহার উপজীব্য। কিন্তু, সমগ্র আখ্যানটিকে এই নাটকের বিষয়ীভূত করা হয় নাই। রামচরিতের উত্তরভাগ, অর্থাৎ সীতার উদ্ধারের পর রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যাভিষেকের পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ লইয়া এই নাটক রচিত। কিন্তু, মূল আখ্যানকে নাট্যকার অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি এইরূপ—রামের সহিত বাসন্তীর সাক্ষাৎকার এবং ছায়াসীতা, লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী ও রামের মাতৃগণের বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থান ইত্যাদি। প্রত্যেকটি নূতন ঘটনাই নাটকীয় বস্তুর পরিণতির সহায়ক। কিন্তু, নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনের অন্ধ আনুগত্যে ভবভূতি মূল আখ্যানটিকে বিসদৃশ ভাবে বিকৃত করিয়াছেন। বাল্মীকির আখ্যান বিয়োগান্তক ; কিন্তু, নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশে নাটককে মিলনান্তক করিতে হইবে। ফলে, ভবভূতি অলৌকিক ঘটনাবলীর অবতারণা করিয়া সীতার সহিত রামের মিলন ঘটাইয়াছেন। ইহাতে সুপ্রচলিত আখ্যানের স্বাভাবিক পরিণতির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এবং ভবভূতিরচিত বস্তুর কৃত্রিমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

'মহাবীরচরিত'

ভবভূতির রামায়ণমূলক অপর নাটক 'মহাবীরচরিত' সপ্তাঙ্কে রচিত। ইহাতে রামোপাখ্যানের পূর্বভাগ, অর্থাৎ রামের বনগমনের পূর্ব পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

'মালতীমাধব'

ভবভূতির 'মালতীমাধব' সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার গ্রন্থ। ইহা দশাঙ্কে রচিত প্রকরণ।

তরুণ ছাত্র মাধব এবং মন্ত্রিকন্যা মালতীর প্রণয়-কাহিনী এই গ্রন্থের মূল বা আধিকারিক বস্তু। নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া এবং মালতী ও মাধবের পিতার বান্ধবী বুদ্ধিমতী বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কৌশলে প্রণয়ের সার্থকতা—'মালতীমাধব' প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সাহিত্যিক বিচার

'উত্তররামচরিতে'র আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ভবভূতি নাটকীয় বস্তুর পরিণতির জন্য অনেক সময় অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন ; ইহাতে স্থানে স্থানে নাটক-বর্ণিত ঘটনা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। 'উত্তররামচরিতে' ভবভূতির নাট্যরচনাকৌশলের পরিচয় যথেষ্ট আছে। প্রথম অঙ্কে আলেখ্যদর্শনে সীতার অরণ্যদর্শনের সঙ্কল্প রামের সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিবার সুযোগ ঘটাইয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে ছায়াময়ী সীতা রামের দুঃখের আন্তরিকতা অনুভব করিলেন ; ভবিষ্যতে রামের সহিত তাঁহার মিলনের পথ সুগম হইল।

চরিত্র-বিশ্লেষণে ভবভূতি সিদ্ধহস্ত। তরুণ ও বলদৃপ্ত লবের চরিত্র মনোরম। রাজা হিসাবে রামের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগ, মানুষ হিসাবে নির্বাসিতা সীতার জন্য তাঁহার 'অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথা' এবং অনুতাপানলের অন্তর্দাহ অতি মনোজ্ঞভাবে ভবভূতি বর্ণনা করিয়াছেন। পতির আন্তরিক পত্নীপ্রেমের পরিচয় লাভে 'শরীরিণী বিরহব্যথা' জানকীর স্ত্রীসুলভ কোমলতা ও ক্ষমার প্রকাশ অনবদ্য। করুণরসের যে চিত্র ভবভূতি নাট্যগ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ 'মালতীমাধবে' ও 'উত্তররামচরিতে', অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে 'কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে' এই উক্তি সার্থক হইয়াছে। উত্তরচরিতে সীতার বিরহে শোকাতুর রামের আর্ত্তনাদে 'অপি গ্রাবা রোদিতি, অপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্'—হৃদয়-বিদারক করুণ রসের কী চমৎকার বর্ণনা! দাম্পত্যপ্রেম এবং বাৎসল্য রসেরও বিচিত্র বর্ণনা 'উত্তররামচরিতে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। 'মালতীমাধবে' নাট্যকার গতানুগতিক বিষয়বস্তু অবলম্বন না করিয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং উহাতে বিভিন্ন ঘটনাবলীর অপূর্ব বিন্যাস রহিয়াছে। মালতী ও মাধবের প্রণয়কাহিনীর সহিত মদয়ন্তিকা ও মকরন্দের প্রেমের প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তটি ভবভূতি অতি নৈপুণ্য সহকারে গ্রথিত করিয়াছেন। ভবভূতির অপর একটি গুণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ বর্ণনা। কালিদাসের বর্ণনার মাধুর্য হয়ত ভবভূতির গ্রন্থে নাই; কিন্তু ভবভূতির বর্ণনায় প্রকৃতির বাস্তব রূপটি পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দণ্ডকারণ্যের একটি দৃশ্যের বর্ণনাচ্ছলে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

কণ্ডূলদ্বিপগণ্ডপিণ্ডকষণোৎকম্পেন সম্পাতিভি
ঘর্মস্রংসিতবন্ধনৈঃ স্বকুসুমৈরর্চন্তি গোদাবরীম্।
ছায়াপস্কিরমাণবিষ্কিরমুখব্যাকৃষ্টকীটত্বচঃ
কূজৎকান্তকপোতকুক্কুটকুলাঃ কূলে কুলায়দ্রুমাঃ ॥

(উত্তররামচরিত—২।৯)

"তীরস্থিত নীড়বহুল তরুরাজি স্বীয়পুষ্পসম্ভারে গোদাবরীর অর্চনা করিতেছে; (ঐ) পুষ্পসমূহ আতপক্লিষ্ট হইয়া শ্লথবৃন্ত অবস্থায় কণ্ডূয়মান গজগণ্ডঘর্ষণে ভূপাতিত হইতেছে, ছায়াস্থিত ভূমি-আলেখনকারী বিহগকুল

বৃক্ষগণের কীটদষ্ট বল্কলগুলি আকর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষোপরি সুন্দর কপোত ও কুক্কুটের দল কূজন করিতেছে।

'মহাবীরচরিতে' ভবভূতির একটি ত্রুটি এই যে, মাঝে মাঝে কোন কোন চরিত্র অতিদীর্ঘ কথা বলিয়া পাঠকের বিরক্তি জন্মায়। ভবভূতির ভাষা স্থানে স্থানে দীর্ঘসমাসবহুল ও দুরূহ। ভবভূতির সমস্ত নাট্যগ্রন্থগুলিতে হাস্যরসের অভাব বর্ত্তমান যুগে পাঠকের নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। ভবভূতির শ্লোকসমূহে ছন্দ ও অলঙ্কারের বৈচিত্র্য প্রচুর পরিমাণে আছে।

কালিদাসোত্তর যুগের অপরাপর নাট্যকারগণের মধ্যে যশোবর্মণ ও মায়ুরাজ সমধিক প্রসিদ্ধ।

যশোবর্মণের 'রামাভ্যুদয়'. মায়ুরাজের 'উদাত্তরাঘব'

যশোবর্মণের 'রামাভ্যুদয়' লুপ্ত। কিন্তু, আনন্দবর্দ্ধন কর্ত্তৃক ইহার উল্লেখ ও অলঙ্কারশাস্ত্রগ্রন্থসমূহে এবং কোষকাব্যগুলিতে ইহার শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি হইতে মনে হয়, এককালে ইহা প্রসিদ্ধ নাটক ছিল। মায়ুরাজের 'উদাত্তরাঘব'ও লুপ্ত এবং অনুরূপ ভাবেই ইহার খ্যাতি অনুমেয়।

'মল্লিকামারুত' 'পার্বতীপরিণয়' 'মুকুট-তাড়িতক', 'আশ্চর্যচূড়ামনি'

এই যুগের অন্যান্য নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্দণ্ডনাথের 'মল্লিকামারুত', বাণভট্টের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ 'পার্বতীপরিণয়', অধুনালুপ্ত 'মুকুট-তাড়িতক' ও শক্তিভদ্রের 'আশ্চর্যচূড়ামণি'।

ক্ষয়িষ্ণু দৃশ্যকাব্য

ভবভূতির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় নাট্যপ্রতিভার গৌরবময় যুগের অবসান ঘটিয়াছিল। তাঁহার পরেই এই প্রতিভার ক্ষীয়মাণ রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষয়িষ্ণু যুগে বহু নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহারা নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে নিগড়িত, নাটক হিসাবে নগণ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্ত্তী বিখ্যাত নাটকসমূহের অনুকরণ মাত্র। ইহাদের মধ্যে পদ্য-কাব্যরচনার কৌশল আছে বটে; কিন্তু নাট্যরচনাকৌশলের পরিচয় নাই। এই যুগের নাট্যকারগণের রচনা সাহিত্যিক ব্যায়াম ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক

মাত্র। খৃষ্টীয় নবম শতক হইতে মোটামুটি ভাবে এই যুগের প্রারম্ভ বলা যায়।

এই যুগের অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিচিত নাট্যকারগণের ও তাঁহাদের রচিত নাটকগুলির নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

গ্রন্থকার (বর্ণানুক্রমিক)	গ্রন্থ
কবি কর্ণপূর	চৈতন্যচন্দ্রোদয়
কৃষ্ণমিশ্র	প্রবোধচন্দ্রোদয়
ক্ষেমীশ্বর	চণ্ডকৌশিক
জয়দেব (বেরারের)	প্রসন্নরাঘব
দামোদর মিশ্র	মহানাটক বা হনূমন্নাটক
দিঙ্‌নাগ (?)	কুন্দমালা
বিহ্লণ	কর্ণসুন্দরী
মুরারি	অনর্ঘরাঘব
রাজশেখর	বালরামায়ণ
"	বালভারত (অসম্পূর্ণ)
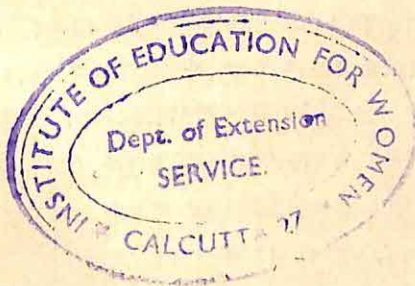
পরিশিষ্ট

(ক) সংস্কৃতে ঐতিহাসিক রচনাবলী

কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে, ভারতীয় সাহিত্যে কোন ইতিহাস নাই, এমন কি ভারতীয়দের ঐতিহাসিক বোধও নাই। এই অভিযোগ সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতদূর সত্য, তাহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য।

ভারতীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনার অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ

ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস নাই, এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে' আমরা যে কাহিনী পাইয়া থাকি, তাহার ঐতিহাসিকত্বের কোন প্রমাণ নাই; রামচন্দ্র বলিয়া প্রকৃতই কোন রাজা ছিলেন কিনা, অথবা রাবণ নামে তাঁহার কোন প্রতাপশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কিনা, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। 'মহাভারতে'র পাণ্ডব এবং কৌরবগণের যে যুদ্ধকাহিনী আমরা পাই তাহার যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। তবে, ঐ উভয় গ্রন্থেরই মূলে কোন প্রকৃত ঘটনা থাকা খুব সম্ভব, অনেকে এইরূপ মনে করেন। তাঁহাদের মতে, কোন বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থদ্বয়ের আদি রচয়িতৃগণ রাজাদের কাল্পনিক নাম দিয়া এবং নিজেদের কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য নূতন ঘটনাবলীর সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলিতে রাজনৈতিক ইতিহাসের উপকরণ থাকুক বা নাই থাকুক, উহাদের মধ্যে যে সামাজিক আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহাদের একটা মূল্য আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

উক্ত অভিযোগের অযৌক্তিকতা

পুরাণ

পুরাণ নামক যে গ্রন্থগুলি আমরা পাইতেছি, তাহাদের মধ্যে সামাজিক চিত্র ছাড়াও, রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত রাজগণের

বংশাবলীতে ভ্রমপ্রমাদ এবং অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, ইহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

স্তম্ভ এবং মন্দির প্রভৃতিতে ক্ষোদিত প্রাচীন লেখমালাতে এবং তাম্রশাসনগুলিতে প্রকৃত ইতিহাস আমরা পাইয়া থাকি। উহাদের মধ্যে প্রশস্তিজাতীয় লেখমালাতে কবিসুলভ অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জন প্রভৃতি থাকিলেও রাজগণের বংশাবলী এবং মঠ, মন্দির ও স্তম্ভাদি নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত প্রাচীন প্রশস্তিগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ—

প্রশস্তি প্রভৃতি প্রাচীন লেখমালা

(১) গীর্ণার প্রশস্তি (আঃ ১৫০-২ খৃষ্টাব্দ)

(২) হরিষেণ-রচিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি
(এলাহাবাদ—আঃ ৩৪৫ খৃষ্টাব্দ)

(৩) বৎসভট্টি-রচিত প্রশস্তি (মান্দাসোর, ৪৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দ)

ক্লাসিক্যাল যুগের কাব্যেও কতক পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য আছে। পদ্যকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, নিম্নলিখিত কাব্যগ্রন্থগুলিতে কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীরও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—

কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য

পদ্যকাব্য

পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত', বিল্হণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী' ও সন্ধ্যাকরের 'রামচরিত'।

ইহাদের মধ্যে 'রাজতরঙ্গিণী'র ঐতিহাসিক মূল্যই পণ্ডিতসমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক। এই সমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে এমন অনেক পদ্যকাব্য রচিত হইয়াছে যাহাদের নাম তত প্রসিদ্ধ নহে।

গদ্যকাব্য

গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রেও বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে'র ঐতিহাসিকত্ব, যত অল্পপরিমাণই হউক, স্বীকৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস একেবারেই নাই, এই অভিযোগ অমূলক। তবে একথা ঠিক যে, এই সাহিত্যের বিশালত্বের তুলনায় মনে হয় যে, ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্য অতি নগণ্য। যেসব গ্রন্থগুলিতে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যেও অলঙ্কার ও বাগ্-বহুল কাব্য হইতে খাঁটি ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন এবং ঐ সব গ্রন্থে ইতিহাস রচনা অপেক্ষা কাব্যকৌশলের প্রতিই লেখকের প্রয়াস অধিকতর। কিন্তু, ঐ লেখকগণের ঐতিহাসিক বোধ ছিল না, এমন নহে। ঐতিহাসিক বোধ না থাকিলে, তাঁহারা ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা হয়ত করিতেনই না।

ঐতিহাসিক রচনার স্বল্পতার কারণ

এখন প্রশ্ন এই—সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনা এত কম কেন ? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। ইহার অনেকগুলি কারণের মধ্যে প্রধান এই যে, যে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া লোকে ইতিহাস রচনা করিয়া থাকে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, সেই জাতীয়তাবোধ লোকের মনে জাগিবার অবকাশ হয় নাই। রাজবংশগুলির দ্রুত উত্থান পতন, প্রতাপশালী রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর কলহ, এবং কোন একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতি সমগ্র ভারতের আনুগত্যের অভাব এই জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন ভারতীয়গণের মনের গঠন এই ব্যাপারের জন্য কতক পরিমাণে দায়ী। কর্মবাদ, অলৌকিক ঘটনাবলীতে বিশ্বাস প্রভৃতি তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হওয়ায়, তাঁহারা কোন স্মরণীয় ঘটনার কার্য—কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্দ্ধারণ করিবার কোন প্রচেষ্টা করিতেন না।

জাতীয়তাবোধের অভাব

কর্মবাদ, অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস

(খ) গীতিকাব্য

'গীতিকাব্য' বলিতে সেই ধরণের কাব্যকে বুঝায়, যাহা গীত হওয়ার যোগ্য। ইহাতে মানব-মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত একটি ভাব বা আবেগ প্রকাশিত হয়।

ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যে গীতিকবিতা প্রচুর। ইহাদের বিষয়বস্তু বিবিধ প্রকার; যথা—শৃঙ্গাররসাত্মক, ভক্তিমূলক ও নীতিমূলক। এই জাতীয় অনেকগুলি কাব্যে প্রকৃতির সহিত মানুষের নিবিড় যোগের বর্ণনা করা হইয়াছে। কোষকাব্যসমূহে গীতিধর্মী অসংখ্য শ্লোক নানা কবির নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়। পদ্যকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই জাতীয় প্রধান প্রধান কাব্যগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কোষকাব্যের কবিগণের কথা উল্লেখ না করিয়া উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্যগুলির নাম একত্র সন্নিবেশিত হইল।

শৃঙ্গাররসাত্মক, ভক্তিমূলক, নীতিমূলক

কাব্য (বর্ণানুক্রমিক)	রচয়িতা
অমরুশতক	অমরু
আর্যাসপ্তশতী	গোবর্দ্ধন
ঋতুসংহার	কালিদাস
কৃষ্ণকর্ণামৃত (বা কৃষ্ণলীলামৃত)	লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল
গীতগোবিন্দ	জয়দেব
ঘটকর্পরকাব্য	ঘটকর্পর
চণ্ডীশতক	বাণভট্ট
চৌরপঞ্চাশিকা	বিল্হণ
নীতিশতক	ভর্ত্তৃহরি
মেঘদূত	কালিদাস
বৈরাগ্যশতক	ভর্ত্তৃহরি
শৃঙ্গারশতক	”
শৃঙ্গারতিলক	কালিদাস (?)
সূর্যশতক	ময়ূর

উল্লিখিত কাব্যগুলি ছাড়াও, স্তবস্তোত্রের মধ্যে অনেকগুলি গীতিধর্মী। এই শ্রেণীর গীতিকাব্যে শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত শিব ও গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত স্তবস্তোত্রগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ।

স্তবস্তোত্র

(গ) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় তারিখ

[যে তারিখগুলির পশ্চাতে বিশেষজ্ঞগণের যুক্তি আছে, ইহাতে সেগুলিই শুধু দেওয়া হইল ; গ্রন্থকারদের মতামত ইহাতে নাই]

বৈদিক যুগ

তারিখ **খৃষ্টপূর্বাব্দ**		বিষয়
আনুমানিক ২৫০০—২০০০ (আনুমানিক ২৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে আর্য-আক্রমণ বা অভিযান আরম্ভ হয়—*The Camb. Hist. of India*, Vol I, পৃঃ ৬৪০)		ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্রাংশ (ছন্দযুগ) [ম্যাক্সমূলারের মতে ১২০০—১০০০ খৃঃ পূঃ ; খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ—*India* 1956]
„ ২০০০—১৫০০		ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশ ও অপর বেদত্রয় (মন্ত্রযুগ)
„ ১৫০০—১০০০		ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক
„ ১২০০—১০০০		কৌরব ও পাণ্ডবের যুদ্ধ (Rapson) [আঃ ১৪০০ খৃঃ পূঃ, দ্রষ্টব্য Vedic Age, পৃঃ ৩০০]
„ ১০০০—৬০০		উপনিষদ্
„ ৬০০—২০০		সূত্রযুগ ঃ বেদাঙ্গ
„ ৬৫০—৬০০	পাণিনি	কাহারও কাহারও মতে ৮০০—৭০০। পাণিনির কাল খৃঃ পূঃ পঞ্চম-চতুর্থ শতক বলিয়া অনেক আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন
„ ৫৬৬—৪৮৬	বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, ধর্মপ্রচার ও তিরোভাব	
„ ২০০—১৫০	পতঞ্জলি (মহাভাষ্যকার)	শুঙ্গবংশের রাজা পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক
„ ৫৬	বিক্রমাব্দের সূচনা	

খৃষ্টাব্দ

প্রথম শতকের শেষপাদ	কণিষ্কের রাজত্ব (অশ্বঘোষের কাল)
আঃ ১৫০—১৫১	রুদ্রদামনের গীর্ণার প্রশস্তি
৩২০—৫৬৯	গুপ্তরাজত্বের যুগ
৩৭৬ (মতান্তরে ৩৮০) —৪১৫	গুপ্তরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) [ইহাই কালিদাসের কাল বলিয়া অনেকে মনে করেন]

এপিক, পৌরাণিক ও ক্লাসিক্যাল যুগ*

৬০৬—৬৪৭	থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকাল (ইহাই বাণভট্টের কাল)
৬৩৪	আইহোল প্রশস্তির তারিখ [ইহাতে কালিদাস ও ভারবির উল্লেখ আছে]
১১৭৮	বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেনের সিংহাসনারোহণ [জয়দেব ইহার সভাকবি]

* রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহের রচনাকাল নিশ্চিতভাবে নিরূপিত হয় নাই।

নির্ঘণ্ট

বৈদিক যুগ

গ্রন্থ

[প্রতি যুগের প্রধান প্রধান গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নাম লিখিত হইল]

এপিক, পৌরাণিক ও ক্লাসিক্যাল যুগ

গ্রন্থ

* ইহা গ্রন্থ না হইলেও, ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয় বলিয়া লিখিত হইল।

* এইগুলি গ্রন্থ না হইলেও, বিশেষভাবে স্মরণীয় বলিয়া ইহাদের উল্লেখ করা হইল।

গ্রন্থকার

* গ্রন্থকার না হইলেও বিশেষভাবে স্মরণীয় বলিয়া ইঁহার নাম লিখিত হইল।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

[প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও সংস্করণগুলির নাম লিখিত হইল]

বৈদিক সাহিত্য

ক। বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস

A History of Indian Literature, Vol I—Winternitz.
Ancient India—E. J. Rapson, Cambridge, 1914.
Cambridge History of India (Vol I)—Cambridge, 1922, First Indian Reprint, 1955.
Hindu Civilisation—Radhakumud Mookherjee, London, 1936.
History of Ancient Sanskrit Literature by Max Müller, Allahabad, 1925.
History and Culture of the Indian People (Vol I)—The Vedic Age, edited by R. C. Mazumdar.
History of Civilisation in Ancient India—R. C. Dutt, London, 1893.
History of Indian Literature (Second edition)— A. Weber, London, 1882.
History of Sanskrit Literature—A. A. Macdonell, London, 1900.
History of Sanskrit Literature, Vol I (S'ruti : Vedic Period)—C. V. Vaidya, Poona, 1930.
History of Sanskrit Literature (Vedic and Classical)— J. C. Bhowmik (in Bengali)
Saṃskṛta Literature—V. Varadachari
Vedapraves'ikā—U. C. Vaṭavyāla.
Vedic India—Ragozin.

খ। সংহিতা

Hymns of the Atharva-veda—R. T. H. Griffith, Benares.
Ṛg-Veda Saṃhitā—ed. Satvalekar (Text only)

Texts of the White Yajurveda—R. T. H. Griffith.
The Ṛg-veda—A. Kaegi (Tr. by Arrowsmith), Boston, 1886.
The Atharva-veda—M. Bloomfield, Strassburg, 1899.
The Hymns of the Ṛg-veda—R. T. H. Griffith, Benares, (2 vols)
Trans. of the Saṃhitā of the Sāma-veda—Stevenson.

গ। ব্রাহ্মণ

Aitareya Brāhmaṇa: Vols. I and II—B. G. Apte.
Collection of the fragments of lost Brāhmaṇas—B. K. Ghosh.
Jaiminīya Brāhmaṇa—Raghuvīra.
Pañcaviṃsa Brāhmaṇa—ed. W. Caland.
Ṛgveda Brāhmaṇas—H. O. S.
S'atapatha Brāhmaṇa (Mādhyandina)—A. C. Sastri.
Taittirīya Br.—ed. R. Shamsastri.
Trans. of the S'atapatha Br.—Eggeling.
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—ত্রিবেদী (রামেন্দ্র রচনাবলী, ৫ম) (বঙ্গানুবাদ)
তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণম্ (সায়ণ-ভাষ্যসমেতম্)—A. C. Sastri.

ঘ। আরণ্যক ও উপনিষদ্

Aitareya Āraṇyaka—Keith.
Sāṅkhāyana Āraṇyaka
Taittirīya Āraṇyaka—Ānandās'ram Sanskrit Series.
The Thirteen Principal Upaniṣads—R. E. Hume.
Twelve Principal Upaniṣads—Roer.
Ten Principal Upaniṣads—W. B. Yeats and Purohit Swami.

Upaniṣads
Is'a — ed. Aurobindo Ghosh
Kena — ” ”
Kaṭha — ” ”

২

Pras'na	ed. Swami Sharvananda
Muṇḍaka	,, Aurobindo Ghose
Māṇḍūkya	,, Swami Sharvananda
Taittirīya	,, ,,
Aitareya	,, D. Venkataramiah
Chāndogya	,, Ganganath Jha
Bṛhadāraṇyaka	,, Swami Mādhavānanda
S'vetās'vatara	,, Swami Thyagīsananda

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড—গম্ভীরানন্দ স্বামী সম্পাদিত

৬। বেদাঙ্গ

Āpastamba—S'rautasūtra—Caland (Eng. Trans.)
,, Dharmasūtra—ed. M. D. Sastri
Aṣṭādhyāyī of Pāṇini
Ās'valāyana—S'rautasūtra—ed. M. D. Sastri
,, Gṛhyasūtra—ed. Ravitīrtha
Atharva-Veda—ed. Sūryakānta
Baudhāyana-dharmasūtram—Benares
Chandaḥ-sūtram of Piṅgala—Benares
Gobhila-gṛhyasūtram—ed. C. Bhattacharya, Calcutta.
Kātyāyana-S'rautasūtram—ed. V. Sarma, Benares.
Nighaṇṭu and Nirukta—ed. V. K. Rajvade
Do Vols I—III—L. Sarup
Niruktam—ed. M. J. Bakshi, Bombay
Pāṇinīya Sikṣā —M. M. Ghosh
Ṛktantram (Prātis'ākhya of Sāma-Veda)—ed. Sūryakānta
Taittirīya—Prātis'ākhya—ed. V. V. Sarma
Vājasaneyi—Pratis'ākhya of Kātyāyana—ed. V. V. Sarma
Vedāṅga Jyotiṣa—R. Shamsastri
Vedic Metre—Arnold, 1905

চ। বিবিধ

Advanced History of India—Majumdar, Ray Chaudhuri and Dutta
Caste and Structure of Society—R. P. Masani
Ghate's Lectures on Ṛg-Veda—Sukthankar
India as known to Pāṇini—V. S. Agarwala
India—What can she teach us—M. Müller
Indian Wisdom—M. Williams
Indian Philosophy, Vols. I and II—Radhakrishnan
Interpretation of the Upaniṣads—U. C. Bhattacharya
Life Divine, Vols I-II—A. Ghosh
Lights on the Veda—Kapali Sastri
Original Sanskrit Texts—Muir
Ṛg-Vedic Legends through the ages—H. L. Hariyappa
Religion and Philosophy of the Veda and Upaniṣads—Keith
Sacrifice in the Ṛg-Veda—K. R. Potdar
Studies on Ṛg-Vedic Deities in their Astronomical and Meteorological Consideration—Ekendranath Ghosh
The Indus Civilization in the Ṛg-Veda—P. R. Deshmukh
The Religion of the Veda—Bloomfield.
The Legacy of India—G. T. Garratt
Vedic Index (2 Vols)—Macdonell and Keith
Vedic Grammar—Macdonell
Vedic Mythology— Do
Vedic Bibliography—R. N. Dandekar
Yajñatattva-Prakās'a—A. C. Sastri
উপনিষদের আলো—মহেন্দ্র সরকার
উপনিষদ—বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলী—চিন্নস্বামিশাস্ত্রী

এপিক, পৌরাণিক ও ক্লাসিক্যাল সাহিত্য

ক। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

De, S. K : History of Sanskrit Literature (Prose, Poetry and Drama), Calcutta University, 1947.

Keith, A. B : A History of Sanskrit Literature, Oxford, 1928

Winternitz, M. ; A History of Indian Literature, vol. I, Calcutta University, 1927.

জাহ্নবী ভৌমিক ঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯২৮

নিত্যানন্দ গোস্বামী ঃ সংস্কৃত সাহিত্যের কথা

খ। শ্রব্যকাব্য (পদ্য) [কালানুক্রমে লিখিত]

কালিদাস-পূর্ব যুগ ও কালিদাস

অশ্বঘোষ ঃ ১। বুদ্ধচরিত—E. H. Johnston (দুই খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৩৬

২। সৌন্দরনন্দ— ঐ, Oxford Uni. Press, 1928

কালিদাস ঃ ১। রঘুবংশ—জি, আর, নন্দরগিকার (৩য় সংস্করণ), বোম্বাই, ১৮৯৭

২। কুমারসম্ভব—নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ (দশম সংস্করণ), বোম্বাই, ১৯২৭

৩। মেঘদূত—চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, ১৯৩১

কালিদাসোত্তর যুগ

অমরু ঃ অমরুশতক—নির্ণয়সাগর প্রেস (৩য় সং), বোম্বাই, ১৯১৬

ভর্তৃহরি ঃ সুভাষিতত্রিশতী (শৃঙ্গার-নীতি ও বৈরাগ্য-শতক)

ভারবি ঃ কিরাতার্জুনীয়—নির্ণয়সাগর প্রেস (ষষ্ঠ সং), বোম্বাই, ১৯০৭

ভট্টি ঃ ভট্টিকাব্য (রাবণবধ)—নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯৩৪

কুমারদাস ঃ জানকীহরণ—জি, আর, নন্দরগিকার, বোম্বাই, ১৯০৭ (১-১০ সর্গ)

মাঘ : শিশুপালবধ—নির্ণয়সাগর প্রেস (নবম সংস্করণ), ১৯২৭
শ্রীহর্ষ : নৈষধচরিত—নির্ণয়সাগর প্রেস (ষষ্ঠ সং), বোম্বাই, ১৯২৮
জয়দেব : গীতগোবিন্দ—(১) নির্ণয়সাগর প্রেস সং, বোম্বাই, ১৯২৩
(২) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯২৩
কল্হণ : রাজতরঙ্গিণী—M. A. Stein (মূল), বোম্বাই, ১৮৯২
—(ইংরেজী অনুবাদ), Westminster, ১৯০০
সন্ধ্যাকর নন্দী : রামচরিত—বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী (পূর্বপাকিস্তান), ১৯৩৯

গ। শ্রব্যকাব্য (গদ্য) [কালানুক্রমিক]

পঞ্চতন্ত্র—The Pañcatantra Re-Constructed, American Oriental Society, 1924.
হিতোপদেশ—পি, পিটারসন্, বোম্বাই সংস্কৃত সিরিজ, ১৮৮৭
দণ্ডী : দশকুমারচরিত—নির্ণয়সাগর প্রেস (১০ম সং), বোম্বাই, ১৯২৫
সুবন্ধু : বাসবদত্তা—কৃষ্ণমাচারিয়ার, শ্রীরঙ্গম্, ১৯০৬
বাণভট্ট : ১। হর্ষচরিত—নির্ণয়সাগর প্রেস (৫ম সং), বোম্বাই, ১৯২৫
২। কাদম্বরী— ঐ (৭ম সং), বোম্বাই, ১৯২৮
সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা (বা, বিক্রম-চরিত)—F. Edgerton, Harvard Oriental Series, 1926
শুকসপ্ততি—Textus Simplicitor, R. Schmidt, Leipzig, 1893 (সংক্ষিপ্ত রূপ)
Textus Ornatior, Do, Munchen, 1898-99 (বৃহত্তর রূপ)

ঘ। দৃশ্যকাব্য [কালানুক্রমিক]

কালিদাস-পূর্ব যুগ

ভাস : ভাসনাটকচক্র—সি, আর, দেবধর

কালিদাস-যুগ

কালিদাস : (১) অভিজ্ঞানশাকুন্তল—(বঙ্গদেশীয় রূপ)
Harvard Oriental Series, 1922

(২) বিক্রমোর্বশীয়—নির্ণয়সাগর প্রেস (৪র্থ সং), বোম্বাই, ১৯১৪

(৩) মালবিকাগ্নিমিত্র— ঐ, ১৯১৫

কালিদাসোত্তর যুগ

শূদ্রক : মৃচ্ছকটিক—নির্ণয়সাগর প্রেস (৫ম সং), বোম্বাই, ১৯২২

শ্রীহর্ষ : (১) রত্নাবলী—ঐ, ১৮৯৫

(২) প্রিয়দর্শিকা—কৃষ্ণমাচারিয়ার, শ্রীরঙ্গম, ১৯০৬

(৩) নাগানন্দ—টি, গণপতি শাস্ত্রী, ট্রিভ্যান্দ্রাম, ১৯১৭

বিশাখদত্ত : মুদ্রারাক্ষস—কে, টি, তেলাঙ্গ (৭ম সং), বোম্বাই, ১৯২৮

ভট্টনারায়ণ : বেণীসংহার—নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯১৩

ভবভূতি : (১) উত্তররামচরিত—পি, ভি, কানে, বোম্বাই, ১৯২১

(২) মহাবীরচরিত—তোদর মল, ১৯২৮ (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)

(৩) মালতীমাধব—নির্ণয়সাগর প্রেস সং, বোম্বাই, ১৯২৬

৬। বিবিধ

Journal of Oriental Institute, Baroda, March, 1956

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
।০	৬	Grassman	Grassmann
৩	১৩	কোষীতক	কৌষীতক
”	২০	কান্ব	কাণ্ব
”	পার্শ্বলিখিত	শুক্ল ও কৃষ্ণ	শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ
৪	২৪	কল্প ব্যাকরণ	কল্প, ব্যাকরণ
৬	শিরোনামা	ভুমিকা	ভূমিকা
”	১২	১৬০০	১৬০০০
”	২৪	দিয়াছেন	দিয়াছিলেন
১২	১	সাধারণ	সাধারণ ও
১৩	১২	রাজন্ রাজন্, পারয়ামসি	রাজন্, রাজন্ পারয়ামসি
১৪	২৫	স্থক্ত	সূক্ত
”	২	ব্যথ্যা	ব্যাখ্যা
”	২২	গোষ্ঠীর	গোষ্ঠীর
১৬	২৭	যম	যম,
১৭	১	উপখ্যানে	উপাখ্যানে
১৮	১	সম্বন্ধে	সম্বন্ধে
”	১২	যাক্	যাউক
”	২৭	earth	earth”
১৯	৩	হাউমো	হাত্তম
২০	৩	( ) তিনি	( ) ; তিনি
২১	১	দেবা	দেবাঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	১২	ঋ্গ্বেদে	ঋগ্বেদে
২২	২	Meteorological„	Meteorological ইত্যাদি
২৯	১১	tha Atharveda	the Atharvaveda
৩১	১২	নিদিষ্ট	নির্দিষ্ট
৩৪	১৮	অথর্ব	অথর্ব
৩৫	১৬	ইন্দ্রজালও	ইন্দ্রজাল ও
৩৮	৬	বিচারসহ	বিচারসহ তাহা
৩৯	২৫	সকলেই	অনেকেই
৪০	৫	হইয়াছে	হইবে
"	পার্শ্বলিখিত	গার্হস্থ্যাশ্রমে	গার্হস্থ্যাশ্রমে
৪৩	"	আর্যদের	আর্যদের
"	১০	রহস্য একমাত্র	রহস্য
৪৬	৪	তাঁহাদের	আর্যদের
৪৯	২০	Upaniṣads	Upaniṣads"
৫১	১৬	তাৎপর্য	তাৎপর্য,
৫২	১২	কামনাবাসনা,	কামনা, বাসনা
"	২৩	শরযৎ	শরবৎ
৫৮	১৬	কি ? শোকই	কি, শোকই
৫৯	পার্শ্বলিখিত	ক	কি
৬১	১৩	স্মৃতি	স্মৃতি,
"	২৪	শুল্বশূত্রে	শুল্বসূত্রে
৬৩	২৭	বিষেশ	বিশেষ
৬৫	১২	ইহারা বিভিন্ন বিষয়ে	ইহারা
"	১৪	বর্ণনা	উল্লেখ
৬৭	৪	এপিক এ	এপিক

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৮	১৮	মৃখে	মুখে
৬৯	২৩	পরম্পরের	পরস্পরের
৭০	শিরোনামা	ভৃমিকা	ভূমিকা
৭১, ৭৩	”	এপিক	রামায়ণ
৭৪	২৩	ধর্মালম্বি	ধর্মাবলম্বি
৭৫	শিরোনামা	এপিক	রামায়ণ
৭৬	৫	অদ্ভৃত	অদ্ভুত
৭৭	১৭	খহাভারতে	মহাভারত
৭৯	শিরোনামা	এপিক	মহাভারত
৮০	২৬	শংখায়ন	শাংখায়ন
৮১	১	বিদুব	বিদুর
”	শিরোনামা	এপিক	মহাভারত
৮২	৯	ভাররবাসী	ভারতবাসী
৮৫	শিরোনামা	এপিক	পুরাণ
৮৬	শিরোনামা	ভুমকা	ভূমিকা
”	১৬	সপ্তম	খৃষ্টীয় সপ্তম
৮৭	শিরোনামা	এপিক	পুরাণ
৮৮	২	an	and
৯১		০ গদ্য চম্পূ ০	০ গদ্য চম্পূ
৯২	২৪	নামে	নামক
”	”	স্থানে	স্থানে
৯৩	১	আশ্বাস আশ্বাস	আশ্বাস । আশ্বাস
৯৪	পাদটীকা ২, -পংক্তি ৩	বৃ্যন্বর্তী	বৃ্যর্ণ্বতী
”	” পংক্তি ৪	জ্যোতিযুবতিঃ	জ্যোতির্যুবতি ঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৭	১২	সৌন্দরানন্দ	সৌন্দরনন্দ
১০১	২২	সৌন্দরানন্দ	সৌন্দরনন্দ
"	পার্শ্বলিখিত	"	"
১০৮	৩	রচয়িত্য	রচয়িতা
"	৬	সেঘদূত	মেঘদূত
১১৪	১	প্রতাবর্তনের	প্রত্যাবর্তনের
১১৬	২২	ত্রূটি	ত্রুটি
১১৮	৩	ভাষকে	ভাষাকে
"	২৬	কঠিন্যে	কাঠিন্যে
১১৯	১২	অনলম্বনে	অবলম্বনে
"	২৬	দিার	দিবার
১২০	১০	অপেক্ষাকুড	অপেক্ষাকৃত
"	১৭	জনকীপরিণয়	জানকীপরিণয়
১২২	শিরোনামা	ভুমিকা	ভূমিকা
"	৩	পৃষ্ট	পৃষ্ঠ
"	১৩	বায়ান্ন	বাহান্ন
"	২০	,	;
১৩৩	২৬	পারা যায়	পারি
১৩৭	৩	এথন	এখন
১৪৫	নীচ হইতে চতুর্থ	বিরক্তিজনক	বিরক্তিজনক।
১৫২	১৫	(১২) শ্রীগণিত	শ্রীগদিত
১৫৪	২৭	আলেক্‌জাণ্ডারের	আলেক্‌জাণ্ডার
১৫৫	পার্শ্বলিখিত	অর্থশাত্র	অর্থশাস্ত্র
১৫৬	২৩	গ্রস্থ	গ্রন্থ
১৭১	৯	গৌরীদেবীর কৃপায় জীমূতবাহন	জীমূতবাহন গৌরীদেবীর কৃপায়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮১	১	গীতিকবিতা	গীতিকাব্য
১৮৩		এপিক, পৌরাণিক ও ক্লাসিক্যাল যুগ	এই পৃষ্ঠার শিরোনামা হইবে, মাঝখানে থাকিবে না